

হত্যাবৃত্ত
অনুপম মুখোপাধ্যায়

হত্যাবৃত্ত

হত্যাবৃত্ত

অনুপম মুখোপাধ্যায়



তবুও প্রয়াস

www.tobuoproyas.com

HATYABRITTO

A Bangla Novel

by Anupam Mukhopadhyay

প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারি ২০২৫

গ্রন্থস্বত্ব : প্রিয়াঙ্কা মুখোপাধ্যায়

প্রচ্ছদ : হিয়া মুখোপাধ্যায়

ISBN : 978-93-48855-65-7

তবুও প্রয়াস প্রকাশনী কর্তৃক ১৯/২ রাধানাথ মল্লিক লেন (দ্বিতল) কলকাতা ৭০০০১২ থেকে প্রকাশিত

মোবাইল : ৮৬৪১৯৩৭৩৫৬, ৯৮৩৬৯২৯৫৮০

ই-মেল : tobuoproyasprokashoni@gmail.com

অক্ষর বিন্যাস

অরিন্দম দাশগুপ্ত

এ ডি লেজার পয়েন্ট, বেলঘরিয়া, কলকাতা ৭০০০৫৬

মুদ্রণ : ফাইকাস

১১৯, লেলিন সরণী, কলকাতা ৭০০০১৩

মা-কে

উপক্রমণিকা

একজন স্বাভাবিক মানুষ একটা অস্বাভাবিক সমাজের মধ্যে এসে পড়লে কী ঘটতে পারে? যখন তার আশেপাশে সবকিছু এবং সবাই অপ্রকৃতিস্থ, সে তখন কী করবে? কোন উচ্চতার দিকে হেঁটে যাবে সে? সর্বোপরি, মানুষের স্বাভাবিকত্ব কাকে বলে? স্বাভাবিক আচরণ কোনটা? এইসব কৌতূহল থেকেই আমি 'হত্যাবৃত্ত' লিখতে শুরু করেছিলাম। এই উপন্যাস সমকালীন পশ্চিমবঙ্গে একজন তথাকথিত ভালো মানুষের এসে পড়ার কাহিনি, হয়তো একজন দেবশিশুর কাহিনি, একটা অন্ধকার কুয়োর মধ্যে আলোকোজ্জ্বল এক পাখির পড়ে যাওয়ার কাহিনি। কী করবে সে? তার ডানার মাপ নিয়ে তার পারিপার্শ্বিকই বা কী করবে তার সঙ্গে?

ধর্ম, রাজনীতি ও যৌনতা এই উপন্যাসের তিনটে বড়ো দিক। কিন্তু এই তিনটেকে আলাদা করে চিহ্নিত কেন করতে হবে? এই তিনটে ছাড়া মানুষ বাঁচে না। বরং বলা যেতে পারে, ধর্ম রাজনীতি ও যৌনতার দূষণ এই উপন্যাসের একটা খুব বড়ো দিক। পাঠক তাঁর মস্তিষ্ক ও অন্তঃকরণ নিয়ে উপন্যাসের এই দিকটায় ভালো করে তাকাবেন, এমন আশা রাখছি। যদি কোনো দলীয় রাজনীতিতে তাঁর আস্থা থাকেও, আমার মনে হয় না সেটা কোনো বাধা হয়ে দাঁড়াবে। যেমন, যৌনতার ব্যাপারে যাঁর শুচিবায়ু আছে, কিংবা যিনি একজন ধার্মিক মানুষ, 'হত্যাবৃত্ত' তাঁর পড়ার পথেও খুব বাধা হয়ে উঠবে, আজকের দিনে দাঁড়িয়ে এমন মনে করি না।

এই উপন্যাসের নায়ক রাজকুমারকেই বলতে হবে। তার নামকরণ আমি করেছি দস্তয়েভস্কির 'দি ইডিয়ট' আর মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'চতুষ্কোণ' থেকে। সে একজন লেখক। এই উপন্যাসে একটা মজার ব্যাপার হল, যে অন্যতম প্রধান চরিত্রটি একজন রাজনৈতিক নেতা হিসেবে ফুটে উঠেছেন, তিনি একজন শিক্ষিত মানুষ, কিন্তু লেখক হলেও রাজকুমার বিদ্যায়তনিকভাবে শিক্ষিত নয়— প্রচুর পড়াশোনা ব্যক্তিগত আগ্রহে করলেও সে স্কুল-কলেজের পাঠ শেষ করেনি। এর উলটোটাই

হওয়া হয়তো উচিত ছিল। আমি সেটা মানিনি। রাজকুমার এই উপন্যাসে যা কিছু করেছে এবং বলেছে, সেসব যে আমি সমর্থন করি এমন নয়। পাঠকের কাছেও তেমন প্রত্যাশা নেই আমার।

বিভিন্ন সংবাদপত্র ও নিউজ চ্যানেলের সূত্র, কিছু মানুষের সঙ্গে আলাপচারিতা, সোশ্যাল মিডিয়ার বিভিন্ন ঘটনা ও পোস্ট, মেসেঞ্জার ও হোয়াটসঅ্যাপে কিছু ভুক্তভোগী মানুষের আবেগদীপ্ত কথোপকথন এই উপন্যাসে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। উপন্যাসের শেষে যে একটা উপন্যাসিকা যুক্ত হয়েছে, রাজকুমার চৌধুরীর লেখা, সেটার উপশিরোনামে ১৯৮১-র এক বিদেশি চলচ্চিত্রের নাম ব্যবহৃত হয়েছে। বলা বাহুল্য উপন্যাসিকাটা আমারই লেখা, সেটা এই উপন্যাসের পক্ষে সুবিধাজনক হয়েছে, নাকি অবান্তর হয়েছে, এই প্রশ্নের উত্তর পাঠকের উপরেই ছেড়ে দিলাম।

অনুপম মুখোপাধ্যায়

ঘাটাল

১৯/১০/২০২৪

আলেফ আলি

১

আমি আলেফ। আলেফ আলি। আমার নানা আমার এ নাম রেখেছিলেন। আলেফ হল আমাদের বর্ণমালার পহেলা বর্ণ। এই বর্ণ আল্লার প্রতিনিধিত্ব করে। সত্যের প্রতিনিধিত্ব করে। কিন্তু, আল্লা আমাকে মাফ করুন, আমি যে কাহানি বলতে যাচ্ছি, তার সত্যতা কতটুকু? আমি তো রাজুকে সমঝে উঠতে পারিনি। কখনও মনে হয়েছে ও একজন ফরিস্তা, এই মাটির দুনিয়ায় ওকে মানায় না, ও যেখানে পা ফেলে সে জায়গাটা জন্নত হয়ে যায়। কখনও মনে হয়েছে ও একটা মুর্দাখোর জানোয়ার, ও যদি কোনো ফ্যামিলিতে ঢোকে সেখানে আর শান্তি থাকে না, মানুষ আর নিশ্চিন্তে বাঁচতে পারে না, ও সব কিছু নষ্ট করে দেয়। ওকে সহ্য করতে পারিনি আমি। আবার ওর চোখের দিকে তাকিয়ে মনে হয়েছে ওকে নফরত করার চেয়ে নিজেকে মেরে দেওয়া ভালো। হ্যাঁ। নিজেকে মেরে দেওয়া। খুদখুশি। অন্য কোনো উপায় না থাকলে সেটাও করতে হতে পারে বই-কি। রক্তপাত নিয়ে আমার কখনও কোনো উলঝন হয় না। নিজের খুন হোক, বা অন্যের, খুন ঝরাতে আমার কখনও খারাপ লাগে না।

রাজুর চোখ! হ্যাঁ, ওর চোখ সত্যিই বেমিশাল! দুনিয়ায় অমন চোখ আর কারও নেই।

ওর চোখ আমি প্রথম দেখি ট্রেনে। ও আমার উলটোদিকে বসেছিল। আমি কিন্তু ওকে খেয়াল করিনি। কামরাটায় ভিড় ছিল না। সম্ভবত একেবারেই ফাঁকা ছিল। আমার নজর ছিল ফোনে। বাইরে তখন তুমুল বৃষ্টি। মনে হচ্ছিল ট্রেনটা বৃষ্টিকে ঠেলে এগোতেই পারছে না। আমার সঙ্গে কোনো ছাতা নেই। রেইনকোট নেই। সেদিন যে বিকেল থেকে অমন বৃষ্টি হবে, আমার ধারণাই ছিল না। স্টেশনের বাইরে বেরিয়ে বাইকটার কাছে পৌঁছোব কী করে? হোয়াটসঅ্যাপে সোনিয়ার সঙ্গে কথা বলছিলাম। ও-ও মানা করছিল সেদিন ওদের বাড়িতে যেতে। কিন্তু কয়েকদিন ওকে

দেখিনি। আমি আর থাকতে পারছিলাম না। সোনিয়াকে না দেখলে মনে হত দুনিয়ার ওপর থেকে আশমানটা কেউ টেনে তুলে নিয়েছে, হাওয়া বইছে না... মনে হয় ইহা আল্লাহ... জিন্দা লাশ হয়ে আছি...।

যদি পুরোপুরি ভিজেও যাই, সেদিন সোনিয়ার কাছে যাবই, ঠিক করে ফেলেছিলাম।

তখনই সামনে থেকে একজন শান্ত গলায় বলল, 'আপনি কি রূপনগর স্টেশনে নামবেন?'

তাকাতেই একজোড়া চোখ দেখতে পেলাম। অদ্ভুত! হেফজোখানার জানলায় কোনো নাদান বাচ্চার চোখ যেন আম্মার জন্য ইন্তেজার করছে! এই প্রথম কেউ কিছু দেখছে, এর আগে ওই চোখ কিছুই দ্যাখেনি, আমিই প্রথম ইনসান যাকে ওই চোখ দেখল! হ্যাঁ, আমিই দুনিয়ার প্রথম দৃশ্য। এমনও চোখও কারও হয়! তাকালেই মনে হয় সুকুন ঘনিয়ে এল, নিবিড় হয়ে ছায়া ঘনিয়ে এল, আর আমার কোনো তকলিফ নেই, আর আমার কোনো খোয়াইশ নেই...

প্রশ্নটার মধ্যে কিছু তো ছিলই। আমার সঙ্গী আলম তো হাসতে শুরু করেছিল। সকলের সঙ্গে কথা বলা আমার চলে না। হাসা চলে না। কিন্তু নিজের অজান্তেই আমার মুখেও হাসি চলে এসেছিল। সোনিয়াদের বাড়ি যেতে পারব কিনা, সেই অস্থিরতাও কমে গিয়েছিল। জিজ্ঞেস করে ফেলেছিলাম, 'আপনিও কি নামবেন নাকি ওখানে?'

'হ্যাঁ। নামব তো! কিন্তু আমি ওখানকার কিছুই চিনি না, জানেন!'

রাস্তায় হারিয়ে যাওয়া নাদান বাচ্চার মতোই কথা বলছিল ছেলেটা! আমার চেয়ে অনেকটাই কমবয়সি এক নওজওয়ান!— চব্বিশ-পঁচিশ উমর হবে। কিন্তু ছেলেটার মুখের ভাব দেখলে মনে হয় ষোলা-সতরা সালের জিয়াদা হবে না। খানিকটা রুগ্ন গোছের একটা মুখে ওই চোখদুটো ছাড়া ওর মধ্যে বলার মতো কিছুই নেই। রোগা কালো একটা ছেলে। জিনস আর টি-শার্ট পরে আছে। সাদা টি-শার্ট। বাঁ-দিকে কাঁধের কাছে একটু ময়লা লেগেছে। মনে হচ্ছে এই কয়েক মিনিটেই ওর আমার ওপর বেশ ভরসা জন্মে গেছে। আমাকে দেখে কি ও বুঝতে পারছে না, আমি ঠিক সহজ লোক নই? আমার সঙ্গে কথা বলতে তো লোকজন ভয় খায়!

হ্যাঁ, ওই চোখ! চোখদুটোর পাখনা আছে, কানকো আছে, পুচ্ছ আছে, আঁশ আছে! ঠিক মুখোমুখি দুটো মাছের মতো... ওরা যে-কোনো মুহূর্তে ওই শিশুর মতো সরল ইনসানটার মুখ থেকে সাঁতার কেটে বেরিয়ে আসবে, ঘুরে বেড়াবে এই ট্রেনের কামরায়, জানলা দিয়ে চলে যাবে বাইরের বৃষ্টিতে... অস্থির উদভ্রান্ত এই সময়ের মধ্যে ঘুরে বেড়াবে... ভাবতে ভাবতে ওর চোখ আমাকে কেমন অবশ করে দিচ্ছিল। ছেলেটা জিন-টিন নয় তো! কেমন যেন অসময়ের গোলাপ ফুলের মতো ফুটে আছে এই কামরায়!

ছেলেটা যেন আমার মনের কথা পড়তে পেরেই হাসতে হাসতে বলছিল, 'আমার নাম রাজকুমার চৌধুরী। কিন্তু সবাই আমাকে রাজু বলে ডাকে। রাজকুমার নামে আমাকে তেমন কেউ চেনে না।'

আমি তো ওর নাম জানতেই চাইনি! না চাইতেই কোন ইনসান নিজের নাম বলে! সেইসঙ্গে সে নামের একটা ছোটো ইতিহাস!

জিজ্ঞেস করেছিলাম, জিজ্ঞেস করতেই হত, 'কোথা থেকে আসছেন?'

'কলকাতা। আলিপুরে থাকি।'

'রূপনগরে আপনি কোথায় যাবেন?'

এই প্রশ্নটা করার আগেই যেন জবাব এল, 'বিবেকানন্দ বসাকের বাড়ি যাব। জানেন নিশ্চয়ই ওঁকে। উনি ওখানকার মিউনিসিপালিটির চেয়ারম্যান। আমার বাবার বন্ধু। ওঁরা একসঙ্গে কলকাতা ইউনিভার্সিটিতে পড়েছেন।'

আমি বেশ অবাক হয়েছিলাম। আংকলের বাড়িতে প্রতিদিন অনেক লোক আসে। তাদের অনেককেই আমি চিনি না। চেনার প্রয়োজনও হয় না। কিন্তু এই ছেলেটার তাঁর কাছে কী কাজ যে ট্রেনে চেপে এসেছে!

নিজেই বলে চলল, 'বাবা ওঁর কাছে আমাকে কিছুদিন থাকার জন্য পাঠিয়েছে। বাবা বলল, সে আর আমার হাত ধরে আমাকে হাঁটাতে চায় না।'

আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না ও কী বলছে, 'মানে?'

'বাবা বলল, আমাকে এবার নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে। তার আগে কলকাতা ছেড়ে থাকাটা অভ্যাস করতে হবে। কলকাতায় থেকে থেকে আমি নষ্ট হয়ে যাচ্ছি।'

'কেন আপনার কী হয়েছে?'

'আমি আসলে কোনো কাজকর্ম করতে পারি না। করতে গেলেই ভুলভাল হয়ে যায়। আমি যেসব কথা বলি, বাবার পছন্দ হয় না। বাবার ধারণা ওসব কথা বললে আমার বিপদ হবে। কিন্তু আমি কিছু কথা না বলে থাকতে পারি না, জানেন! শোনার লোক পেলেই ভিতর থেকে কথাগুলো বেরিয়ে আসে। বিভিন্ন গোলমালের মধ্যে জড়িয়ে পড়ি তার ফলে। প্রচুর চিন্তা করি তো! চিন্তাগুলো মুখ দিয়ে বেরোতে থাকে তেমন মানুষ পেলেই। তাই আমাকে আর বাড়িতে রাখল না বাবা। বিবেকানন্দকাকু খুব করিতকর্মা লোক, বাবা বলল, তিনি আমাকেও মানুষ করে দেবেন। দেখা যাক।'

আমার এবার সাচমুচ খুব হাসি পেল। ছেলেটাও হাসছে দেখলাম।

'কলকাত্তা ছেড়ে একটা ছোটা শহরে আপনার বাবা পাঠালেন মানুষ হওয়ার জন্য! আজিব তো!'

'সব লোকেরই তো মানুষ কাকে বলে সে নিয়ে একটা নিজস্ব ধারণা থাকে। বাবা মানুষ হওয়া বলতে যেটা বোঝে, সেটা আমি হতে পারিনি।'

'আপনি লেখাপড়া করেননি?'

'স্কুল-কলেজের লেখাপড়া করতে পারিনি। কিন্তু আমি বই-টই পড়তে পারি, জানেন! বাবা বিজনেস করলেও খুব পড়ুয়া লোক। প্রচুর বই কেনে। রাতে বই পড়ে। আমিও বাবার আলমারিতে যত বই ছিল সব পড়ে ফেলেছি। বাংলা... ইংরেজি... রবীন্দ্রনাথ... ডিকেন্স... তলস্তয়... দস্তয়েভস্কি... নিৎসে হাইডেগার... মার্ক... ফুকো... জাঁ বদ্রিলার... কিন্তু তারপরেও তো মুর্খ হয়েই আছি! হায়ার সেকেন্ডারি পরীক্ষা দিতে পারিনি। সুতরাং কলেজেও যেতে পারিনি। আসলে বাঁধাধরা লেখাপড়া অসহ্য লাগত, জানেন। কিন্তু আজকের দিনে কলেজে না গেলে কেউ মানুষ হয়? কেউ তাকে মানুষ ভাবে? বলুন না!'

এ তো বহেনচোদ গড়গড় করে সব আজিব নাম বলে গেল! যেন রেস্টুরেন্টের বয় মেনুকার্ড পড়ছে! ভিনদেশি রাইটারদের নাম এত কঠিন হয় কেন? আমি এসব রাইটারদের কারও নাম শুনিনি। সোনিয়া শুনে থাকবে। ও প্রচুর কিতাব পড়ে। আমি নিজে ফার্স্ট ইয়ারের পর কলেজ ছেড়ে দিয়েছি। স্টুডেন্ট পলিটিকসও আমাকে আটকে রাখতে পারেনি। আলমের দিকে তাকালাম। আলম ক্লাস সেভেন অবধি

পড়ে সোনার কাজ করতে মুম্বাই চলে গিয়েছিল। ফিরে এসে আর লেখাপড়া করেনি। সে হাসিতে ফেটে পড়তে চাইছে। কোনোরকমে নিজেকে আটকে রেখেছে। ইশারায় আলমকে হাসতে মানা করলাম। আলম এমনই। পরিস্থিতি বোঝে না। ইমামসাহেবের ভাতিজা হয়েও কোনো গেহরাই নেই ওর মধ্যে। এই ছেলেটা সরল হলেও আংকলের পরিচিত। বলছে বন্ধুর ছেলে। কোনোভাবে বেইজ্জতি যেন না বোধ করে।

তবু আমি নিজেই একটু বাঁকা সুরে বললাম, 'আপনি বারবার নিজেই মানুষ হননি বলছেন! তাহলে আপনার বাবা তো বিবেকানন্দ বসাকের বাড়িতে আপনাকে পাঠিয়ে ঠিকই করছেন। প্রচুর মানুষ না-হওয়া লোকজন দেখতে পাবেন ওঁর আশেপাশে। উনি মানুষের চেয়ে অমানুষদেরই ভালোবাসেন বেশি।'

ছেলেটা সেই অদ্ভুত চোখ মেলে আমার দিকে তাকিয়েছিল। নজর দিয়েই সাঁতার কাটছিল আমার চোখে-মুখে। ও কি আমার মনের ভিতরটা পড়তে পারছিল! পরে আমার অনেকবারই মনে হয়েছিল রাজু ইনসানের মন পড়তে পারে। ও আস্তে আস্তে বলেছিল, 'তাহলে তো উনি আমাকেও ভালোবাসবেন! কিন্তু আপনি যা বলছেন, উনি তেমন নিশ্চয়ই নন। আপনি মজা করছেন।' ঠোঁটে একটা হাসি—সেটায় কষ্টের ছাপ ছিল কি! ওর হাসিতে আমি কখনও ময়লা দেখিনি। ও ফরিস্তা হোক বা শয়তানের দূত, রাজুর মতো হাসতে আমি কাউকে দেখিনি।

তারপর বাইরের বৃষ্টির দিকে তাকিয়ে যেন নিজের মনেই বলল, 'আমি আরও এলাম পাহাড়টার টানে। রূপনগরে পাহাড় আছে না একটা? আমার অনেকদিনের ইচ্ছে জানেন, একটা শহরে থাকব যার সীমানায় একটা পাহাড় জেগে আছে, সারা শহর থেকে যেটাকে দেখা যায়।'

এই বৃষ্টির মধ্যেও সোনিয়াকে দেখতে পাওয়ার নিজের থেকেই একটা সুযোগ এসেছে। আমি আংকলকে ফোন করলাম, 'রাজকুমার নামে কারও আপনার কাছে আসার কথা আজ? আপনার কোনো দোস্তের ছেলে?'

'রাজকুমার...'

'রাজু?'

'আরে হ্যাঁ, তুই জানলি কী করে?'

'আমার সঙ্গে ট্রেনে আছেন উনি। আমি নিয়ে আসছি ওঁকে আপনার কাছে।'

'তাহলে তো ভালোই হয়! আমাকে আর গাড়ি পাঠাতে হয় না স্টেশনে। এই বৃষ্টি! ওর সঙ্গে তো আবার ফোনও নেই! চিন্তায় ছিলাম রে বেশ।'

আমি আংকলের সঙ্গে কথা বলার পর রাজুকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'আপনার সঙ্গে ফোন নেই?'

'না। ফোনে আমার সব ঘুলিয়ে যায়। তা ছাড়া ফোন আমি হারিয়ে ফেলি। বেশ কয়েকবার ফোন হারিয়েছি। বাবা মনে করেছে ইচ্ছে করেই হারিয়েছি। বাবা তাই আমাকে আর ফোন দেয় না। আমিও সিদ্ধান্ত নিয়েছি এ সময়েও যে মোবাইল ছাড়া বাঁচা যায়, সেটা করে দেখাব। মোবাইলের বিরুদ্ধে আমার অভিযোগ অনেক, জানেন তো! কিন্তু সেসব শুনতে আপনার হয়তো ভালো লাগবে না। আসলে সব মানুষেরই তো কোনো না কোনো সময় মনে হতে পারে চলমান সংস্কৃতির বিরুদ্ধে তার একটু ঘুরে দাঁড়ানো দরকার, তাই না? যা চলছে, তা পুরোপুরি ঠিক চলছে না, তাই না?'

সেই আমার পহেলিবার মনে হয়েছিল, ছেলেটা কি তাহলে মানসিকভাবে অসুস্থ? আমার এক খালা পাগলি হয়ে গিয়েছিল। এমনই সব আশমানি কথা বলত। শেষ কোন এক পিরের মাজারে নিয়ে গিয়ে পানি খাওয়াতে আবার চাঙ্গা হয়ে উঠেছিল। কিন্তু খালার চোখ এই ছেলেটার মতো তাজ্জব ছিল না। কেমন এই ছেলেটা! আজকের দুনিয়ায় ফোন ছাড়া কে থাকতে পারে! এই ছেলেটা এখন পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন। এর কিছু হয়ে গেলে তো তারা খবরও পাবে না!

ট্রেন রূপনগরে ঢুকছিল। বাইরে বৃষ্টি আরও বেড়েছিল। মনে হচ্ছিল পৃথিবীতে তখন পানি ছাড়া আর কিছু নেই। ট্রেনটাও পানি দিয়েই তৈরি।

স্টেশনের বাইরে এসে দেখলাম প্রায় একহাঁটু পানি জমেছে। দূরে পাহাড়টা বৃষ্টিতে ঝাপসা হয়ে আছে। ফ্যাকাসে মুক্তারং আকাশ দেখে মনে হচ্ছে না এ বৃষ্টি আজ থামবে। আলমকে বললাম, টোটো নিয়ে বাড়ি চলে যেতে। রাজুর দিকে তাকিয়ে দেখলাম তার চোখে যেন প্রচুর আনন্দ। আনন্দটা কীসের? এই পানির মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকার আনন্দ? নাকি একটা আনজানা বাড়িতে যাওয়ার আনন্দ? নাকি ওর আনন্দের জন্য কারণ লাগে না! ছেলেটার মাথায় গোলমাল আছে সন্দেহ নেই। কিন্তু ওর হাসির দিকে তাকালে নিজের মুখেও মুসকান ফুটে ওঠে। নিজেরই ছায়া

থেকে আলাদা হয়ে যাওয়া এক ইনসানের মতো বৃষ্টিতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সটান ভিজছে। কাঁধে শুধু একটা ব্যাগ নিয়ে এসেছে। ওটার মধ্যে নিশ্চয়ই অল্প জামাকাপড় ছাড়া আর কিছু নেই! এই আজিব ছেলেটাকে ট্রেনে একা সফর করানোর হিম্মৎ ওর বাড়ির লোক করল কী করে? এ তো যেকোনো মুহূর্তে হারিয়ে যেতে পারে দুনিয়ার পথে! নাকি এর বাড়ির লোক চায় এ এবার হারিয়েই যাক? একে নিয়ে হয়তো পেরেশান হয়ে গেছে তারা! আর পারছে না!

ওকে আমার রয়্যাল এনফিল্ডের পিছনে বসিয়ে পানিতে ভরে যাওয়া রাস্তা কাঁপিয়ে নিয়ে চললাম। এখন আমার বুকেও আনন্দ গুরগুর করছে। তিনদিন পরে সোনিয়াকে দেখব আজ। আর একটু পরেই।

রাজু আমাকে জাপটে ধরে আছে প্রায়। বিরক্তি বোধ করছিলাম। কিন্তু কিছু বললাম না। কিছুক্ষণ পরে ও আমার কাঁধের ওপর দিয়ে মুখ বাড়িয়ে বলল, 'আপনি তো খুব চমৎকার মোটর সাইকেল চালান! এত জলের মধ্যেও কী সুন্দর নিয়ে যাচ্ছেন!'

আমি হাসলাম, 'আমি সত্যিই আচ্ছা চালাই। এই বাইক নিয়ে আমি কত দূর দূর তক গেছি, আন্দাজ করতে পারেন?'

'কোথায়? কলকাতা?'

'ধুর! কোলকাত্তা তো ঘরের কাছে! বনারস গেছি। এলাহাবাদ গেছি।'

'একাই?'

'একা কেন! আমাদের দল আছে। আমাদের দলের নাম আছে জানেন, জবরদস্ত নাম, আমাদের বাইক গ্রুপের নাম ক্রুসেডার্স।'

'বাবা! ধর্মযোদ্ধা!'

'হাঁ। আপনি জানেন! ধরমযোদ্ধা।' তারপর কী খেয়াল হল, ওকে বললাম, 'আমার পূর্বপুরুষ মোগল বাদশার ফৌজে যুদ্ধ করত, জানেন! নবাব আলিবর্দি আমাদের বাংলায় নিয়ে এসেছিলেন। তখন দুশমনের সঙ্গে লড়তাম। এখন আপনাকে সঙ্গে নিয়ে এই এক হাঁটু পানির সঙ্গে লড়ছি... হা হা হা হা হা...'

তুমুল বৃষ্টির মধ্যে এগোতে এগোতে মনে হচ্ছিল আশমান থেকে ঝরে পড়া পানির শরীরেও সোনিয়ার গায়ের স্বাদ আর খুশবু পাচ্ছি। ইচ্ছে করছিল বহেনচোদ

বৃষ্টিকেই নিংড়ে নিই। নিজের সঙ্গে মিশিয়ে নিই। মনে হচ্ছিল ঝরে পড়া এই পানির মধ্যে সত্যিই আমার চাহাত লেগে আছে। দুনিয়া থমকে আছে রক্তগন্ধের এক প্রবল খুশবুতে। ডোবাও ডোবাও... ডুবিয়ে নাও আমাকে। সোনিয়ার সঙ্গে আজ যদি দেখা না হয়, খুদার কসম, আমি পাগলা হয়ে যাব।

জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনার আজ ভিজে গিয়ে তবিয়ত না খারাপ হয়ে যায়!'

রাজু বলল, 'আমার চট করে শরীর খারাপ হয় না। শুধু সঙ্গে কিছু লেখালেখি আছে। সেগুলো জলে ভিজে গেলে মুশকিল।'

'লেখালেখি? আপনি কি রাইটার নাকি?'

জবাব মেলার আগেই আংকলের বাড়িতে এসে গেলাম। বেলের আওয়াজে দরজা সোনিয়াই খুলল। ওই তো! মনে হল দুটো পাল্লার মাঝখানে আমার জিন্দেগির রোশনাই দাঁড়িয়ে আছে। একটা বাসন্তী রঙের হাউসকোট পরে আছে সোনিয়া। চুলটা এলো করে দেওয়া। হাতে আমারই দেওয়া কয়েকটা কাচের রঙিন চুড়ি আর একটা সাদা মলাটের কিতাব। কানে টুকটুকে লাল রঙের ইয়ারফোন। বাইরে বৃষ্টির মধ্যে দাঁড়িয়ে ভিজতে ভিজতে আমার মনে হল কী গান শুনছে ও? ইচ্ছে হল নিজে শুনে গানটা এঁটো করে দিই। এই মেয়েটার জন্য আমি আমার জান দিতে পারি, ইমান দিতে পারি। এই মেয়েটাই আমার সর্বস্ব। এ যদি আমাকে ছেড়ে দেয়, আমি সঙ্গে সঙ্গে মরে যাব। কিন্তু ও তো আমার দিকে তাকাচ্ছেই না! আমার পিছনে দাঁড়িয়ে থাকা রাজুর দিকে ওর চোখ! সে তো হবেই। অচেনা মানুষ এসেছে আমার সঙ্গে। আর রাজুর চোখের মধ্যেও তো জাদু আছে। আমিও ট্রেনের কামরায় চোখ সরাতে পারছিলাম না।

আংকল নিজে উঠে এসেছেন। জড়িয়ে ধরলেন রাজুকে। ও যে ভিজে গেছে তাতে চিন্তিত হলেন। ওকে তাড়াতাড়ি ঘর দেখিয়ে দিতে বললেন সোনিয়াকে। সোনিয়া রাজুকে নিয়ে উপরে গেল। আমার সঙ্গে ওর কোনো কথাই হল না।

আংকল আমাকে বললেন, 'কী রে, তুই-ই নিয়ে এলি... কিন্তু বাইকে এলি! এই বৃষ্টিতে!'

ভাগ্যিস অজুহাত ছিল! বললাম, 'জি। মনে হল আপনাদের বাড়ি চিনতে পারবে না। তাই একদম নিয়ে এলাম।'

'একটা টোটো নিতে পারতিস তো! আমি তো গাড়ি পাঠাব ভাবছিলাম! ইশ! তুইও তো পুরো ভিজে গেছিস! করিমের সঙ্গে দেখা হয়েছে?'

'হ্যাঁ। ও আপনার কথা মানতে রাজি আছে।'

'বাহ। কিন্তু ওর আর কোনো রাস্তাও তো নেই। তবে এখনই খুব বেশি পাত্তা দিস না করিমকে। দূরে দূরে রাখ কিছুদিন। আর... আলেফ তুই বাবা আগামীকাল... না না, আগামীকাল আমি সারাদিনই তো থাকব না... তুই বরং পরশু সন্ধেবেলায় আয়। অন্য একটা কাজের কথা আছে।'

আংকল জলদি ওপরে চলে গেলেন। কথা বলার সময়ই নেই! মনে হল বেশ কিছু লোক জমেছে এখন ওঁর চেম্বারে। অনেকগুলো গলার আওয়াজ পাচ্ছি। সিঁড়ির তলাতেও অনেক বৃষ্টিভেজা জুতো খোলা আছে। সাদা মার্বেল কাদা হয়ে আছে। কী চলছে আজ এখানে? আমি জানিই না! আজকাল অনেককিছু যেন জানতে পারছি না আমি আংকলের ব্যাপারে! অথচ সবাই বলে রূপনগরে একটা পাতাও কাঁপে না আমার অজান্তে।

কিন্তু আমি দাঁড়িয়ে রইলাম। সোনিয়ার জন্যই অপেক্ষা করছিলাম। জানি ও নেমে আসবে আমার কাছে একবার। আসবেই।

নেমে এল। ফিসফিসিয়ে বলল, 'এত বৃষ্টিতেও আসতে হল তোমাকে?'

'তোমাকে না দেখে থাকতে পারছিলাম না জানো!' শ্বাস বন্ধ করে বললাম, 'এই পানি আর কতটুকু! তোমার জন্য আগুনের দরিয়া পার হতে পারি সাঁতার কেটে...'

'বাদ দাও! জানা আছে...'

'কিছু জানো না তুমি...'

'কতবার বলেছি পানি বলবে না, জল বলবে? দরিয়া মানে কী? রিভার? নাকি সমুদ্র? তুমি তো বাঙালি নাকি! স্কুল থেকে বাংলাটা তো ভালোই জানো! বাংলায় হায়েস্ট মার্ক পেয়েছিলে একবার তুমিই তো বলেছ! খুব ফ্লুয়েন্টলি বাংলা বলতে পারো আমিও দেখেছি। উর্দু ফার্সি ওয়র্ডসগুলো জোর করে তবু কেন বলতে হয় তোমাকে?'

'আর তুমি যে ইংরেজি বলো কথায় কথায়! তা ছাড়া আমার শরীরে কিন্তু বাঙালি খুন নেই। এটা আমার ফ্যামিলির দস্তুর। তুমিই তো বলো নিজের সংস্কৃতি ছাড়তে

নেই! কালচার? পানিকে জল বললে আমার কালচারের কী হবে? আমার পূর্বপুরুষদের কী হবে? আমার পূর্বপুরুষ বাংলার বাইরে থেকে এসেছিলেন।'

'সেটা কতদিন আগে? সে তো নবাবের টাইম! এখন কোন মুসলমান তোমার মতো কথা বলে? তৌহিদুল বলে? মঞ্জুরুল বলে? তোমাদের ইমামসাহেবও তো খাঁটি বাংলাতেই কথা বলেন! আর তুমি... চোখে সুর্মা লাগিয়ে... আতর মেখে... কী বিচ্ছিরি... তুমি কি উটে চড়ে এলে নাকি বাইকটায় চড়ে, বলো তো?'

আমি কান না দিয়ে ওকে চুমা দিতে গেলাম।

'এক ঘুষি মারব!' নকল রাগে ঠোঁট ফুলিয়ে বলল সোনিয়া।

আমি এবার ওকে সত্যিই জড়িয়ে ধরতে গেলাম। ও ওপরের দিকে তাকিয়ে একটু সরে গেল। আমি ছাড়লাম না। জড়িয়ে ধরলাম। ওকে ভিজিয়ে দেব আমার শরীর থেকে ঝরতে থাকা বৃষ্টিতে। না, একটা চুম্মা না নিয়ে যাব না আমি আজ। ওকে একবার দু-হাতে নিয়ে পিষে ফেলতে হবে আমাকে। নাহলে সারারাত নিন্দ আসবে না। ওকে এভাবে পেয়েও হয়তো নিন্দ হবে না। তবু কিছু তো আদায় করব...

ওর মুখে জিভ ঢোকাতে যাচ্ছি, সিঁড়ি দিয়ে ছুটে নেমে এল একজন।

রাজকুমার চৌধুরী!

শুধু জিনসটা পরে আছে। ভিজে টি-শার্টটা খুলে ফেলেছে। সারা গা ভিজে আছে। বুকের বালগুলো লেপটে আছে, পানি গড়াচ্ছে... কোমরে আন্ডারওয়্যারটা দেখা যাচ্ছে... শালা, আজিব চিড়িয়া তো! বেশরম! পাগলা! এ আমি কাকে নিয়ে এলাম আমার সোনিয়ার বাড়িতে!

'ওহ! আপনি এখনও আছেন! যাক! আপনাকে তো আমার ধন্যবাদ দেওয়াই হয়নি!'

আমাকে কি শিকার কেড়ে নেওয়া শের মনে হচ্ছিল? তীব্র রাগটা চেপে নিয়ে বললাম, 'কীসের ধন্যবাদ?'

'বাহ! আপনি আজ আমার বড্ড উপকার করলেন। এমন বৃষ্টির মধ্যে... নিয়ে এলেন। রাস্তায় তো কেউ নেই। আমি বাড়ি চিনে এখানে আসতেই পারতাম না।'

'ও কিছু নয়।' আমি বুঝতে পারছিলাম আমার গলা খুনির মতো শোনাচ্ছে। 'আমি আজ এখানে এমনিতেই আসতাম। আর আপনি কোনো টোটোকে বললেই আপনাকে এখানে পৌঁছে দিত। বৃষ্টির জন্য হয়তো দশ টাকা জাদা নিত। বরং এত ভিজতে হত না আপনাকে।'

রাজু অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে। সেই দুটো চোখ! মাছের মতো... কখনও আমার দিকে, কখনও সোনিয়ার দিকে। যেন কিছু বুঝতে চাইছে। পারছে না।

আঁশ... পুচ্ছ... কানকো...

আমি এখনও সোনিয়াকে ছাড়িনি। সোনিয়াই নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে চাইছে।

'আপনার নামটাও তো আমার জিজ্ঞেস করা হয়নি!'

সোনিয়াই এবার জোর খাটিয়ে নিজেকে ছাড়িয়ে নিল। তারপর তাকাল ভালো করে রাজুর দিকে।

পা থেকে মাথা অবধি রাজুকে দেখল মন দিয়ে।

খিলখিল করে হেসে উঠল তারপর।

২

দু-দিন পরে ওদের বাড়িতে গিয়ে দেখেছিলাম, মনেই হচ্ছিল না রাজু ও বাড়ির লোক নয়। মনে হচ্ছিল ও বসাক ফ্যামিলিতেই পয়দা হয়েছে। বড়ো হয়েছে। কিংবা বড়ো হতে পারেনি কোনোদিন। দেখলাম ও ওর সেই আজিব চোখ মেলে আরামসে বাড়ির সর্বত্র ঘুরে বেড়াচ্ছে। এমনকি দেখেছিলাম আংকলের চেম্বারে গিয়েও ও বিন্দাস বসতে পারে, যখন লোকজন আছে, আংকল আলোচনা করছেন, কেউ কিছু মনে করছে না। আমি ও বাড়িতে বছর তিনেক যাচ্ছিলাম। আংকল আমাকে বাড়ির ছেলেই বলতেন। সহজ হতে পারিনি কখনও। অনেক ফিকির করে বাড়ির মধ্যে সোনিয়ার সঙ্গে দেখা করতে হত আমাকে। সোনিয়া নিজেই সেটার ব্যবস্থা করত।

খুবসুরত ছেলেটা কি কালা জাদু জানত? মানুষকে বশ করতে একটুও দেরি হত না ওর! আবার কাউকে চরম রাগিয়ে দিতেও পারত ও। তখন সামনের লোকটা ওকে খুন করেও ফেলতে পারে। রাজু যে একটা পিন খুলে নেওয়া গ্রেনেডের মতো চিজ, যে-কোনো মুহূর্তে হাতের মধ্যে ফেটে যেতে পারে, সেটা ধীরে ধীরে বুঝতে

পেরেছিলাম। কিন্তু ওকে ভালোবাসা যত সহজ, ভয় করাটা ততই কঠিন ছিল, বিশেষ করে ওর সামনে দাঁড়িয়ে।

আংকলের চেম্বারে ঢুকেই ওকে দেখেছিলাম। আমাকে দেখে হইহই করে উঠল। যেন খুব কাছের মানুষের দেখা অনেকদিন পরে পেয়েছে। ওর রুগ্ন মুখে খুশি আর উদাসী, রোশনি আর আন্ধেরা খুব সাফ হয়ে চোখে পড়ত। মনের ভাব ও লুকোবার কোশিসই করত না। কিংবা লুকোবার দরকারই হত না ওর। রাজুর সরলতাই ওর হাতিয়ার, আমার পরে মনে হয়েছে। তখন মনে হয়েছে মানুষের সরলতা জিনিসটা বন্দুকের চেয়েও খতরনাক। কখন কার কলিজা জখম করে দেবে, বহেনচোদ, বোঝাই যায় না! কিংবা, রাজুকে সরল ভাবাটা আমার ভুল হয়েছিল।

'আলেফ ভাই...'

রাজু আমাকে জড়িয়ে ধরল। আলগা করে নয়। গায়ের জোর দিয়ে।

কোনো জওয়ান আদমি জড়িয়ে ধরলে আমার একটু অস্বস্তি হয়। তা ছাড়া কারও সঙ্গে খুব গভীরভাবে মেশার অভ্যাসও আমার নেই। ছাড়িয়ে নিয়েছিলাম নিজেকে একটু বিরক্তভাবেই। রাজু যেন খুব অবাক হয়ে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল আমার মুখের দিকে। তারপর যেখানে বসেছিল, আবার বসে পড়ল।

আংকল দরাজ গলায় বলেছিলেন, 'আয় আয় আলেফ! তোর তো আজকাল দেখাই পাওয়া যায় না!'

ওটা বিলকুল কথার কথা। আমাকে ডাকলেই আমি আসি। না ডাকলেও প্রায়ই আসি। এ বাড়িতে আসার জন্য আমি মুখিয়ে থাকি। মুগ্ধ মন নিয়ে যতটা দীর্ঘ সময় এ বাড়িতে কাটাতে পারি, ততই আমার পিয়াস বেড়ে যায়। কিন্তু কিছুদিন থেকেই টের পাচ্ছি আমার সামনে আংকল একটু মিইয়ে যান। ব্যাপারটা কী বুঝে উঠতে পারছি না। মিউনিসিপাল ইলেকশন তো প্রায় এসেই পড়ল! আর কয়েক মাস। এবার দেওয়াল লিখনের জন্য দেওয়াল দখল শুরু করতে হবে। পোস্টার ফেস্টুন বানাতে হবে। আমাকে লাগবে না, নাকি! আমাকে নিয়ে কী ছক কষছেন উনি? আংকলের মাথায় কী ঘুরছিল আল্লাও হয়তো বলতে পারতেন না।

মুখে বলেছিলাম, 'একটু ব্যস্ত আছি। আম্মির তবিয়ত ভালো নয়।'

'সে কী রে! কী হয়েছে ওঁর?'

আমি পাত্তা না দেওয়ার মতো করে বলেছিলাম, 'বয়স হয়েছে তো!'

'কত বয়স! ছেলের এইটুকু বয়স যখন! বরং আমাদেরই বয়সের গাছপাথর নেই।'

বলেই আংকল হেসে উঠলেন। সঙ্গে ঘরের বাকিরাও। বিবেকানন্দ বসাক হাসলে হেসে উঠতেই হয় তাঁর আশপাশের আদমিদের। কেবল রাজু আর হাসল না। ও মনে হয় নকল হাসি হাসতে পারে না। আমার দিকে তাকিয়েছিল। ওভাবে আমি নিজেকে ছাড়িয়ে নিলাম বলে কি ওর আঁতে লেগেছে নাকি! চিন্তাটা আমার মাথায় এল। কিন্তু আমি উড়িয়ে দিলাম। রাজু কী ভাবল, তাতে আমার কী এসে যায়! আঁত বলে কিছু ওর আছে বলেই তো মনে হয় না!

'ডাক্তার কী বলছে?'

'হার্টের তকলিফ। তার উপর অ্যালঝাইমার্স না কী একটা মাথার বিমারি...'

'সে তো খুব বিশ্রী রোগ!'

তারপর আংকল যেন ঝিমিয়ে পড়া আসরকে আবার চাঙ্গা করার জন্যই বললেন, 'রাজু খুব মজার কথা বলছে রে আলেফ! শোন ও কী বলছে। বলছে সূর্য যদি পৃথিবীর চারদিকে ঘোরে কেউ বলে আজকের দিনে, সেটাও নাকি ভুল নয়! বলো বলো রাজু! বেশ ইন্টারেস্টিং!'

রাজু আমার দিকে তেমন করেই তাকিয়ে বলল, 'মনে করুন আপনি একটা খুব দ্রুতগামী ট্রেনে চেপে যাচ্ছেন। আপনার হিসু পেয়েছে। লোককে জিজ্ঞেস করলেন কোথায় হিসু করার জায়গা। একটা লোক দেখিয়ে দিল। কিন্তু সিট থেকে উঠে সেখানে যেতে যেতে ট্রেনটা কত রাস্তা পেরিয়ে আসবে বলুন তো! হয়তো এক কিলোমিটার। হয়তো দেড় কিলোমিটার। আপনি হয়তো কয়েক পা হেঁটেই সেখানে পৌঁছে গেলেন! এখন কেউ যদি বলে আপনি দেড় কিলোমিটার রাস্তা হেঁটে গিয়ে হিসু করে এলেন, আপনার বিশ্বাস হবে না। কিন্তু সে কি ভুল বলবে? তেমনই এটা বলা ভুল নয় যে সূর্য পৃথিবীর চারদিকে ঘুরছে। চাইলে কেউ বলতেই পারে ব্রহ্মাণ্ড পৃথিবীকে কেন্দ্র করেই ঘুরছে। এটা একটা বইয়ে পড়েছিলাম। সেখানে অঙ্ক-টঙ্ক কষে অনেককিছু দেখানো হয়েছিল। সব বুঝতে পারিনি। আমি অংকে খুব কাঁচা তো! যোগ-বিয়োগও ঠিকভাবে করতে পারি না আমি।'

আংকল আমার দিকে একবার তাকালেন। তারপর আলগাভাবে জিজ্ঞেস করলেন, 'কোনো ইসলামি বই ছিল কি সেটা?'

'না না... ধর্মের বই নয় কাকু! একটা মজার বই। তাতে এরকম মজার মজার আরও অনেক কথা ছিল। সেখানেই দেখেছিলাম মহাজগতে ঠিক আর ভুল বলে নাকি কিছু হয় না।'

আমার ওর এসব আশমানি কথা শুনতে ইচ্ছে করছিল না। আমি সোনিয়ার কথাই ভাবছিলাম। ও কি বাড়িতে নেই! সারা বাড়ি তো সোনিয়ার খুশবুতে ভরে আছে! আজ সকালেই হোয়াটসঅ্যাপে বলছিল আমার সঙ্গে দেখা হবে জানলে ওর সব কিছু খুবসুরত লাগে। গান গাইতে ইচ্ছে করে ওর। কতদিন ওর গান শুনিনি! কতদিন ওর সঙ্গে একলা বসিনি কোথাও! বুকের ভিতর যেন একরাশ শুকনো বালি জমে আছে! পেয়ার-মুহব্বত বড়ো হানিকারক চিজ! আল্লা এই লেড়কি জাতটাকে এমন বানিয়েছেন! শালা সব গোলমাল করে দেয়। কেবল ইচ্ছে করে ওকে বাইকে চাপিয়ে পাহাড়ের রাস্তায় চলে যাই, ব্যারেজটার কাছে গিয়ে বসি, জলের আওয়াজ আর ওর গানের গলা মিশে যাক একসঙ্গে... তারপর সেই বড়ো পাথরটার আড়ালে ওকে নিয়ে গিয়ে... এই বর্ষায় যখন জঙ্গলের শিরায় শিরায় খুন ছুটছে... পোড়া ঘাসগুলো বেঁচে উঠেছে... কখন কোন ফুলের গন্ধ তোমাকে তোমার সব নাঙ্গা করে দেবে তার ঠিক নেই...

তাপসরঞ্জন রায় কড়া গলায় বললেন, 'এসব কথা মজার নয় রাজকুমার। এসব কথা ভয়াবহ। মানুষকে কুসংস্কারের দিকে নিয়ে যাবে এসব চিন্তা। তুমি গ্যালিলিয়োর ইতিহাস কি ভুলে গেলে? আপনি ভাবতে পারেন বিবেকানন্দবাবু, সূর্য পৃথিবীর চারদিকে ঘুরছে, এটা যদি কোনোভাবে আজ যুক্তির ভান দিয়ে প্রতিষ্ঠা করে দেওয়া যায়, মৌলবাদীদের কতখানি সুবিধা হবে? কেউ আর আধুনিক বিজ্ঞানের দিকে তাকাতে চাইবে? সবাই ধর্মগ্রন্থগুলোকেই শেষ কথা বলে মেনে নেবে।'

তাপসবাবু প্রসাদময়ী হাইস্কুলের এক্স টিচার। ফিজিক্স পড়াতেন। অনেকদিন থেকেই শহরে একটা যুক্তিবাদী সমিতি চালান। আলবত বাড়াবাড়ি করেন। রাস্তায় কারও গলায় বা হাতে তাবিজ বা মাদুলি দেখলেই তাকে ধরে লেকচারবাজি শুরু

করে দেন, ছিঁড়ে ফেলে দেওয়ার কোশিস করেন। প্রতিবেশীর বাড়িতে সত্যনারায়ণ পুজো হচ্ছে হয়তো, উনি না ডাকতেই ঢুকে পড়ে আজেবাজে মন্তব্য করতে থাকেন, পুরোহিতকে অপমান করেন। এর ফল হয়েছে, শহরে সবাই এখন ওঁকে একটু খ্যাপাটে লোক বলেই জানে। ওঁর সমিতিতে মেম্বার কমতে কমতে এখন তিন-চারজনে দাঁড়িয়েছে। তারাও ওঁকে বিশেষ পাত্তা দেয় না। এমন আদমিকে আংকল কেন খাতির করেন কে জানে! ওঁকেও কি মিউনিসিপাল ইলেকশনে দাঁড় করাবেন নাকি? তাহলে নিজেদের লোকেরাও ভোট দেবে না। এ শহরের রাজনীতিতেও এখন ধর্মের হাওয়া বইতে শুরু করেছে। পাড়ায় পাড়ায় মন্দির প্রতিষ্ঠা হচ্ছে। মসজিদে নমাজের আওয়াজ লাউড স্পিকারে বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। হাওয়া গরম।

রাজু একটু বেজান গলায় বলল, 'কিন্তু সমাজে সবরকমের চিন্তারই জায়গা থাকা উচিত নয় কি? আমার তো মনে হয় ধর্মগ্রন্থগুলোও আমাদের মন দিয়ে পড়া উচিত। তারাও তো কিছু বলতে চায়! না পড়ে কোনো বইকে অস্বীকার করা মুক্ত চিন্তার লক্ষণ হতে পারে না। আমি বলছি না কাউকে হিন্দু হতে হবে, খ্রিস্টান হতে হবে, বা মুসলমান হতে হবে। কিন্তু হাজার হাজার বছর আগে ওই বইগুলোই তো ছিল! ওগুলো থেকেই সব কিছুর সূত্রপাত। আর যদি কুসংস্কারের কথা বলেন, আজকের যে ফিজিক্স বা কেমিস্ট্রি, তাদেরও মূল তো অ্যালিকেমিস্ট্রি! আজ থেকে হাজার বছর আগে ইউরোপে বিজ্ঞানী কাদের বলা হত? যারা পরশপাথর তৈরির চেষ্টা করত, আর অমৃত আবিষ্কারের জন্য সারাজীবন লেগে থাকত। আজ তাদের কথা ভাবলে আমাদের হাসি পায়। কিন্তু কে বলতে পারে, আজ থেকে হাজার বছর পরে আজকের বিজ্ঞানীদের নিয়েও মানুষ হাসাহাসি করবে না?'

রাজু এমনিতে বেশ গুছিয়েই বাতচিত করতে পারে দেখছি! অনেক ব্যাপারে ওর ভালোই সমঝদারি আছে। বহেনচোদ কি তবে পাগলা সেজে থাকে! এসব কথা ও জানল কোথা থেকে! কোন কিতাবে এসব লেখা আছে!

তাপসবাবু বললেন, 'হাজার বছর পরে কী হবে সেটা ভেবে কি আজকের দিনটাকে অস্বীকার করা যায়?'

'আমি অস্বীকার করছি না। আমি শুধু বলছি পৃথিবীতে যতরকমের চিন্তা আছে, তাদের মধ্যে দেওয়া-নেওয়া থাকা উচিত। হয়তো ধর্মগ্রন্থগুলোর কাছ থেকেও আমাদের অনেককিছু নেওয়ার আছে। আমি বাইবেল কোরান গীতা উপনিষদ সবই পড়েছি। অবাক হয়ে গেছি ওগুলো পড়তে পড়তে। কতরকমের আশ্চর্য কথা যে ওদের মধ্যে লুকিয়ে আছে! আসলে কী জানেন, লুকিয়ে রাখা আছে! ওদের ফুরিয়ে যাওয়া বই ভাবাটা ঠিক নয়। গ্রন্থ কখনও ফুরিয়ে যায় না। মৌলবাদীদের সমস্যা হল তারা নিজেদের ধর্মগ্রন্থগুলো কখনও বুদ্ধি খাটিয়ে পড়েইনি। যদি পড়ত তাহলে ভারতে আজ মৌলবাদ বলে কিছু থাকত না। দেখুন, হিন্দুত্ববাদীরা যে এত রাম-রাম করে, তারা কি বাল্মীকির রামায়ণ আদৌ পড়েছে? রামায়ণ নিয়ে কোনো প্রশ্ন করলে উত্তর দিতে পারবে? অথচ আমার মনে হয় ধর্ম এদেশের মাটি আর মানুষের অস্তিত্বের সঙ্গে মিশে আছে। সেটাকে আলাদা করা সম্ভবই নয়। সে চেষ্টা না করে বরং শিশুদের মধ্যে ধর্মশিক্ষা চালু করা উচিত, যাতে তারা বুঝতে পারে পৃথিবীর সব ধর্ম একই কথা বলে, তবে খুব নৈর্ব্যক্তিক আর বিজ্ঞানসম্মতভাবে সেটা করা উচিত। হিন্দু শিশুরা কোরান পড়বে... মুসলিম শিশুরা গীতা পড়বে...'

'তাই নাকি?' তাপসবাবু বললেন, 'মৌলবাদের যে আজ এত বাড়াবাড়ি সেটার জন্য তোমার মতো মানুষরাই দায়ী রাজু। যারা কিছু কিছু লেখাপড়া হয়তো করেছে, কিন্তু তাদের চোখ খোলেনি। তারা বুঝতে পারছে না আজকের দিনে ভারতবর্ষে দাঁড়িয়ে নাস্তিক না হওয়াটা একটা ক্রাইম। আজকের দিনে যারা ধর্মে বিশ্বাস করে তারা হয় অন্ধ নির্বোধ নাহলে অপরাধী। শিক্ষিত লোকের আজ কোনো অধিকারই নেই আস্তিক হওয়ার। এটা যদি তোমরা বুঝতে, সাধারণ মানুষের মধ্যে অন্ধকার অনেক কমে যেত।'

রাজু সঙ্গে সঙ্গে বলল, 'মানুষের মধ্যে অন্ধকার তো ধর্মকে তুলে দিলেও থাকবে স্যার! মানুষ হল ট্রাইবাল প্রাণী। মানুষ সবসময়ই নিজেকে একটা গোষ্ঠীর অন্তর্গত মনে করে, আর অন্য গোষ্ঠীকে শত্রু ভাবে। যার সঙ্গে তার পছন্দ-অপছন্দ মেলে না সে তার শত্রু হয়ে যায়। এটার বাইরে মানুষ উপযুক্ত শিক্ষা ছাড়া যেতে পারবে না। কেউ যদি পশ্চিমবঙ্গের রাস্তায় দাঁড়িয়ে আজ বলে রাম একজন কাপুরুষ ছিলেন, তাকে কুড়ি জন লোক এসে মারবে। কেউ যদি রাস্তায় দাঁড়িয়ে বলে মুহম্মদ একজন

মিথ্যাবাদী ছিলেন, তাকেও হয়তো পনেরোজন লোক এসে মারবে। তেমনই, কেউ যদি রাস্তায় দাঁড়িয়ে চিৎকার করে বলে উত্তমকুমার একজন খুব খারাপ অভিনেতা ছিলেন, আর সৌমিত্র চ্যাটার্জি একজন অসাধারণ অভিনেতা, তাকেও অন্তত তিনজন লোক এসে চেপে ধরবে, যদি পাগল ভেবে ছেড়ে দেয় আলাদা কথা, নাহলে তাকেও মার খেতেই হবে। যদি হিন্দু আর মুসলিমের ভেদ না থাকত, তাহলে হয়তো আমাদের দেশের মানুষ দুজন অভিনেতা বা দুটো রাজনৈতিক দল বা দুজন ক্রিকেটারের মধ্যে কে সেরা সেটা নিয়ে দাঙ্গা করত। যেমন ইউরোপে ফুটবলের দাঙ্গা হয়। বিশ্বকাপের সময় যে দেশে ব্রিটিশ সমর্থকরা যায়, সে দেশ ভয় পেয়ে যায়।'

তাপসবাবুর চোখ দেখে মনে হচ্ছিল আগ ফুটে বেরোবে, রাজুকে পুড়িয়ে ছাই করে দিতে চাইছেন উনি নজর দিয়েই।

রাজু আবার বলল, 'আগে উত্তর ভারত আর দক্ষিণ ভারতের আজগুবি লড়াইটার কথা ভাবুন স্যার! নিজেদের আর্য আর দ্রাবিড় ভেবে যারা আজও লড়ে যাচ্ছে, সেই কবে ব্রিটিশরা আর্য অনুপ্রবেশের থিয়োরি মাথায় ঢুকিয়ে দিয়ে গেছে, আজও বেরোল না, আজও দক্ষিণ ভারতে উত্তর ভারতের বিরোধিতা আর হিন্দির বিরোধিতা একটা প্রধান রাজনৈতিক ইস্যু হয়ে আছে, তার কী হবে? শ্রীলঙ্কায় সিংহলি আর তামিলদের যে সংঘাত, তার কী হবে? স্যার, ধর্ম যদি না থাকে ন-নম্বর জুতো পরা লোকেদের সঙ্গে দশ নম্বর জুতো পরা লোকেদের দাঙ্গা হবে। ধর্ম আমাদের দেশে একটা স্থায়ী রাজনৈতিক ইস্যু হয়ে আছে বলেই কি আপনি ধর্মকে তুলে দেবেন? মাথা কেটে কি মাথার যন্ত্রণার চিকিৎসা হয় স্যার?'

'বাজে কথা বলছ। সব কিছুকে কি তুমি এতই সরল ভাবো নাকি? শুধু আজ নয়, ধর্ম আমাদের দেশের চিরকালীন সমস্যা। আর শুধু আমাদের দেশে কেন, সারা পৃথিবীতেই ধর্ম একটা বিরাট সমস্যা! প্যালেস্টাইনে কী চলছে? ক্রুসেড কেন ঘটেছিল?'

'ধর্ম না থাকলে অন্য কোনো কারণে ওই ঘটনাগুলোই হয়তো অন্যভাবে ঘটত। আলেকজান্ডার বা নেপোলিয়ন কেবল সাম্রাজ্য বিস্তারের জন্য কত মানুষ মেরেছিল? তারা তো মহান বীর হয়ে আছে ইতিহাসে! স্পেন কী করেছিল লাতিন

আমেরিকায়? ধর্ম আছে বলে বহু লোক তবু অনেক গর্হিত অপরাধ করে না। ইচ্ছে থাকলেও ভয় পায়। দুর্বল মানুষদের বিবেক হল ধর্মের ভয়। তারা অপরাধকে পাপ মনে করেই ভয় পেয়ে থাকে। নরকের ভয়। দৈবী শাস্তির ভয়। ধর্ম তুলে দিলে তাদের রুখবেন কী দিয়ে? অজাচার রুখবেন কী দিয়ে? পুলিশ দিয়ে?'

তাপসবাবু হঠাৎ প্রচণ্ড রেগে গিয়ে বললেন, 'ডেঁপোমি কোরো না, বুঝলে! আগে নিজের মাথাটা ঠিক রাখো, তারপর এসব ভারী ভারী কথা বলার চেষ্টা করো। তোমার এত যোগ্যতা হয়নি যে তুমি এখানে বসে আমাকে জ্ঞান দেবে। একটি থাপ্পড়ে তোমাকে শিক্ষা দিয়ে দেব আমি।'

কথাগুলো বলেই তাপসরঞ্জন রায় উঠে দাঁড়ালেন। কোনো কথা না বলে বেরিয়ে গেলেন।

ঘরে সবাই চুপচাপ। কেউ কেউ মিটিমিটি হাসছে। একে অন্যের দিকে তাকাচ্ছে।

রাজু অবাক হয়ে বলল, 'উনি এত রেগে গেলেন কেন!'

'অজাচারের কথাটা না বললেই হত,' আংকল একটু চিন্তিতভাবে হলেও হাসতে হাসতেই বললেন, 'একসময় ওঁর ভাইঝিকে নিয়ে ওঁর নামে কিছু কেচ্ছা রটেছিল। সেটা ওঁর যৌবনের ভুল। উনি ভুলে যেতে চেয়েছেন নিশ্চয়ই। কিন্তু মানুষ ভোলেনি। ওঁকেও ভুলতে দেয়নি। আসলে লোকজনের তো খেয়েদেয়ে কাজ নেই। সম্মানিত লোককে অপমানিত করতে পারলে আর কিছু চায় না। তা ছাড়া উনি স্বঘোষিত নাস্তিক। তাই ধর্মের প্রসঙ্গে রাগটা বেশি। ওঁরা কারও জ্ঞান দেওয়া বরদাস্ত করেন না। বয়সও অনেক হয়েছে। প্রেসার আর সুগারের পেশেন্ট।'

'আমি তো জ্ঞান দিইনি কাকু! আমার স্কুল-কলেজের পড়াশোনাও তো কিছু নেই যে জ্ঞান দেব! আমার দেওয়া জ্ঞান তো কেউ শুনবে না, তাই না? আমি জানি। আমি শুধু বলেছি আমার কোরান-গীতা-বাইবেল পড়তে ভালো লাগে। আর আমাদের সবরকম চিন্তাই জেনে রাখা উচিত। উনি তো আমার কথা শুনতেই চাইলেন না! এই যে মৌলবাদীদের নিয়ে এত সমস্যা, আমরা তো তাদের কথা শুনিই না! তাই হয়তো তারাও আমাদের কথা শোনে না। যদি তাদের কথাগুলো আমরা মন দিয়ে শুনতাম, তাদের সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করতাম, হয়তো তারা এত রেগে থাকত না, এত মানুষ মারত না।'

আমার হাসি পেল। অজাচারটা আবার কী চিজ? আমার মালুম নেই। জানতেও চাই না। হিন্দুদের মধ্যে কত কী আছে, তার ইয়ত্তা নেই। কিন্তু যেন একটা বাচ্চাকে দেখছি চোখের সামনে! এই রাজু চিড়িয়াটা লেখাপড়া নিশ্চয়ই করেছে। অনেক ভেবেওছে নিজের মনে। কথা বলতেও শিখেছে। কিন্তু শেষ অবধি কাজে কিছু লাগেনি। আবার সেই পাগলপন! ওকে এই ঘরে বসতে দিয়েছেন কেন আংকল? ভাঁড়ামি করার জন্য?

সুভাষচন্দ্র মণ্ডল একটু কাশলেন। উনি ইদানীং আংকলের কাছে খুব আসছেন। শহরেও ঘোরাফেরা করছেন। বিভিন্ন ব্যাপারে নাক গলাচ্ছেন। তিন-চারটে ছেলেকে আংকলই ওঁর সঙ্গে দিয়েছেন। তারা ওঁর পিছনে পিছনে ঘোরে আজকাল। উনি প্রাইমারি মাস্টার। আগে কমিউনিস্ট পার্টি করতেন। সরকার বদলের সঙ্গে সঙ্গে দল বদলে ফেলেছেন। আমি যতদূর বুঝতে পারছি সামনের ইলেকশনে আংকল ওঁকে ১৩ নং ওয়ার্ড থেকে দাঁড় করাবেন ঠিক করেছেন। উনি বললেন, 'কে বলল মৌলবাদীদের সঙ্গে কথা বলা হয়নি? নিশ্চয়ই হয়েছে। কিন্তু এবার কি সন্ত্রাসবাদীদের নিয়ে সেমিনার করা হবে? তালিবানরা সব এ কে ফরটি সেভেন আর হ্যান্ড গ্রেনেড নিয়ে বক্তৃতা করতে আর বক্তৃতা শুনতে আসবে কি? বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে না রাজকুমার ভাই? তাদের কাজই মৌলবাদ ছড়ানো আর সন্ত্রাস করা। ওটা তাদের জীবিকা! ওটা ছাড়া তারা বাঁচবে না। জলের মাছকে ডাঙায় তুললে কি বাঁচে?'

রাজু খুব নরম গলায় বলল, 'না না, নিশ্চয়ই তা নয়। আপনি ঠিক বলছেন না...'

'ধর্ম ভালো জিনিস নয় বাবা রাজু। ধর্ম হল জনগণের আফিম...'

'সেটার আগে কার্ল মার্কস কিন্তু আরও কিছু বলেছিলেন। উনি বলেছিলেন ধর্ম হল পীড়িত প্রাণের দীর্ঘশ্বাস, হৃদয়হীন জগতের হৃৎপিণ্ড, এবং আত্মাহীন পরিস্থিতির আত্মা। তারপর বলেছিলেন, ধর্ম হল জনতার আফিম। ওঁর উক্তির কিছুটা উদ্ধৃত করা হয়। বাকিটা চেপে যাওয়া হয়। একটা কথা বলুন তো, ধর্মের বিকল্প আপনি মানুষকে কী দেবেন? বিজ্ঞান? বিজ্ঞান মানুষকে চুরি করতে, ঘুষ নিতে, রেপ করতে বারণ করে না। ধর্ম সেটা করে। মনীষীদের কথা আলাদা। তাঁরা নাস্তিক হলেও চলে। কিন্তু সাধারণ মানুষ তার বিবেকের কথা যে শুনে চলে, তার কারণ ধর্ম।

ধর্মকে পৃথিবী থেকে বাদ দেওয়ার চিন্তাটা অপরিপক্ক মনের পরিচয়। ধর্মের আফিম খাইয়েই অগণিত লোকের ভিতরকার পশুকে ঘুম পাড়িয়ে রাখা হয়েছে। সমাজে বাঁচতে পারবেন ধর্মকে তুলে দিলে?'

সুভাষবাবুর মুখটা কালো হয়ে গেল।

সেটা লক্ষ করেই হয়তো আংকল একটু সিরিয়াস গলায় যে কথাগুলো বললেন, আমার সারা শরীরে আগ লেগে গেল।

'যাও তো রাজু... দ্যাখো সোনিয়া কী করছে, ওর সঙ্গে এখন একটু গল্প করো গে যাও। বেচারি বাড়িতে একা একা থাকে!'

এর মানে কী! রাজু কি দশ বছরের বাচ্চা যে এখন বড়োদের আসর ছেড়ে উঠে গিয়ে সোনিয়ার সঙ্গে গল্প করবে! তার অকেলাপন ঘোচাবে!

ধান্দাটা কী!

কী চলছে এ ফ্যামিলিতে! এরা কি রাজুকে কোথায় রাখবে খুঁজে পাচ্ছে না?

তাহলে রাস্তায় বের করে দিক! বাড়ি পাঠিয়ে দিক!

রাজু কিন্তু ঘাড় নেড়ে বাধ্য ছেলের মতোই উঠে গেল।

ও এখন কোথায় যাচ্ছে? সোনিয়ার শোবার ঘরে? সেখানে গিয়ে ও কী করবে? গল্প? আর সোনিয়া? সে ওকে হাতের নাগালে পেলে কী করবে? আমার চোখের সামনে ভেসে উঠল রাজুর বৃষ্টিভেজা নাঙ্গা শরীর। সোনিয়ার সেদিনের খিলখিল হাসি। রাজুর মাথায় নোংরা কিছু না থাকতে পারে, ওর হয়তো কোনো আউরতের সঙ্গে কিছু করার দমই নেই, সোনিয়ার তো আছে! সোনিয়ার শরীরে কত গরমি, কত জ্বালা, সে তো আমি জানি! সে গরমি জুড়িয়ে দেওয়ার জন্য সোনিয়া আমাকে সবসময় পায় না। আজকাল তো খুব কমই পায়।

তবে কি রাজু? আমি যেটার জন্য মরে যাচ্ছি, সেটা মাদারচোদ রাজু ভোগ করবে?

আমার সারা শরীর জ্বলছিল। আমি জ্বলন্ত চোখেই বিবেকানন্দ বসাকের দিকে তাকালাম।

'আংকল, এই ছেলেটা কি পাগলা?'

বিবেকানন্দ বসাকের মুখটা আরও গম্ভীর হয়ে গেল। উনি সম্ভবত এই প্রশ্নটাকেই আশা করছিলেন। কিছুটা চিন্তা করে বললেন, 'কেউ একটু অন্যরকম হলেই তাকে পাগল বলে দাগিয়ে দেওয়াটা কি ঠিক রে আলেফ? ও কিন্তু ওর মতো করে প্রচুর লেখাপড়া করেছে! সব মানুষই তো নিজের মতো! এই পৃথিবীতে কারও আচরণই কারও সঙ্গে মেলে না। তার মধ্যে রাজুর মতো কেউ কেউ একটু বেশিরকম আলাদা। তারা সামাজিক আচরণগুলো ঠিকঠাক মেনে চলতে পারে না। বাঁধাধরা কথা বলতে পারে না। তারা অন্যরকম। তারা পাগল মোটেই নয়। হয়তো ছেলেমানুষ।'

অলোক গোস্বামী হাসতে হাসতে বললেন, 'তা ছাড়া এখন কানাকে কানা আর খোঁড়াকে খোঁড়া বলা বারণ, বুঝলে আলেফ? কাউকে পাগল বলা এখন রীতিমতো অনৈতিক ব্যাপার। অনৈতিক বোঝো তো আলেফ? কোনো মোটা মেয়েছেলেকে মোটা বললে সে এখন তোমাকে বডি শেমিং-এর দায়ে ফেলে দেবে। বোঝো তো সেটা?'

আমার মাথাটা গরম হল। আমি কলেজে পড়িনি। কিন্তু স্কুলে বাংলায় ইংরেজিতে আমি ভালোই নম্বর পেতাম। কোনোদিন কোনো সাবজেক্টে বহেনচোদ ফেল করিনি। বাংলা নভেলও পড়ে দেখেছি, বুঝতে অসুবিধে হয়নি। এই অলোক গোস্বামী ভুষিমালের কারবার করতেন। নাম্বার ওয়ানের ছকবাজ আদমি। সরষের তেলে শেয়ালকাঁটা মেশাতে ওস্তাদ ছিলেন। এখন ছেলের হাতে কারবারের ভার দিয়ে গত ইলেকশন থেকে আংকলের সঙ্গে ভিড়েছেন, দেশ উদ্ধার করছেন। কাউন্সিলর হয়েছেন। আমার ধারণা উনি উচ্চমাধ্যমিক অবধিও লেখাপড়া করেননি। এখন আমাকে বাংলাভাষা শেখাচ্ছেন! ইংলিশ শেখাচ্ছেন! সেগুলো হয়তো আমি ওঁর চেয়ে কম জানি না।

রাগ চেপে বললাম, 'হ্যাঁ। সে তো ঠিকই আছে।'

আমার কেমন মনে হচ্ছিল এদের মধ্যে আমাকে কেউ চাইছে না। আমি জোর করে এসে বসেছি এখানে। ইচ্ছে করছিল নীচে নেমে যাই। বাড়ির বাইরে আলম দাঁড়িয়ে আছে। আমার মেশিনটা ওকে দিয়ে আমি ঢুকেছি। সেটা নিয়ে আবার এসে ঢুকি এ ঘরে। মেশিনটা হাতে নিয়ে খুল্লামখুল্লা। তখন কেমন হবে এদের মুখের

চেহারা? আমি যদি বিগড়ে যাই, কোথায় যাবে এরা? কোথায় যাবে বিবেকানন্দ বসাক?

তার বদলে তেতো গলায় বললাম, 'কাউকে পাগল বলা ঠিক নয়। ভুল হয়ে গেছে আমার।'

আংকল হেসে উড়িয়ে দেবার মতো করে বললেন, 'আরে না... ভুল কিছু বলিসনি তুই। সবসময় কি আমরা খেয়াল রেখে কথা বলতে পারি! নিজেদের মধ্যে ভুলচুক হয়েই যায়!'

নিজেদের মধ্যে! জরুর নিজেদের মধ্যে!

এরপর কথা শুরু হল সাত নম্বর ওয়ার্ডের একটা টিউবওয়েল নিয়ে। সেটার জল না কি রাস্তার ওপর এসে পড়ছে। কিছু লোক চাইছে সেটা উঠিয়ে দেওয়া হোক। কিছু লোক চাইছে যেমন আছে থাক। কাউন্সিলার গোপাল সাঁতরা কিছু করে উঠতে পারছেন না। আমি জানি তাঁর করার ইচ্ছেই নেই। গোপাল সাঁতরা এখন পা বাড়িয়ে আছেন হিন্দুত্ববাদী পার্টির দিকে। কয়েকদিন আগেই পাড়ায় একটা হনুমান মন্দির প্রতিষ্ঠা করলেন বেশ ধুমধাম করে। আংকল সে খবর রাখেন না, হতে পারে না। আসলে এ ঘরে যখন অনেক লোক থাকে আংকলের আসল চিন্তাগুলো আর চেহারাটা প্রকাশ পায় না। এখন সবার কথাতেই উনি হুঁ হাঁ দিয়ে যাবেন। যা ঠিক করবেন একলাই ঠিক করবেন। তখন হয়তো আমাকে লাগবে। এখন আমার এখানে বসে না থাকলেও চলে।

সোনিয়াকে হোয়াটসঅ্যাপ করেছিলাম আমি এসেছি।

এতক্ষণে ওর উত্তর এল— 'একতলায় সেই ঘরে।' সঙ্গে নিজের একটা হাসিমুখের ছবি।

আমার বুকের মধ্যে গরম খুন নাচতে শুরু করল।

ও তাহলে রাজুর সঙ্গে নেই! আমার জন্যই একতলায় ইন্তেজার করছে!

আমি উঠে দাঁড়ালাম।

'আজ আসি আংকল।'

'দাঁড়া তোর সঙ্গে একটু কথা আছে। চল তোকে এগিয়ে দিই।'

আংকল কি সদর দরজা অবধি আমার সঙ্গে যাবেন নাকি? তাহলে সোনিয়ার সঙ্গে দেখা করব কী করে? কিন্তু আংকল আমার সঙ্গে কেবল সিঁড়ি অবধি এলেন। আমার কাঁধে হাত রাখলেন হালকা করে।

'শহরে কিছু পোস্টার পড়েছে, দেখেছিস?'

'কী পোস্টার? আপনার নামে কিছু? কে করেছে বলুন। আজই দেখছি।'

'শুধু আমার নামে নয়। পোস্টারে বলছে আমরা নাকি পাহাড় কেটে বিক্রি করে দিচ্ছি! পাহাড় চুরি করে নিচ্ছি আমরা!'

'মানে?'

আংকল খুব মিষ্টি গলায় বললেন, 'পাহাড় বাঁচাও কমিটি তৈরি হয়েছে শহরে। বলা হচ্ছে সেটা নাকি অরাজনৈতিক। কিন্তু বুঝতেই পারছিস এসব হিন্দুত্ববাদীরা করছে। জগন্নাথ গোস্বামী লোক খেপিয়ে বেড়াচ্ছে। তোকে পাহাড়ে পাথর কাটা কিছুদিন বন্ধ রাখতে হবে আলেফ। ইলেকশনটা হয়ে যাক, তারপর আবার। নাহলে এটার জন্যই হেরে যাব। আমি এমনিতেই তোকে বলতাম। তারপর এই পোস্টারিং হয়ে গেল। উপায় নেই রে কিছু।'

গুসসায় আমার চোখে জল আসতে চাইছিল। পাথর কাটা বন্ধ রাখার মানে আমার স্টোনচিপসের কারবার তো খতম!

'কী করে আংকল! অনেকগুলো অর্ডার আছে!'

'ক্যানসেল করে দে।' শক্ত গলায় বললেন বিবেকানন্দ বসাক, 'নাহলে অন্য কোনো রাস্তা দেখ। পাথর কাটার এখন কোনো উপায় নেই। পাহাড় নিয়ে এ শহরের লোককে আর ঘাঁটানো যাবে না। পার্টির মধ্যেও গোলমাল হচ্ছে ব্যাপারটা নিয়ে। এমএলএ বলছে পাহাড়টার জন্যই রূপনগর শহরটার লোকে নাম জানে। ট্রেকিং করার জন্য টুরিস্ট আসে। হোটেলগুলো চলে। পাহাড়টাই যদি পাথর কেটে কেটে গায়েব করে দিস, তাহলে কী হবে? আচ্ছা, আজ তুই আয়। পারলে আগামীকাল রাতের দিকে একবার আসিস। কথা আছে।'

আমি সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে জ্বলতে লাগলাম। তার মানে আমি চোরাকারবারী! আমাকে সঙ্গে রাখলে ইলেকশনে সুবিধা! কিন্তু সবার সামনে আমার সঙ্গে মেলামেশা করায় অসুবিধা। আমাকে তাই এড়িয়ে চলছেন বিবেকানন্দ বসাক!

এতক্ষণে খোলসা হল ব্যাপারটা! কিন্তু এই পাহাড় কেটে পাথর বিক্রির কারবারের মতলব তো উনিই আমাকে দিয়েছিলেন! আমি এতটা এগোলাম। বাইরের লোকজন এখন আমার ওপর ভরসা করে আছে। আমি তাদের কী বলব!

এতগুলো অর্ডার! আমি অ্যাডভান্স নিয়ে বসে আছি। এতগুলো টাকা ফেরত দিতে হবে!

আমি কারবার থেকে সরে গেলে তো বিনোদ ঘোষালের পোয়া বারো! আমাকে আর মারতে হল না ওর। এমনিতেই রাজা হয়ে যাবে পাথর ব্যাবসার!

পাহাড় বাঁচাও কমিটি!

বহেনচোদ! এর পিছনে কি তাহলে ঘোষালেরই হাত আছে!

এমএলএ সাধন বকশির সঙ্গে তো ঘোষালের আজকাল খুব ভালো সম্পর্ক শুনতে পাচ্ছি।

পাহাড় থেকে পাথর কাটছি তাতে কোন মাদারচোদের কী এসে যায়! পাহাড় কি কারও বাপের! কত পাথর কাটছি যে পাহাড় গায়েব হয়ে যাবে! পাথরের শেষ আছে ওই পাহাড়ে!

পেরেশান দিমাগ নিয়ে উলটো-পালটা ভাবনা নিয়ে একতলার ঘরটায় ঢুকতেই সোনিয়া আমাকে জড়িয়ে ধরল। ওর শরীর আগুনের মতো গরম। এত গরমি নিয়ে এই লড়কি বাঁচে কী করে!

এই ঘরটায় আমরা অনেক সময় কাটিয়েছি। এ বাড়ির কেউ একতলায় নামে না।

সোনিয়ার ঠোঁট চুষতে চুষতে মনে হচ্ছিল বুকের অনেক জ্বালা নিভে যাচ্ছে।

কিন্তু বিবেকানন্দ বসাকের একটু আগে বলা কথাগুলো বিষের মতো কানে লেগেছিল। সেগুলো ভোলার জন্য আমি আরও জোর খাটালাম সোনিয়ার ওপর। ও একটু কাতরে উঠল। মনে হয় একটু লাগল। আমি তোয়াক্কা না করে ওর খুলে দেওয়া বুকদুটোর ওপর মুখ ঘসতে থাকলাম। জোরে। যত জোরে পারি...

বন্ধ দরজায় একটা শব্দ হল।

কে!

আমরা থেমে গেলাম। সোনিয়া আমার থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে দরজা খুলে দেখতে গেল।

ফিরে এসে ফিসফিস করে বলল, 'কেউ নেই। হাওয়ার শব্দ হবে।'

হাওয়া! আমার সাফ মনে হয়েছিল কেউ এসে দরজায় দাঁড়িয়েছে।

৩

আমি ঘরে ঢুকলেই আম্মি বলে ওঠে, 'তোর কী হয়েছে রে আলেফ বেটা?' বলেই আবার দেওয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। আম্মি কি সত্যিই বুঝতে পারে আমার কিছু হয়েছে? যতই চেষ্টা করি আম্মির কাছে নিজের জীবন লুকিয়ে রাখতে, ততই যেন ধরা পড়ে যাই! কী যেন আছে আম্মির চোখে, তার সামনে নিজের কোনো সুখ কোনো দুঃখই লুকোনো যায় না। আমি পাহাড় ভেঙে পাথর বের করি, সবাই আমাকে পাথরের চোরকারবারি বলে জানে, 'পাহাড়চোর' বলছে আজকাল, বিবেকানন্দ বসাকের পোষা গুণ্ডা বলে জানে, আম্মি আমাকে কোনোদিন কোনো কাজ করতেই মানা করেনি। আমি যে একটা হিন্দু মেয়ের জন্য জান কুরবান করে বসে আছি, আম্মি কোনোদিন জানতে চায়নি আমার জীবনে কোনো আউরত আছে কিনা। আমাকে শাদি করে নেওয়ার জন্য কোনোদিন বলেনি। যেন সেসব চিন্তা আমার। আমি যে কোমরে মেশিন গুঁজে শহরে ঘুরে বেড়াই, আম্মি কোনোদিন বলেনি আমি তা কেন করি। আব্বুকেও আম্মি কখনও বারণ করেনি, আব্বু যখন অন্য আউরতের কাছে যেত, যখন খুনখারাপির মধ্যে জড়িয়ে পড়ত। কেমন যেন এক শান্তি আছে আম্মির প্রাণে। আম্মিকে আমি কোনোদিন অস্থির হতে দেখিনি। আম্মি শুধু দেওয়ালের দিকে তাকিয়ে থাকে। কাউকে বারণ করা আম্মির স্বভাবে নেই।

একটা কারুকার্য করা সাদা সিলিং ফ্যান ঘুরতে থাকে আম্মির মাথার ওপর। ক্যাঁচকোঁচ! ক্যাঁচকোঁচ! খুব শব্দ করে ফ্যানটা। আব্বু এটা এনেছিল। কোনো ডেকোরেটারের দোকানের ফ্যান এটা। আব্বু কী করে পেয়েছিল, কে জানে!

এই ফ্যানের আওয়াজে আম্মি কি আব্বুর স্পর্শ পায়? আমিও ফ্যানটা সারাইনি। যেমন চলছে চলুক। ওই শব্দটা না থাকলে আম্মির ঘরটা একদম খামোশ হয়ে যাবে।

মাঝেমধ্যে কেবল দু-চোখ মেলে আম্মি আমাকে দেখে আর জিজ্ঞেস করে, 'কী হয়েছে রে তোর বেটা?'

যদি বলি আমার কী হয়েছে, আম্মি কী করবে? কতটুকু তাকত আছে ওই রুগণ আউরতের আমার জন্য কিছু করার? আম্মি তো সত্যি করে জবাবটা চাইছে না, আমি জানি। প্রশ্নটাই শুধু করে। হয়তো করার পরে ভুলেও যায়। আশাই করে না তার প্রশ্নের উত্তর তার ছেলে দেবে।

আমাদের এ বাড়িটা আব্বুরই বানানো। এ বাড়ির অনেক কোণে অনেকরকম আন্ধেরা জমে আছে। জানলাগুলোর ধুলোঢাকা কাচ দিয়ে ভালো করে দিনের আলো ঢোকে না, রাতের হাওয়া ঢোকে না। মাঝেমধ্যে মনে হয় যারা আব্বুর হাতে মরেছে তাদের প্রেতাত্মাগুলোকে নিয়ে আব্বুর ভূত এই বাড়িতেই রয়ে গেছে। তাই কখনো-কখনো নিজের থেকে দরজা-জানলা বন্ধ হয়ে যায়, খুলে যায়, আসবাবপত্র নড়ে ওঠে, বাসন পড়ে যায়। এই বাড়িতে ভূত আছে, আমার নিশ্চিত ধারণা। আম্মিকে কি তারাই এমন করে দিয়েছে?

সত্যিই তো, আমার কী হয়েছে সেই উত্তরটা দিলেও আম্মি কী করতে পারবে? কিছুই করতে পারবে না। হয়তো একটু কাঁদবে, আমি আড়াল হলে। হয়তো আল্লার কাছে চাইবে আমি যেন দুঃখ থেকে বেরিয়ে আসতে পারি, আমার যেন কোনো তকলিফ না থাকে। আব্বুর জন্যও নিশ্চয়ই সেটাই চাইত। কিন্তু কী ফায়দা হল? আব্বু একদিন কতল হয়ে গেল, ধড় পাওয়া গেল এই শহরে রেন্ডিখানার ড্রেনে, আর মুণ্ডুটা কে যেন ফেলে রেখে গেল ব্যারেজের রাস্তায়! কেন? আব্বুর দুশমনরা কি ভেবেছিল ধড় আর মুণ্ডু কাছাকাছি থাকলে আবার জোড়া লেগে যাবে, আব্বু আবার জিন্দা হয়ে উঠবে? তখন আমার পনরা সাল উমর। তখনই আমি দুনিয়াদারির হদিশ পেয়ে গেছি। স্কুল তখনই আমার একটা বেকার জায়গা মনে হয়। আব্বুর রক্তাক্ত দু-টুকরো লাশ আমাকে আরও বেপরোয়া করে দিয়েছিল। সেই থেকে আমার নিজের মৃত্যুভয় অনেক কমে গিয়েছে।

আব্বুর ভূতকে ভয় পাই না। কিন্তু আম্মির মউতকে আমি ভয় পাই। আম্মি চলে গেলে আমি একদম বেসাহারা হয়ে যাব। আম্মির হার্ট ভালো নেই, ডাক্তাররা বলেছে। মাথা পুরো গোলমাল হয়ে গেছে। খুব শক্ত বিমারি। আজকাল বসে বসে হাঁফায়। এখন আর নিজের হাতে কোনো কাজ করতে পারে না। স্নান করিয়ে দিতে হয়। কাপড় পালটে দিতে হয়। খাইয়ে দিতে হয়। আমি কাজের লোক রেখে

দিয়েছি। বিছানায় তবু কেমন যেন থকি হুয়ি হয়ে বসে থাকে। একবার হায়দরাবাদে নিয়ে যেতে হবে। খুব জলদিই নিয়ে যাব আমি।

আম্মির মাথাটা একদমই সাফ নেই। অনেকদিন থেকে মাথাটা বিগড়ে যাচ্ছে। আজকাল তো কেমন যেন ফ্যালফেলিয়ে চেয়ে থাকে। অথচ ঠিক ধরে ফেলে আমার রুহ তকলিফে আছে নাকি সুখে আছে।

খুব জলদিই আমি আম্মিকে হায়দরাবাদ নিয়ে যাব। যতই কাজ থাক। যতই পেরেশানি থাক। ও কাজটা আগে করতে হবে। আম্মিকে অনেকদিন বাঁচিয়ে রাখতে হবে। আমি যতদিন বাঁচব আম্মিও যেন বাঁচে। আমি মরে যাওয়ার পরেও যেন আম্মি বেঁচে থাকে। যেমন আব্বু মরে যাওয়ার পরেও আম্মি বেঁচে আছে। আম্মিকে আমি জিন্দা রাখবই।

অন্যদিন বাড়ি থেকে বেরিয়ে এলেই আম্মিকে আর আমার মনে থাকে না। কিন্তু আজ মেঘলা দিনে রূপনগর শহরের যেদিকে তাকাচ্ছিলাম, আম্মির ফ্যাকাসে নীল চোখ দেখতে পাচ্ছিলাম। আশমানটা নীল নয় আজ। কিন্তু হাওয়ায় যেন আম্মির চোখের নীল লেগে গেছে। যেন আমাকে তাড়া করেছে আম্মি। যেন আমার কিছু জবাবদিহি করার আছে ওই আউরতের কাছে। নিজের হয়ে জবাবদিহি, হয়তো আব্বুর হয়েও জবাবদিহি। কৈফিয়ত। কৈফিয়ত চাইছে কি আম্মি?

সে হক আম্মির আছে। আলবৎ আছে।

আমি আম্মির আচ্ছা বেটা হতে পারিনি। আম্মির নসিবে ছিল না সে একজন আচ্ছা স্বামী পাবে, আচ্ছা বেটা পাবে। আম্মির নসিবটা খুব খারাপ। খুব খুব খারাপ। কারও কারও নসিব এমন খারাপ থাকে, আল্লার যেমন খোয়াইশ, কারও কিছু করার থাকে না।

আজ আকাশে বাদল। যে-কোনো সময় বারিশ নামবে। দূরে পাহাড়টা মাথা উঁচিয়ে আছে। বাদল ছেয়ে থাকা দিনে পাহাড়টাকে আমার দারুণ লাগে। মনে হয় যেন বুকের মধ্যে ঢুকে আসছে। শালা, আমি কি পাহাড়টাকে ভালোবাসি না? আমার ক্ষমতা কী একটা আস্ত পাহাড়কে চুরি করে নেব! কিছু পাথর কাটলে অত বড়ো পাহাড়ের কতটুকু এসে যায়!

আলমকে সঙ্গে নিয়ে সকালে বেরিয়েছি। আস্তে চালাচ্ছি বাইক। এনফিল্ডের এই ধীরে চলতে চলতে ঘুবঘুবঘুবঘুব শব্দ করাটা আমার দারুণ লাগে। রাস্তা যেন কাঁপতে থাকে কুঁয়ারি লড়কির মতো। এই বাইকটাকে আমি ভালোবাসি। অনেকদিন দূরে যাওয়া হয়নি বাইক নিয়ে। গ্রুপকে নিয়ে বেরোতে হবে। ভাবছি হিমাচল প্রদেশ যাব। কিন্তু সামনে মিউনিসিপাল ইলেকশন। অবিশ্যি এই ইলেকশনে আমার কোনো ভূমিকা থাকবে কিনা বিবেকানন্দ বসাক সেটা বুঝতে দিচ্ছেন না। নিজেকে কেমন যেন ফালতু মনে হচ্ছে গতকাল বিবেকানন্দের কথাগুলো শোনার পর থেকে। আমের আঁটি হয়ে গেলাম নাকি বহেনচোদ!

তারপর গতকাল হাইকোর্টের রায়! শালা কী হবে এবার কিছুই বুঝতে পারছি না। আংকলের সঙ্গেও যোগাযোগ হয়নি এরমধ্যে। যখনই ফোন করি, শালা, স্যুইচড অফ!

তখনই পিছনে বসা আলম বলল, 'বস, বিনোদ ঘোষাল আসছে।'

আমিও সঙ্গে সঙ্গে দেখতে পেয়েছি বিনোদের কালো ল্যান্ড ক্রুজার মোড় ঘুরে আমাদের দিকে আসছে।

নিজের অজান্তেই আমার হাত পিঠের কোমরে চলে গেল। মেশিনটা একবার ছুঁয়ে নিলাম। ও আমাকে মারতে চায় আমি জানি। আজও বিনোদের সঙ্গে আমার সামনাসামনি কোনো ঝামেলা হয়নি। বরং হাসিঠাট্টাই চলে দেখা হয়ে গেলে। কিন্তু যে-কোনোদিন ঝামেলা হতে পারে। আমরা একে অন্যের রাস্তার একমাত্র পাথর। আর পাথর নিয়েই আমাদের কারবার। বিনোদের বয়স আমার চেয়ে ঢের বেশি। পঞ্চাশ অনেকদিন পেরিয়েছে। আমার আব্বুকেও চিনত। পাথরের পাশাপাশি বিনোদ গোরুও চালান দেয়। এমএলএ-র সঙ্গে সমান ভাগাভাগির কারবার সেটা। গাঁজার ফলাও কারবার আছে। মেয়েমানুষ ছাড়া মনে হয় সব কিছুই চালান দেয় ও। সামনেই বর্ডার। বিনোদ সেটার ফয়দা পুরোপুরি তুলেছে। আমি পারিনি। আমি পাথর নিয়েই আছি।

বিনোদ এখনও অবধি জনা সাতেক আদমিকে খতম করেছে নিজের হাতে। খুন করার কাজটা ও নিজের হাতে করতেই পছন্দ করে, দলের আদমিদের ওপর মনে হয় ভরসা করে না। একটারও কেস দেয়নি পুলিশ। খুনগুলো কাউকে আসামি না

পেয়ে ঝুলছে। একটা খুন তিনমাস আগে হল। নিজের গ্যাংয়েরই একজনকে মেরেছে বিনোদ। খবরের কাগজগুলো কিছুদিন লেখালেখি করে এখন চুপ। নিউজ চ্যানেলও এখন চুপ। পুলিশ ওর হাতের মুঠোয়। পুলিশ আমারও হাতের মুঠোয়। আমি আজ অবধি কাউকে জানে মারিনি। ভোটের সময় ঝামেলা হলেও পিটিয়ে ছাল তুলে নিয়ে ছেড়ে দিয়েছি। মারিনি। কিন্তু সবাই জানে ইচ্ছে করলেই মারতে পারি। মারলে হয়তো বিনোদকেই মারব কোনোদিন। হাত কাঁপবে না। পুলিশ আমার একটা বালও বাঁকা করতে পারবে না। আমি আর বিনোদ, আমাদের সমস্যাটা পুলিশকে নিয়ে নয়। নিজেদের নিয়ে।

মিহি বৃষ্টি পড়তে শুরু করল। এমন বৃষ্টিতে শরীর ভেজে না। মুখের ওপর গুঁড়ো গুঁড়ো পানি জমে যায়। আমার চমৎকার লাগে এমন বৃষ্টি। এমন বৃষ্টির মধ্যে বিনোদ ঘোষাল যদি আজ আমাকে রূপনগরের রাস্তায় খতম করে দেয়, কিংবা যদি আমি আজ ওকে খতম করে দিই, খারাপ কী? লাশের ওপর বৃষ্টিটা ঝরে পড়তে থাকবে, খোদার বরকতের মতো। কিন্তু বিনোদ অমন কাঁচা ঘুটি খেলবে না। আমিও না।

বিনোদ জানলা দিয়ে হাত বাড়িয়ে আমাকে থামতে বলল।

নেমে এসে বলল, 'যখনই তোকে বাইক চালাতে দেখি আলেফ, মনে হয় অমিতাভ বচ্চন আসছে। তেমনই রোয়াব! তেমনই স্টাইল! শালা এ শহরে তোকে মানায় না। বড়ো শহরে চলে যা।'

ওর সঙ্গে দুজন নেমেছে গাড়ি থেকে। আমার দিকে তাকিয়ে আছে তারা। বিনোদ হাসলেও তাদের মুখে হাসি নেই। ওদের সঙ্গে মেশিন আছে, বুঝতেই পারছি। বিনোদের হাতও রেডি আছে কোমরের মেশিনটার জন্য। কী চমৎকার চেহারা বিনোদের! দেখলে ডাক্তার বা প্রফেসর মনে হয়! সেলাম ঠুকতে ইচ্ছে করে।

আমি হাসতে হাসতে বললাম, 'এসব বলে আমাকে শহর থেকে ভাগানোর মতলব করছ বিনোদ দাদা? তা হবে না। তোমার এ ছোটা ভাই এ শহরেই থাকবে।'

'আরে তোর কারবার তো বন্ধ! হাইকোর্ট যে রায় দিয়েছে কালকে, তারপর তো পাবলিক তোর বসকে ছিঁড়ে খাবে রে! চাকরি দেওয়ার নাম করে কত লোকের

টাকা খেয়েছে বিবেকানন্দ বসাক? আমি না জানলেও তুই তো জানিস! এ শহরে থেকে শালা আর করবি কী? কবে শালা পাবলিক পিটিয়ে মেরে দেবে তোকে!'

গতকাল হাইকোর্টের রায় বেরিয়েছে। যারা স্কুল সার্ভিস কমিশন থেকে নোকরি পেয়েছিল, তাদের পুরো প্যানেল বাতিল করে দিয়েছে হাইকোর্ট। বেতন ফেরত দিতে বলেছে কোর্ট। রাজ্য সরকার অবিশ্যি বলেছে তারা এ রায় মানে না, সুপ্রিম কোর্টে যাবে। কিন্তু এ শহরে তার ছাপ কী পড়েছে, এখনও জানি না। সাধন বকশি আর বিবেকানন্দ বসাক অনেকের কাছেই লাখ লাখ টাকা খেয়ে স্কুল মাস্টারির নোকরি করে দিয়েছেন। এ শহরের তেমন কয়েকজনকে আমি চিনি। আমিই নিয়ে গিয়েছিলাম তাদের আংকলের কাছে। শালারা সাদা খাতা জমা দিয়ে নোকরি পেয়েছে। রাজার হালে আছে, শাদি করে নিয়েছে, বালবাচ্চা হয়ে গেছে, তাদেরও কি শালা নোকরি যাবে নাকি? তাহলে তো চাপ হয়ে যাবে! আমাকে বা আংকলকে কেউ কিছু বলতে হিম্মত করবে না। কিন্তু কেউ যদি খুদখুশি-টুশি করে নেয়! জগন্নাথ গোস্বামীর তো তখন পোয়া বারো! হাসতে হাসতে জিতে যাবে ইলেকশন! লেকিন এত সোজা নয়। এ দেশে সব কিছুই চাপা পড়ে যায়। ইনশাল্লা এটাও চাপাই পড়ে যাবে। নোকরি যাওয়া এত সস্তা নাকি!

ফির ভি হাইকোর্টের রায়টা শোনার পর থেকেই মেজাজ বিগড়ে ছিল। বিনোদের কথা শুনে দিমাগটা আরও গরম হল। ঝাঁঝের গলাতেই বললাম, 'আমার তো কারবার বন্ধ! তোমার? এমএলএ কী বলছে? সাধন বকশিও তো কম টাকা খায়নি মাস্টারদের কাছ থেকে!'

'আরে এমএলএ সাহেব তো চরম ঘাবড়ে আছে। আমাকে বলেছে ইলেকশন অবধি পাহাড় কাটা বন্ধ রাখতে হবে। কিন্তু আমার মনে হয় ইলেকশনের পরেও ও ধান্দা আর চালাতে পারা যাবে না। সারা শহরে পাহাড় কাটা নিয়ে পোস্টারিং হয়েছে, দেখিসনি?'

'আলবত দেখেছি।'

'পাবলিককে কে খেপিয়েছে কে জানে!'

আমার দিমাগটা একটু হালকা হল। জানে বাতাস লাগল। যাক, তাহলে বিনোদ ঘোষালেরও পাথর কাটা বন্ধ! বিবেকানন্দ বসাকরা শুধু আমাকেই মুরগি করেনি!

বিনোদের মুখোমুখি যখনই হই, ও শালা মছলিখোর বাঙালি, ওর বয়স আমার চেয়ে অনেক বেশি, দু-ছেলের বাপ, ও আমার চেয়ে বেঁটে, আমার চেয়ে অনেক নরম চেহারা, কিন্তু আমার মনে হয় একটা আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে আছি বহেনচোদ। কেমন যেন তেতো লাগে মুখের ভিতরটা! মনে হয় আমার সামনের জীবনটা আমার দিকে তাকিয়ে আছে। আজ থেকে বিশ সাল বাদ যখন আমার বয়স ওর মতো হবে, আমিও বিনোদেরই মতো হয়তো বাইকের বদলে গাড়ি নিয়ে ঘুরব, আমার হাতে বেশ কয়েকটা আদমির খুন লেগে যাবে। শালা, জিন্দা থাকাও এক আজব খেল! কেন যে আদমি জিন্দা থাকতে চায়! কী পেতে চায় আদমি? কী পেতে চাই আমি? যা কামিয়েছি আমার সামনের জীবনটা তো হেসেখেলে কেটে যাবে। সব গন্ধা কাম ছেড়ে দিতেই পারি আমি। কিন্তু ছাড়তে পারি না। শালা ছেড়ে দিলে মনে হবে জিন্দা থাকাই ছেড়ে দিলাম। হেরে গেলাম।

হেরে যাওয়ার ভয়েই আদমি জিন্দা থাকতে চায়, আমার মনে হয়। বহেনচোদ মউতই হল আদমির পরাজয়।

বিনোদ ঘোষালও বলল, 'এসব হিন্দুত্ববাদীরা করছে। তোর ওপর তো অনেকদিন ধরেই ওদের বিরাট খার। মধ্যিখান থেকে আমিও ফাঁসলাম।'

আচ্ছা! এতক্ষণে বুঝতে পারছি। মাদারচোদ জগন্নাথ গোস্বামী! আগেই আমার মাথায় আসেনি কেন কে জানে! শালা সবসময় মাথায় সোনিয়া ঘোরে আজকাল। ওর চোখ... ওর শরীর... আমাকে বেকার আদমি বানিয়ে ছেড়ে দিচ্ছে মেয়েটা! ঈশক নে পুরা নিকম্মা কর দিয়া।

আরও দু-চারটে কথা বলে বিনোদ চলে গেল।

আমি বাইক স্টার্ট করার আগে আলমকে বললাম, 'পাথরের ধান্দা বন্ধই করে দিতে হবে নাকি রে?'

'কিছুদিন বন্ধ রাখতেই হবে বস। সবাই বলছে আমরা পাহাড়টাকে গায়েব করে দিচ্ছি। পাহাড় এ শহরের শান। পাবলিকের মাথায় ঢুকে গেছে। বেরোতে সময় নেবে।'

শালা পাবলিক!

দিমাগের মধ্যে আগুন চলকে উঠল। শহরটার ওপর রাগ হচ্ছিল। এই শহরে আমি লায়েক হয়েছি, এই শহরে আমার সমস্ত জীবন, কিন্তু আজও এ শহর আমাকে কাছে টেনে নেয়নি। আমি রাস্তা দিয়ে গেলে সবাই আড়চোখে চায়। আমার সঙ্গে কেউ নিজের থেকে এসে কথা বলে না। আমি নিজে কথা বলতে গেলেও চোখে চোখ রাখে না। হয়তো সেটাই আমি চাই। আমি চাই আমার ভয়ের আবহাওয়া এ শহরে থাক। কিন্তু, মাঝেমধ্যে খুব আকেলা লাগে। মনে হয় দুনিয়ায় আমার কেউ নেই। হয়তো এ জন্যই আমি সোনিয়াকে এমন করে আঁকড়ে ধরেছি। সোনিয়া আমাকে গুণ্ডা ভাবে না। আদমি ভাবে। আমার শরীর, আমার মনের প্রতি ওর টান আমাকে নিজেকে মানুষ ভাবতে সাহায্য করে। মনে হয়, আমিও ইনসান। আমারও চাওয়া-পাওয়া থাকতে পারে। পেয়ার-মুহব্বত থাকতে পারে।

বৃষ্টিটা বাড়ছিল। এখন ভিজে যাচ্ছি। কোথাও দাঁড়ালে হয়। এখন তো যাওয়ার কোথাও নেই। এমনিই শহরে চক্কর দিতে বেরিয়েছি। এভাবে এনফিল্ডে চড়ে রাস্তা কাঁপিয়ে শহরে দিনে একবার হলেও আমি ঘুরি। যাতে লোকজন বুঝতে পারে আমি আছি। আমি বহেনচোদ জিন্দা আছি। আমাকে তোমরা ভয় খাও? তাহলে ভালো করেই ভয় খাওয়াই আমি তোমাদের! তোমাদের চোখের মধ্যে যে নফরত, আমি মরে গেলে যেন তোমরা স্বস্তি পাও, তোমাদের অনেক উলঝন আর পেরেশানি যেন চলে যায়... আমি কার পাকা ধানে মই দিয়েছি শালা? ভোটের সময় জবরদস্তি করেছি। বোম মারিনি। গুলি চালাইনি একটাও। কেবল ডান্ডা ইস্তেমাল করেছি। সেটাই তো বহেনচোদ রাজনীতির দস্তুর! এ দেশে ওভাবেই রাজনীতি করতে হয়।

আমি কি সিস্টেমের বাইরে নাকি!

তখনই ওদের দেখতে পেলাম। একটা গাছতলায় দুজনে দাঁড়িয়ে আছে বৃষ্টি নামার পরে। দুজনেই বারবার আকাশের দিকে তাকাচ্ছে। আর রাস্তার দিকেও। যদি একটা টোটো পেয়ে যায়।

দৃশ্যটা দেখে আমার দম আটকে এল।

সোনিয়া আমার সঙ্গে কোনোদিন এ শহরের রাস্তায় ঘোরেনি। কিন্তু রাজুর পাশে ওর গা ঘেঁসে কেমন অনায়াসে দাঁড়িয়ে আছে! যেন কতদিনের সম্পর্ক! যেন মায়ের পেটের ভাইবোন! কিংবা, শাদি হয়ে যাওয়া আদমি আর আউরত!

আমি ওদের সামনে গিয়ে ব্রেক কষলাম। একটু আচমকাই। আলম ধাক্কা খেল আমার পিঠে।

বাইক থেকে নেমে দেখলাম রাজুর মুখে হাসি, কিন্তু সোনিয়ার মুখ থমথম করছে। কেন? আমার সঙ্গে শহরে কেউ দেখে ফেলবে এই ভয়ে? একদিন তো দেখবেই লোক, যেদিন সোনিয়াকে নিয়ে আসব বিবেকানন্দ বসাকের বাড়ি থেকে! নিয়ে আসব, বা তুলে আনব, যাইহোক। তাহলে শরম কীসের? আমাকে নিয়ে শরম? কোনোদিন তো মনে হয়নি আমাকে নিয়ে সোনিয়ার কোনো অসুবিধা আছে! তাহলে অমনভাবে বুকের কাছে কিতাবগুলো ধরে নিয়ে শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে কেন!

সোনিয়াই বলল, 'অর্ডার দেওয়া কিছু বই নেওয়ার ছিল দোকান থেকে। ভাবলাম আজ হয়তো বৃষ্টি হবে না। ছাতা নিয়েও বেরোইনি!'

আমি স্থির চোখে ওর দিকে তাকিয়ে বললাম, 'আকাশে বাদল থাকলে বৃষ্টিকে কখনও বিশ্বাস করতে নেই। কখন এসে পড়ে, কেউ বলতে পারে না।'

সোনিয়া একবার আমার দিকে তাকিয়েই চোখ ফিরিয়ে নিল।

কী খুবসুরত লাগছে ওকে! একটা গুলাবি রঙের ড্রেস পরেছে। মাথার চুলে গুঁড়ো গুঁড়ো বৃষ্টি। মুখে পানির ফোঁটাগুলো গড়াচ্ছে। চোখদুটো চঞ্চল হয়ে আছে—বৃষ্টির জন্য? নাকি আমি দাঁড়িয়ে আছি ওর সামনে?

রাজু পাহাড়টার দিকে তাকিয়েছিল। মনে হচ্ছিল ওর চোখদুটো ভেসে যাচ্ছে পাহাড়ের দিকে।

পাখনা... পুচ্ছ... কানকো... আঁশ...

হঠাৎ আমার দিকে তাকিয়ে খুব শান্ত গলায় বলল, 'এখানে আসার পর থেকে পাহাড়টা আমাকে খুব টানছে, জানেন! এখনও ওর কাছে যাওয়া হল না! বৃষ্টির মধ্যে পাহাড় দেখলে আমার বুকের মধ্যে কেমন যেন করে! কষ্ট হচ্ছে না ভালো লাগছে, বুঝে উঠতে পারি না। শুধু মনে হয় আমার মধ্যে কী যেন নেই, কী যেন হারিয়ে আছে আমার মধ্য থেকে, অথচ ওই পাহাড়টার মধ্যে সেটা আছে। ইচ্ছে করে সারাজীবন এভাবেই বৃষ্টি পড়ে যাক, আর আমি পাহাড়টার দিকে তাকিয়ে

থাকি, খুঁজতে থাকি... থাকি আমার শূন্যতার কারণগুলো! ভাবতে থাকি, এই যে তাকিয়ে থাকা এ যেন শেষ না হয়!'

এ মাদারচোদ কি সত্যিই রাইটার নাকি? শায়ের? একে পাগলা, তার ওপর আবার যদি শায়েরি করতেও শুরু করে শালা জিনা তো হারাম হয়ে যাবে! সোনিয়া একে বরদাস্ত করছে কী করে! শহরের রাস্তায় একটা পাগলের সঙ্গে হাঁটতে বা দাঁড়িয়ে থাকতে ওর খারাপ লাগছে না! চেহারাটা সুন্দর হলেই হল! চেহারাটা সত্যিই সুন্দর। কেমন তাকিয়ে আছে দ্যাখো! কী সরল চোখ-মুখ! যেন ফরিস্তা! যেন জীবনে কোনো গুনাহ করেনি! তাকিয়ে থাকলে আমারই যেন মুহব্বত হয়ে যাবে ওর সঙ্গে!

বললাম, 'একদিন আপনাকে জরুর নিয়ে যাব পাহাড়ে।'

সোনিয়া বলল, 'দ্যাখো না, একটা টোটো বা কিছু পাও কিনা! কতক্ষণ এভাবে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভিজব?'

আলমকে ইশারা করলাম ও যেন বাইকটা দ্যাখে। তারপর বললাম, 'চলো ওই সামন্ত রেস্টুরেন্টে গিয়ে বসি। কিছু খাওয়া যাবে। আমার এখনও কিছু খাওয়া হয়নি।'

সোনিয়া শক্ত মুখ করে মাথা নাড়ল।

সোনিয়া এমন করছে কেন? আমার যেন কোনো ছোঁয়াচে বিমারি হয়েছে!

রাজু যেন লাফিয়ে উঠে বলল, 'হ্যাঁ তাই চলুন।'

সোনিয়া কপাল কুঁচকে হাসতে হাসতে বলল, 'সে কী! এই তো লুচি-তরকারি খেয়ে বেরোলে বাড়ি থেকে!'

'আমার খিদে পেয়ে গেছে আবার।'

শালা, ফরিস্তা না আরও কিছু! কাবাব মে হাড্ডি!

৪

'একটা ট্রেন দুর্ঘটনা যখন হয়, অনেক লোক আশপাশের গ্রাম থেকে ছুটে আসে। তারা সবাই কিন্তু সাহায্য করতে আসে না। কেউ কেউ লুটপাট করতে আসে।' রাজু বলছিল, 'তারা মরা বা আহত লোকেদের কবজি থেকে ঘড়ি খুলে নেয়, গলা থেকে চেন খুলে নেয়। যদি সহজে খুলতে না পারে, আঙুল ভেঙে ঘড়ি বা ব্রেসলেট নিয়ে নেয়, মেয়েদের হাত কেটে কঙ্কণ খুলে নেয়।'

সোনিয়া একটু চমকে উঠল। রাজুর অদ্ভুত চোখগুলো কেমন চকচক করছিল। মুখ লাল হয়ে গেছে। মনে হচ্ছিল ও চোখের সামনে দৃশ্যগুলো দেখতে পাচ্ছে। মনে হচ্ছিল ও ট্রেন দুর্ঘটনায় মরে যাওয়া বা আহত আদমি আর আউরতদের রক্তাক্ত শরীরগুলোর মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আমি একটু হাসলাম। আমার চোখের সামনে ভাসছিল আব্বুর মুণ্ডুকাটা লাশ। চোখদুটো কেমন ঠিকরে বেরিয়ে এসেছিল। এদের কারও বাপকে যদি দু-টুকরো করে রেখে যেত কিছু লোক? এরা বোবা হয়ে যেত হয়তো সারাজীবনের জন্য।

সোনিয়া আর রাজুকে পাশাপাশি বসিয়ে আমি টেবিলের উলটোদিকে বসেছিলাম। আসলে প্রাণ ভরে সোনিয়াকে দেখতে পাব তাহলে। সোনিয়াকে যখন দেখি মনে হয় ফুলের খুশবু পাচ্ছি, অনেক শহর দেখতে পাচ্ছি চোখের সামনে, নদীর জলের নিঃশ্বাস ভেসে আসছে, এক গুলাবি যুদ্ধজাহাজ নদীর বাঁক ফিরে আমার দিকেই আসছে, যেন বুকের মধ্যে গুলাবি পাহাড় ধসে পড়ছে, সবুজ ফসল থেকে উথলে পড়ছে রোদ। আমি তাকিয়েই থাকি। নজর ফেরাতে পারি না।

খেতে খেতে কী করে যেন আমাদের কথাগুলো মানুষের হিংস্রতার দিকে ঘুরে গেল। চিকেন কাটলেটে কামড় দিয়ে সোনিয়া বলেছিল, 'এই পাখিটা হয়তো গতকালও জ্যান্ত ছিল, তাই না? আজ আমাদের পেটে চলে গেল। এটা ভাবলে আমার মিট খেতে আর ইচ্ছে করে না। ভাবছি কনফার্মড ভেজিটেরিয়ান হয়ে যাব।'

ওরা কাটলেট খাচ্ছিল। যতই গুনাহগার বান্দা হই, নমাজ না পড়ি, শরাব খাই, আজও হালাল না করা মাংস খাই না। একটা এগরোলই খাচ্ছিলাম। সেটা থেকে মুখ সরিয়ে বললাম, 'আর এই মুরগিটা কতগুলো পোকা খেয়েছে সারাজীবনে, সোনিয়া? সেই পোকাগুলোরও তো জান ছিল! বালবাচ্চাও ছিল। পোকাগুলো তাদের বালবাচ্চাদের স্কুলে নিয়ে যেত, পার্কে খেলতে নিয়ে যেত...'

সোনিয়া খিলখিলিয়ে হেসে উঠে বলেছিল, 'হ্যাঁ, ওটাই ভাবতে হবে। ওটা ভেবেই অত খারাপও লাগে না। খাব না খাব না করেও মাংস খেয়েই নিই। মাংস না থাকলে মনেই হয় না কিছু খেলাম।'

'তা ছাড়া একটা মুরগিরই মাংস তোমার কাটলেটে নাও থাকতে পারে। হয়তো কয়েকটা মুরগির মাংস একসঙ্গে মিলেমিশে আছে!'

'ইশ!'

সেখান থেকেই ভায়োলেন্সের কথা উঠে এসেছিল। আমার একটু অস্বস্তি হতে পারত। কত লোকের হাত-পা ভেঙে হাসপাতালে পাঠিয়েছি! কত লোকের মাথা ফাটিয়েছি! কারও খুন ঝরিয়ে করে আমার কখনও একটুও খারাপ লাগেনি। কোনোদিন যদি কোনো আদমিকে মারতে হয়, লাশ ফেলে দিতে হয়, তাহলেও বহেনচোদ খারাপ লাগবে না। এটাই আমার লাইফ। আমি তো সিস্টেমের বাইরে নই। সিস্টেমকে পালটানোর তাকত আমার নেই। সিস্টেমের সঙ্গে চলার তাকত তো আছে! কাউকে মেরে হাসপাতালে পাঠাতে যখন বলেন আংকল, তখন তো এটাই বলেন। খুব আলগা আর ঠান্ডা গলায় বলেন, 'কী করব বল আলেফ! তুই-বা আমি তো সিস্টেমের বাইরে নই। ভালো লাগুক বা খারাপ লাগুক, আমাদের কাজটা আমাদের করতে হবে। এটাই পলিটিকস।'

হ্যাঁ। এটাই পলিটিকস। এটাই ধান্দা। বেঁচে থাকতে হলে ভায়োলেন্স একদম মাস্ট। কখনও মুরগি মারতে হবে, বহেনচোদ, কখনও আদমি। দিল পে মত লো।

রাজু উত্তেজিত কিন্তু চাপা গলায় বলছিল, 'একটা গল্প বাবার মুখে শুনেছিলাম। আমি তখন খুব ছোটো। বাবা তখনও এত টাকা-পয়সা করেনি। কিছুদিন সুন্দরবনের একটা গ্রামের প্রাইমারি স্কুলে মাস্টারি করত। একদিন ফিরে এসে বমি করছিল। মা খুব ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞেস করল কী হয়েছে। বাবা বলল স্কুলের কাছাকাছি একটা পরিবারে দুই জায়ের মধ্যে খুব ঝগড়া ছিল। কারণ ছোটো জায়ের একটা ছেলে হয়েছে। বড়ো জায়ের দুটোই মেয়ে। যার ছেলে হয়েছে সে নিজেকে রানির মতো দেখাতে চাইছে পরিবারে। বড়ো জায়ের তাতে গায়ের জ্বালা। একদিন কী হল, ছোটো জায়ের ধান সেদ্ধ করার কথা, কিন্তু তার জ্বর হয়েছে, তাই বড়ো জাকে ধান সেদ্ধ করতে হচ্ছে। বড়ো জা সেটার শোধ নিল। কীভাবে? ছোটো জায়ের সাত-আটমাসের ছেলেটাকে ধান সেদ্ধ করার হাঁড়ির মধ্যে ঢুকিয়ে দিল। যখন অনেক খোঁজার পরে তাকে হাঁড়ির মধ্যে পাওয়া গেল, তাকে আর মানুষের বাচ্চা বলে চেনাই যাচ্ছে না। বড়ো জা ভেবেছিল দুর্ঘটনা বলে চালিয়ে দেবে। কিন্তু পুলিশ এল। তাদের সামনে স্বীকার করতে বাধ্য হল...'

সোনিয়া বমি করার মতো আওয়াজ করল, মুখ থেকে অর্ধেক চিবোনো কাটলেট বের করে প্লেটে রাখল। তারপর দম আটকে আসা গলায় রাজুকে বলল, 'তুমি কী? এখন এই স্টোরিটা কেউ বলে? উফ! আমার সব খাবার পেট থেকে উঠে আসতে চাইছে...'

আমি রাজুর চোখের দিকে তাকিয়ে ছিলাম। সোনিয়ার দিকে পলক না ফেলে তাকিয়ে আছে রাজু। সোনিয়ার বমি পাওয়া বেঁকে যাওয়া মুখে ওর চোখ সাঁতার কাটছে। পুচ্ছ নাড়ছে। ছোটো ছোটো তরঙ্গ তুলছে দৃষ্টির। বুঝতে পারছিলাম সোনিয়ার কষ্ট হচ্ছে। সেটা কি রাজুর ভালো লাগছে? ও কি ইচ্ছে করেই এখন গল্পটা বলল? কেমন আদমি এই পাগলা ছেলেটা? কী চায় এ অন্যদের কাছে? সোনিয়ার কাছে কিছু চায় না কি? একই বাড়িতে থেকেও সোনিয়াকে চাইবে না, এমন কোনো মরদ আছে নাকি দুনিয়ায়! নাকি ও ঠিকঠাক মরদ হয়নি আজও!

কেবিনের বাইরে কারা যেন খুব তর্ক করছে। অনেকগুলো গলা শোনা যাচ্ছে। কারা এরা? আমি অন্য দরজা দিয়ে এসেছি, তখন এদের দেখতে পাইনি।

একজন বলছে, 'এরপরও কিছু হবে না, তোরা দেখে নিস। রাজ্যের সরকার প্রকাশ্যে এদের পক্ষে আছে। কে কী করবে?'

একজন বলল, 'মুখ্যমন্ত্রী তো বলেছে সুপ্রিম কোর্টে যাবে। শালা কী অবস্থা! একটা সরকার ঘুষ নিয়ে ছাব্বিশ হাজার লোককে চাকরি দিল। সেটা কোর্টে প্রমাণিত হয়ে গেল। না মানে ছাব্বিশ হাজারের মধ্যে অনেক লোক নিশ্চয়ই সৎভাবেই চাকরি পেয়েছিল। কিন্তু তাদেরও তো চাকরি গেল! এখন মুখ্যমন্ত্রী মঞ্চে দাঁড়িয়ে বুক বাজিয়ে বলছে হাইকোর্টের রায় ভুল! বলছে তারা ঘুষ দেওয়া লোকগুলোর হয়ে সুপ্রিম কোর্টে যাবে! সেটা খবরের কাগজের হেডলাইন হচ্ছে। ভাই এটা সভ্য দেশ? এখানে মানুষ বেঁচে আছে?'

'এটাই এখন আমাদের দেশ ভাই! সব গল্প এখন খাপছাড়া। কোনো ধড়ে মুণ্ডু নেই। কী করবি বল? দেশ ছেড়ে চলে যাবি?'

'দেশ কেন ছাড়তে হবে ভাই! এই সরকার বদলে যাবে! এরপরও কি পাবলিক এদের ভোট দেবে নাকি?'

'কেন দেবে না? এরপরেও এদেরই ভোট দেবে। বাংলার পাবলিক এরকমই। তোর কাকিমা ভোট দেবে। আমার বউদি ভোট দেবে। আমাদের মানসিকতাটা সেরকমই। সরকারের কাছ থেকে যে ভাতা পাচ্ছে, অনুদান পাচ্ছে, বাচ্চারা সাইকেল পাচ্ছে, একটা স্থিতাবস্থার মধ্যে বেঁচে থাকছে, সেগুলোর অসুবিধে হয়ে যেতে পারে অন্য দল এলে! সেই ভয়ে ভোট দেবে।'

'অর্থাৎ সরকার চুরি করছে করুক, ঘুষ নিচ্ছে নিক, আমাদেরও তো শালা কিছু কিছু ভিক্ষা দিচ্ছে, আমরা তো বেঁচেবর্তে আছি, তাই তো?'

'একদমই তাই। পাবলিক সেটাই ভাবছে। যতক্ষণ না নিজের ঘরে আগুন লাগছে, এ রাজ্যের লোকের কিছুতে কিছু এসে যায় না। দেখছিস না, নিজেদের ছেলেমেয়েগুলোর যে ভবিষ্যৎ অন্ধকার হয়ে যাচ্ছে, আমাদের কী হবে, আমরাও সরকারের ভিক্ষার টাকায় বেঁচে থাকব কিনা, সেদিকে কোনো হুঁশ নেই! আরে অনুদানের নামে যা দিচ্ছে সে তো আমাদেরই ট্যাক্সের টাকা! সেটাও বোঝে না!'

একটা মেয়ের গলা পেলাম, 'শোন ভাই, সরকার বদলে ফেললেও কী হবে? কারা ক্ষমতায় আসবে? কমিউনিস্টরা তো এখনও আসতে পারবে না। তাহলে হিন্দুত্ববাদীরা? ভাই অবস্থা আরও খারাপই হবে। এই যে রেস্টুরেন্টে বসে তোরা এসব কথা বলতে পারছিস, আর বলতে পারবি? তোদের সঙ্গে বসে আমি খেতে পারব আর? খেতে দেবে? আমরা মেয়েরা তখন তপ্ত কড়াই থেকে সোজা উনুনের আগুনে গিয়ে পড়ব। হয়তো আবার সতীদাহ বাল্যবিবাহ শুরু হয়ে যাবে।'

'সেটা তখন দেখা যাবে। এখন একটা বদল তো হোক!'

মেয়েটা বলছে, 'আমি ওসব বদল-টদলের পরোয়া করি না। একটা সুযোগ পেলেই ভাই এ রাজ্য ছেড়ে আমি পালাব।'

'পালানোটা কি কোনো সমাধান নাকি? তোর কি মনে হয় এই সরকার তোর আজীবন চলবে? এই সরকারকে কোনো রাজনৈতিক দল ফেলতে পারবে না ঠিকই, কিন্তু মানুষ একদিন বেরিয়ে আসবে এদের বিরুদ্ধে। সেদিনটার অপেক্ষায় আছি।'

'সেটা দেখার জন্য কি নিজের জীবনটাই নষ্ট করে ফেলব নাকি রে ভাই?' মেয়েটা বলছে, 'শালা প্রথম সুযোগেই বাইরে পালাব। আমার ছোটোমামা আছে গুজরাতে। বলেছে কলেজটা পেরোলেই আমাকে নিয়ে চলে যাবে। বাবা-মা-ও রাজি।'

'সেখানে গিয়ে তো অন্য মুশকিলে পড়বি রে বর্ণালী! মাছভাত খেয়ে বড়ো হয়েছিস। সেখানে গিয়ে নিরামিষ খেয়ে থাকবি? এই তো একটু আগে বলছিলি কড়াই থেকে আগুনে গিয়ে পড়ার কথা! সেটাই তো করতে চাইছিস! ওখানে হিন্দুত্ববাদীদের দাপট জানিস? লুকিয়ে লুকিয়ে মাছমাংস খেতে হয়। ওসব ধোকলা-টোকলা খেয়ে বাঁচতে পারবি?'

বর্ণালী বলল, 'হোক। পুরো ভেগান হয়ে যাব। রূপনগরে থাকা আর আমার জাস্ট পোষাচ্ছে না। নোংরা লোকদের শহর হয়ে গেছে এটা।'

কারা এরা? সবার সামনে গলা তুলে এসব মন্তব্য করছে? সামনেই রূপনগরের কলেজ। নিশ্চয়ই কলেজের লড়কা আর লড়কি এরা। প্রাইভেট পড়তে গিয়েছিল। এবার কলেজে ঢুকবে। তার আগে কিছু খেয়ে নিচ্ছে। কিন্তু কলেজে আমাদের ছেলেগুলো কী করছে? এদের এসব বাতেলা বন্ধ করতে পারে না! বহেনচোদ, একটু আলগা দিলেই সবাই মাথায় চড়ে বসে। আর দু-দিন পরেই রূপনগরে মিউনিসিপাল ইলেকশন। এরা খুল্লামখুল্লা এসব কথা বলার হিম্মত পেয়ে গেলে তো মুশকিল! আমি ভিতরে আছি এরা মনে হয় টের পায়নি। একবার বাইরে গিয়ে দাঁড়াব নাকি? মেশিনটা হাতে নিয়ে? সঙ্গে সোনিয়া না থাকলে এতক্ষণে সেটাই করতাম। কয়েকটা থাপড় লাগালেই ঠান্ডা হয়ে যেত। এত বাড় বাড়তে দেওয়া ভালো নয়।

কিন্তু সোনিয়া সঙ্গে আছে এখন। ওসব করা যাবে না। শহরে ওর বদনাম হয়ে যাবে। আংকলও ভালোভাবে নেবেন না ব্যাপারটা।

আমি বাইরের ছেলেমেয়েগুলোর কথা শুনতে শুনতেই বললাম, 'জানবররা তো নিজের বাচ্চাকেও খেয়ে নেয়! আমি ছেলেবেলায় একটা কুকুর পুষেছিলাম। মাদি। তার বাচ্চা হল। তিনটে বাচ্চা। দুটো মরে গেল। কুত্তিটা নিজেই খেয়ে নিল দুটো বাচ্চাকে। অথচ আমি তাকে যথেষ্ট খাবার দিতাম। বাচ্চাদুটোকে খাওয়ার তো কোনো কারণ ছিল না...'

রাজুও কান পেতে বাইরের কথাগুলো শুনছে। অন্যমনস্কভাবে বলল, 'আমিও দেখেছি। বিড়ালও নিজের মরা বাচ্চাকে খেয়ে নেয়।'

আমরা যেন পাল্লা দিচ্ছিলাম, কে সোনিয়াকে বেশি ঘাবড়ে দিতে পারি!

'আই ক্যান্ট ইট!', প্লেটের ওপর ছুরিকাঁটা ঝনাৎ করে ফেলে দিয়ে সোনিয়া বলল, 'আমি উঠব। এখানে আর থাকতেই ইচ্ছে করছে না। তোমরা ডিসগাস্টিং! একটা সুন্দরী মেয়ে খাচ্ছে, তার সামনে কীভাবে কথা বলতে হয় তা-ও জানো না?'

আমি হাসতে হাসতে বললাম, 'আচ্ছা একটা কোল্ডড্রিংক তো খাও সুন্দরী! অস্বস্তিটা চলে যাবে। সত্যিই আমাদের এসব কথা বলা উচিত হয়নি। কিন্তু কথা উঠে গেলে আর কী করব, বলতেই হল।'

আমি হাঁক দিতেই সঙ্গে সঙ্গে কোল্ডড্রিংকস এল। সোনিয়া মুখ নীচু করে স্ট্র-টা একমনে চুষছে। মৃদু আওয়াজ হচ্ছে। কালচে তরলটা ওর মুখে যাচ্ছে। আমি বুঝতে পারলাম এখন ওর দিকে তাকালে আমি ভয়ানক উত্তেজিত হয়ে পড়ব। ধরে রাখতে পারব না নিজেকে। আমার লন্ড তো শালা এর মধ্যেই শক্ত হয়ে গেছে। কাঁপছে।

কী আপশোশ! এত কাছে পেয়েও কিছু করতে পারব না!

এই পর্দাঘেরা কেবিন... আমি আছি জানে রেস্টুরেন্টের মালিক... আলেফ আলী এখানে বসে আছে জানলে কোনো শালা উঁকি দিয়ে দেখতে আসবে না... আমি না ডাকলে কেউ আসবে না...

যদি বহেনচোদ রাজুটা না থাকত!

কিন্তু রাজুর চোখের সামনে বসে রাজুর ওপর গুসসা করা যায় না। পরে আমি বুঝেছিলাম ওর সঙ্গে লড়াই করতে হলে, ওকে শায়েস্তা করতে হলে ওর চোখের দিকে তাকানো চলবে না।

হঠাৎ রাজু উঠে দাঁড়াল। বেরিয়ে গেল কেবিন থেকে। কী হল? পেশাব পেয়েছে নাকি বিচ্ছু কামড়েছে? আমি তাকালাম সোনিয়ার চোখের দিকে। রাজু বেরিয়ে যেতেই সোনিয়াও আমার চোখের দিকে তাকিয়েছে। একটা চুমা কি আদায় করব এখন? রাজু ফিরে আসার আগে? ফিরে যদি এসে দেখেও ফেলে, তাতে কী? ওকে বুঝিয়ে দেওয়ার দরকার আছে— সোনিয়া আমার।

আমি উঠতে যাচ্ছিলাম সোনিয়াকে জাপটে ধরব বলে, সোনিয়াও আমাকে চাইছিল, ওর চোখ দেখেই বুঝতে পারছিলাম ও জানে আমি এবার ওকে ধরব, তখনই বাইরে থেকে রাজুর গলা এল।

'আপনারা এই সময়ের ছেলেমেয়ে। আপনারা এমন বুড়োদের মতো কথাবার্তা বলছেন কেন? বুড়োদের হয়ে কথা বলছেন মনে হচ্ছে তো!'

'মানে?' মেয়েটার রেগে যাওয়া গলায় প্রশ্ন শুনতে পেলাম, 'কী বলতে চাইছেন আপনি?'

'আপনাদের নতুন কোনো কথা থাকবে না? নতুন সাড়া থাকবে না আপনাদের মধ্যে? যারা নতুন কথা বলতে পারে না, তারা বুড়ো ছাড়া আর কী বলুন তো? তারা তো মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে! জীবনে আর কিছু বাকি নেই তাদের!'

একটা ছেলে বলল, 'কী নতুন কথা বলব বলুন তো? কী বলার আছে আজ? আজকের পশ্চিমবঙ্গে রাজনীতি নিয়ে কথা বলার কোনো মানে হয়? রাজনীতি আর ভদ্রলোকের কাজই নয়। আমার বাবা একসময় পার্টি করত। ঘেন্নায় সরে এসেছে।'

'না না, তাহলে কী করে চলবে? যারা ভদ্র, যারা শিক্ষিত তারাই যদি রাজনীতি থেকে সরে আসে, রাজনীতিকে কথা বলার বিষয় বলেই না মনে করে, তাহলে রাজনীতির কী হবে?'

ছেলেটা হাসতে হাসতে বলল, 'বাংলার রাজনীতি আমাদের অপেক্ষায় নেই দাদা। সে নিজের দায়িত্ব নিজেই নিতে পারে। চোর-ডাকাতরা আছে তো রাজনীতি করার জন্য!'

'চোর আর ডাকাতরাই রাজনীতি করবে? কেন? একসময় আমাদের দেশের শ্রেষ্ঠ মেধাবী মানুষরা রাজনীতি করতেন। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিপিনচন্দ্র পাল, অরবিন্দ ঘোষ, বিধানচন্দ্র রায়, চিত্তরঞ্জন দাশ... সুভাষচন্দ্র বসুর কথা ভাবুন, কী উজ্জ্বল কেরিয়ার ছেড়ে তিনি রাজনীতিতে এসেছিলেন! আজ আমরা কী ছাড়ছি? কতটুকু ছাড়ছি?'

'তখন মানুষ আদর্শের জন্য রাজনীতি করত। ব্রিটিশের বিরুদ্ধে লড়ত। আজ ধান্দা হিসেবে করে। আমাদের সেখানে কী করার আছে?'

'আর নকশালরা?'

'এটা সত্তরের দশক নয়। সময় বদলে গেছে। পরিষ্কার কথা হল— যাদের আজ কোনো কাজ জোটে না, সেই ফিলমস্টারগুলোর আর রাজ্যের যত বদমাশগুলোর আখের গুছিয়ে নেওয়ার শেষ রাস্তা এখন রাজনীতি।'

'ঠিক। কিন্তু সেটা কেন? রাজনীতি নিয়ে আমাদের এত ঘেন্না, অথচ রাজনীতিই তো দেশ চালাচ্ছে! ওই অশিক্ষিত বর্বর লোকগুলোর ওপরেই তো আমাদের ভবিষ্যতের ভার! আমাদের জীবনে কী হবে সেটাও তো ঠিক করে দিচ্ছে তারাই! তাহলে রাজনীতি থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলে কী করে চলবে? আপনারা এত ক্ষোভের সঙ্গে কথা বলছেন! নিজেরা সক্রিয়ভাবে কিছু করছেন কি? রাস্তায় নামছেন? হয়তো দেখা যাবে আপনারা নিজেদের ভোটটা দিতেও যান না।'

এখন বুঝতে পারছি এই ছেলেটাকে ওর বাপ কেন ঘর থেকে ভাগিয়েছে! ও এসব কাজই তাহলে করে বেড়ায়! সুযোগ পেলেই উলটো-পালটা বকে! একে নিয়ে তো আংকলেরও সমস্যা হবে! এ শহরে আংকলের ইজ্জৎ নিয়েই টানাটানি হবে যদি ওকে খোলা ছেড়ে রাখা হয়!'

'সবাই রাস্তায় নেমে রাজনীতি করতে পারে কি? আপনি নিজে কী করছেন?'

'আমি এই তো কথা বলছি আপনাদের সঙ্গে! এটা যথেষ্ট নয়? তাহলে ধরে নিন আমি অপদার্থ। আমি বাতেলাবাজ। আপনারাও কি তাই?'

বর্ণালী নামের মেয়েটা বলল, 'অপদার্থ না হলেও আমরা কী করব? কেন পলিটিকস করব? লেখাপড়া ছেড়ে দিয়ে গোল্লায় যাব? তা ছাড়া সবাই কি সব পারে? এমনিতেই তো এ রাজ্যে কারও কিছু হবে না। ভবিষ্যতটা পুরোপুরি জলে ফেলে দেব?'

'আমি কি সেটাই বললাম?'

একটা ছেলে বলল, 'আমাদের মধ্যে এই যে মেয়েটাকে দেখছেন... চুপচাপ বসে আছে... সুদীপা... এর সাহস জানেন? এ ভোটে দাঁড়িয়েছিল আমাদের কলেজে। গো-হারান হেরে গেছে। তারপর এখন আবার পাহাড় বাঁচাও কমিটিতে গিয়ে নাম লিখিয়েছে। এখন কলেজে ঢুকলে আওয়াজ দেয় ওকে ওরা। ভিড়ের মধ্যে গায়ে হাত দেওয়ার চেষ্টাও করে। ও অবিশ্যি সোজা চড় কষিয়ে দেওয়ার মেয়ে। কিন্তু লেখাপড়ার ক্ষতি করে ওসব করে লাভ কী?'

রাজু একটু হতাশ গলায় বলল, 'লেখাপড়া ছেড়ে দিয়ে জীবনে কিছুই করা উচিত নয় ভাই। আমি নিজে স্কুল-কলেজে লেখাপড়া করতে পারিনি। করতে চাইনিও বলতে পারেন। কিন্তু নিজে নিজে অনেক পড়ার চেষ্টা করেছি। আমি জানি

লেখাপড়ার দাম কী। আমি শুধু বলছি, এভাবে বুড়োদের মতো সমালোচনা না করে, নিজেরা কাজে নামুন, রাস্তায় নামুন, সময়টাকে নিজেদের মনের মতো করে নেওয়ার চেষ্টা করুন।'

'বাজে বকছেন কেন দাদা? কোনো পলিটিকাল দল আজ আছে যাতে যোগ দেওয়া যায়? সবগুলোই তো চোর আর খুনিদের সিন্ডিকেট হয়ে আছে। বাইরে আলাদা আলাদা প্রতীক, কিন্তু ভিতরে ভিতরে সব্বাই এক। সবার সঙ্গে সবার সেটিং আছে।'

'কোনো দলে যোগ দিতে হবে কেন? নিজেরাই শুরু করুন কিছু! নিজেরাই নিজেদের মনের মতো একটা নতুন পার্টি গড়ে তুলুন। আজ দেশ তো তাই চাইছে! তরুণরা একটা নতুন রাজনৈতিক দল গড়ে তুলবে, যার মধ্যে পোড়খাওয়া ঘুঘু রাজনৈতিক নেতারা নয়, মেধাবী উজ্জ্বল ছেলেমেয়েরা থাকবে, তারা দেশটাকে নতুন করে গড়ে তুলতে ঝাঁপিয়ে পড়বে...'

বর্ণালী হেসে উঠল, 'ও জানা আছে। তাদের পিষে দেবে অন্য দলগুলো। দু-দিনে তারা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। পুলিশ নামিয়ে পিটিয়ে বাড়ি পাঠিয়ে দেবে। না গেলে সোজা মর্গে পাঠিয়ে দেবে।'

একটা ছেলে বলল, 'আর এই ছোটো শহরে থেকে বড়ো কিছু করাও সম্ভব নয়। কলকাতা হলে অন্য কথা ছিল। এখানে মিডিয়া নেই।'

রাজু যেন খেপে গেছে। চেঁচিয়ে উঠল, 'মিডিয়ার ওপর এত নির্ভর করেন কেন? আজ এ দেশে মিডিয়ার কাজ কেবল মানুষের মগজ ধোলাই করা। একটাও বাংলা খবরের কাগজকে আপনাদের বিশ্বাস হয়? খবরের কাগজকে বিশ্বাস করবেন না। নিউজ চ্যানেলকে পাত্তা দেবেন না। আপনাদের চিন্তা করার শক্তির বারোটা বাজিয়ে দেবে। আপনি যেটা দেখতে চান, সেটাই দেখাবে। যেটা শুনতে চান সেটাই শোনাবে। আর আপনার মতামত তৈরি করে দেওয়ার চেষ্টা করবে।'

একটা ছেলে হাসতে হাসতে বলল, 'তাহলে খবরগুলো পাব কোথা থেকে? সোশ্যাল নেটওয়ার্ক থেকে? সেখানে তো ফেক নিউজের ধান্দা চলে!'

'খবরের কাগজ থেকেই খবর পাবেন। নিউজ চ্যানেল থেকেই পাবেন। কিন্তু কেবল খবরটুকুই শুষে নিতে জানতে হবে। ওরা খবরের নামে মানুষকে যে

এন্টারটেইমেন্ট সরবরাহ করে, মানুষ যেটা খায় সেটাই যে খাওয়ায়, মানুষের মতামতকে তৈরি করে দেয়, সেটা বাদ দিতে হবে।'

'পরমহংস হতে হবে? আপনি কি রামকৃষ্ণ?'

ছেলেমেয়েগুলো হো হো করে হেসে উঠল।

আমি সোনিয়াকে দেখছিলাম। ও মন দিয়ে বাইরের কথাবার্তাগুলো শুনছে। চোখ-মুখ দেখে মনে হচ্ছে অবাক হয়ে গেছে। রাজুর কেরামতি ওর দিল জিতে নিল নাকি? এই ছেলেটাকে আমি যা ভেবেছিলাম এ তো তা নয়! এ তো খতরনাক! মানুষের মনে রং ধরিয়ে দিতে জানে, নেশা ধরিয়ে দিতে জানে! একে বেশিদূর বাড়তে দিলে অনেক সর্বনাশ করে দেবে। আংকল কি এখনও সেটা বুঝতে পারেননি?

রাজু লেকচার দেওয়ার মতো করেই বলছিল, 'হ্যাঁ, দেখুন ভাই, আজ এই রাজ্যে মানুষ হয়ে বাঁচাটা এতটাই অসম্ভব, পরমহংসই হয়তো হতে হবে। আজকের দিনে বাঁচার একমাত্র শর্ত হল, বিনা প্রশ্নে কোনোকিছুই মেনে নেবেন না। যা চোখের সামনে দেখছেন, তা-ও সত্যি না-ও হতে পারে। নিজের চোখে দেখাটা আজ কোনোকিছুর প্রমাণ আর নয়। প্রতি মুহূর্তে সত্য উৎপাদিত হচ্ছে। অসংখ্য লোকের আজ পেশা হয়ে দাঁড়িয়েছে মানুষের মনের মতো করে সত্যকে তৈরি করা। আজ আমাদের মধ্যে কোনো মনীষী নেই। কোনো চরম সত্য নেই। সব কিছুতেই বিভ্রম জড়িয়ে আছে। মিডিয়া বলুন, পলিটিকাল দল বলুন, সেলিব্রিটি বলুন, আপনাকে ভুল বোঝানোই আজ সবচেয়ে বড়ো সাফল্য তাদের কাছে। এই অবস্থায় নিজের প্রতি আপনার দায়িত্ব কতটা, বুঝতে পারছেন?'

'তাহলে কী করতে হবে গুরুদেব?'

'সন্দেহ করুন। সব কিছুকে সন্দেহ করুন। যত বড়ো ঘটনা, তত বেশি সন্দেহ করুন। জানবেন সব কিছু সাজানো হচ্ছে। সব কিছুই নাটক। স্ক্রিপ্টেড। যে ঘটনা নিয়ে আপনারা তর্ক করছেন, সেটা নাটক। যে ঘটনা নিয়ে কথা বলতেই সাহস পাচ্ছেন না, সেটাও নাটক। শাসকরা বোমা ফেলে শহরের পর শহর গুঁড়িয়ে দিতে পারে, আর একটু নাটক করে মানুষকে চমকাতে পারবে না? গ্রিক দেবতারা যেমন মানুষকে নিয়ে খেলা করত, জানবেন শাসকরা ঠিক তেমন। সব কিছু স্ক্রিপ্টেড।'

সবাই চুপ। বাইরে থেকে কোনো আওয়াজ নেই।

তারপর অন্য একটা মেয়ে বলল, 'আপনাকে আমি দেখেছি। আপনি বিবেকানন্দ বসাকের বাড়িতে উঠেছেন, তাই না? কে হন উনি আপনার?'

'উনি আমার বাবার বন্ধু। আমি তো কাজকর্ম কিছু পারি না, ব্যাবসা বা চাকরি, আমার দ্বারা কিছুই হয়ে উঠবে না। সব গোলমাল করে ফেলি। শুধু কথা বলি। কথা বলে বলে সবাইকে নাকি পাগল করে দিচ্ছিলাম, তাই আমার বাবা ওঁর কাছে আমাকে পাঠিয়েছেন।'

'কেন?'

'আমার বাবার ধারণা উনি আমাকে তৈরি করে দেবেন। যাতে জীবনে আমি কিছু করে উঠতে পারি।'

আবার ছেলেমেয়েগুলো একসঙ্গে হেসে উঠল।

একটা ছেলে গরম গলায় বলে উঠল, 'বিবেকানন্দ বসাক আপনার গার্জেন? আপনি ওঁর হাতে মানুষ হতে এসেছেন? তৈরি হতে এসেছেন? আর আপনি আমাদের এত বড়ো বড়ো কথা বলছেন? বেশ বেশ! বিবেকানন্দ বসাকের ফিডারই চুষুন গিয়ে।'

দেখলাম সঙ্গে সঙ্গে সোনিয়ার মুখ লাল হয়ে গেল।

মেয়েটা কিন্তু শান্ত গলায় বলল, 'বিকেলে আপনি চিত্তরঞ্জন পার্কে হাঁটতে যান দেখেছি। আমরাও আড্ডা দিতে ওখানে যাই প্রায়ই। ঠিক আছে। আজ বিকেলে দেখা হবে আপনার সঙ্গে। যদি বৃষ্টি না হয়। বাই দি ওয়ে, আমাকে কে আওয়াজ দিল, আমি পরোয়া করি না খুব একটা, জানেন তো! যেটা করা দরকার মনে করি, সেটাই করি। আমার নাম সুদীপা। সুদীপা সান্যাল।'

'আমি রাজকুমার চৌধুরী।'

'নাইস টু মিট ইউ!'

সোনিয়া কি খুব পেরেশান হয়ে গেছে? কী হল অচানক ওর?

মাথা নীচু করে কাটলেটের টুকরো ছড়িয়ে থাকা প্লেটটার দিকে তাকিয়ে আছে!

সোনিয়া বসাক

৫

আমি সোনিয়া বসাক। সোনিয়া। এটা নাম। এটাই ডাকনাম। আমার নামটা রেখেছিল বাপি। বাপি তখন কংগ্রেস করত। আমাদের ফ্যামিলিটা কংগ্রেসেরই। দাদুও কংগ্রেস করত। বাড়িতে তখন নাকি জওহরলাল নেহরু আর ইন্দিরা গান্ধির বড়ো বড়ো দুটো ছবি ছিল। এখন সে দুটো কোথায় আমি জানি না। বড়ো হওয়ার পর দেখিনি। আচ্ছা, আমি যদি এখন জন্মাতাম, বাপি কি আমার নাম, বাই এনি চান্স, মমতা রাখত? এটা ভাবি। ভেবে বেশ মজা পাই। রাগও হয়। হ্যাঁ, খুব রাগ হয় নিজের নামটার জন্য। একটা বেমানান বিদেশি নাম। এ নিয়ে স্কুলে-কলেজে অনেক ইয়ার্কি আমাকে সহ্য করতে হয়েছে। সবাই তো আমাকে সোনিয়া গান্ধি বলেই রাগাত! বিশেষ করে ছেলেরা— 'ওই তো সোনিয়া গান্ধি আসছে!' 'কী রে সোনিয়া, রাহুল-প্রিয়াঙ্কার খবর কী?' আমিও রেগে যেতাম। কেন রাগব না? আমি তো আর পলিটিকস করি না যে রাগ চেপে রেখে হাসিমুখ নিয়ে ঘুরব!

এই নামটা রেখে ভালো করেনি বাপি। লোকজন নাম রাখার আগে ভাবে না তাদের ছেলেমেয়েকে এই নামটা নিয়ে বাঁচতে হবে। চলতে হবে আজীবন। নামটা তাদের পছন্দের হবে কিনা, এটা নিয়ে ভাবা উচিত পেরেন্টসদের। আমি বলছি না সোনিয়া নামটা ভালো নয়, বাট এই নামটাই রেখে কী বোঝাতে চেয়েছিল বাপি? আর, আজ এই নামটা কেমন হাস্যকর হয়ে গেছে দ্যাখো! বিবেকানন্দ বসাক একসময় কংগ্রেস করত, এছাড়া এ নামটার আর কোনো মানে আছে কি?

অথচ এটা আমাকে ক্যারি করতে হবে হোল মাই ফাকিং লাইফ!

এর চেয়ে আমার নাম প্রিয়াঙ্কা রাখতে পারত বাপি! তবু চলত!

বাপির ওপর আমার কেবল এই একটাই রাগ। বাকি শুধু একটা টান। সে টান আমার অন্য কারও প্রতি নেই। আমার মতো বাপি কোন মেয়ের আছে? কিছু বলতেই হয় না, আমার মুখ দেখেই বাপি বুঝে নেয় আমি কী চাই। আমার সব কিছুই বাপি বোঝে, কোনো বাধা দেয় না। আমি মা-মরা মেয়ে। বাপি আমাকে বুকের পাঁজরের মতো ধরে রেখেছে। এসব খুব সেন্টিমেন্টাল কথা। কিন্তু এগুলো সত্যি। আমার মতো অসাড় একটা মেয়ের জীবনেও বাপির মতো একজন মানুষ আছে। একেই হয়তো বলে প্রভিডেন্স।

বাট রেস্টুরেন্টে ছেলেমেয়েগুলো যে কথাগুলো বলছিল, আমাকে শুনতে হল। আলেফকে দেখে বুঝতে পারছিলাম ওর প্রচণ্ড রাগ হচ্ছিল। আমি ছিলাম বলেই কিছু করতে পারছিল না। কেন? এরা আমাকে কী ভাবে? কচি খুকি? সিন্ডারেলা? আমি খুব খুশি হতাম যদি আলেফ উঠে গিয়ে ওদের পেটাত, মুখগুলো মেরে ফাটিয়ে দিত। আমার ধারণা, ছেলেমেয়েগুলো জানত আমরা কেবিনে আছি। আমাদের শুনিয়ে শুনিয়েই ওসব বলছিল। শহরের রাস্তায় যখন আমি বেরোই, ফিল করতে পারি অনেকগুলো চোখ আমার দিকে তাকিয়ে আছে। প্রচুর রাগ সেসব চোখে। প্রচুর ঘেন্না। কেন? আমার বাপি এই শহরটার জন্য কিছু করতে চায় বলে? এ শহরের মানুষগুলোর উপকার করতে চেষ্টা করে বলে? অনেক লোকের উপকার করতে হলে দু-একজনের ক্ষতিও হতে পারে। সেটাই কি পলিটিকস নয়? অনেক উন্নয়নের মধ্যে কিছু জায়গায় ফাঁক তো রয়েই যেতে পারে! বাপিকে ভালোবাসার মানুষও তো কম নয়! রোজ যারা এসে বাপির সঙ্গে আড্ডা দেয়, তারা এই শহরের সব নামকরা লোক। তাদের তো বাপিকে নিয়ে কোনো সমস্যা নেই! বাপি সোজা পথে টাকা করেনি। পজিশন বানায়নি। সেটা আমি জানি। সকলেই জানে। আজকের দুনিয়ায় সোজা পথে কেউ টাকা বা পজিশন করতে পারে? করাপশন যখন পশ্চিমবঙ্গে বাঁচার একটা শর্ত হয়ে গেছে, বাপি কী করবে? পিছিয়ে থাকবে? ওসব ঠুনকো মরালিটি নিয়ে বাপি মাথা ঘামায় না, বাপির মেয়েও না।

ছেলেমেয়েগুলোকে নিজের হাতে পেটাতে পারলে আমার ভালো লাগত। বাট সেটা হলে বাপি রেগে যাবে।

রাগে আমার চোখে জল আসছিল। আসতে দিইনি। চোখের জলকে আমি প্রশ্রয় দিই না।

টোটোয় ফিরতে ফিরতে রাজুকে বললাম, 'তোর ওদের সঙ্গে অত কথা বলার কী ছিল?'

রাজু যেমন ফ্যালফ্যাল করে তাকায়, বড়ো বড়ো চোখে, তেমনই তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কেন?'

কোয়েশ্চেনটা শোনো! যেন কিছুই হয়নি। অ্যাজ ইফ আমি কী বলছি ও বুঝতেই পারছে না। ছেলেটা এমন কেন? অন্যদের মতো নয়! কেমন যেন সবসময় একটা

স্বপ্নের ঘোরে আছে! আমার দিকে যখন তাকায়, মনেই হয় না সোনিয়া বসাকের দিকে তাকাচ্ছে। যেন যে-কোনো একটা মেয়ের দিকে তাকিয়ে আছে। অথচ আমার তো ওকে খুব ভালো লাগে। কী সুন্দর শ্যামলা ছিপছিপে চেহারা! মুখের মধ্যে একটা মায়াজড়ানো ভাব! এসব ছেলেকে গিলে খেতে মেয়েরা খুব পছন্দ করে। আমি আপাতত ওসব চাই না। আমার আলেফ আছে। তার মধ্যে যতটুকু স্বাভাবিক ততটুকুই। ভাইবোনের মতো তো থাকতে পারি না!

বললাম, 'তুই ওদের এসব বললি! বাপি যদি শোনে, রেগে যেতে পারে।'

'আমার যাদের সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছে করছে, বলব না?'

'বাট সবার সঙ্গে কথা বলার দরকার কী? এ শহরে আমরা সবার সঙ্গে কথা বলি না। বাপির একটা ইমেজ আছে তো!'

পাশাপাশিই বসেছি। বাট আমার ইচ্ছে করছিল ওর আরেকটু গা ঘেঁসে বসতে। ওর কি ইচ্ছে করছে না? আজব ছেলে! আলেফ যদি ওর জায়গায় থাকত, এতক্ষণে... বাট কার সঙ্গে কার তুলনা করছি!

টোটোয় গান বাজছে— 'সর্ব অঙ্গ খাইও রে কাক না রাখিও বাকি/ আমার কৃষ্ণ দরশন লাগি রেখো দুটি আঁখি'... গানটা তো বেশ সুন্দর! টোটোচালক মোবাইলে বাজাচ্ছে। বাংলা গান শুনতে মাঝেমধ্যে মন্দ লাগে না। এ গানটা মনে হয় বাংলাদেশের কেউ গেয়েছে। এ শহরে বাংলাদেশের প্রতি অনেক লোকের টান আছে। কাছাকাছিই বাংলাদেশ বর্ডার। gun আসে। গানও আসে।

'আমার তো মনে হয় সবার সঙ্গেই কথা বলার দরকার আছে। আমি আজ বিকেলেও ওদের সঙ্গে কথা বলব। ওরা বলেছে বৃষ্টি না হলে চিত্তরঞ্জন পার্কে আমার সঙ্গে দেখা করবে। ওদের সঙ্গে আমার কথা বলাটা জরুরি। অবিশ্যি আমি কথা বলে বেশিদিন মানুষকে ধরে রাখতে পারি না।'

আচ্ছা জেদি ছেলে তো! এদিকে দেখে মনে হয় বুদ্ধিশুদ্ধি নেই। নিজেই বলেছে ওকে মানুষ করার জন্য ওর বাবা আমার বাপির কাছে পাঠিয়েছে। তাহলে বাপির কথা শুনে চলবে না! বাপি যাতে রেগে যাবে, সেটা করবে! কেমন ছেলে রে বাবা! রেস্টুরেন্টে আড্ডা দেওয়া ফালতু কিছু ছেলেমেয়ের সঙ্গে ওর কী এমন কথা থাকতে পারে! রেস্টুরেন্টেই তো ওদের অনেক জ্ঞান দিল ও! যেন ওই ছেলেমেয়েগুলোর ওপর অনেককিছু ডিপেন্ড করে আছে। এত জ্ঞান যে রাজুর মধ্যে আছে আমি জানতামই না।

'আমি প্রায়ই একটা স্বপ্ন দেখি, জানিস সোনিয়া!' হঠাৎ বলল রাজু, আমার দিকে না তাকিয়েই, 'ভয়ের স্বপ্ন নয়। তবু আমার খুব অস্বস্তি হয়। আমি দেখি অনেকগুলো ভেড়া। কুয়াশার মধ্যে। কুয়াশায় তাদের স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না। খুব সুন্দর। পশমে গা একদম ভরতি, সেটুকু বোঝা যাচ্ছে। ভেড়াগুলো দ্রুত সংখ্যায়

বাড়ছে। আমাকে ঘিরে ধরছে। ওদের মুখ নীচু। হয়তো ঘাস খুঁজছে। পাচ্ছে না। কুয়াশার মধ্যে আমি কোনো ঘাস দেখতে পাই না। ঘাস কোথায়! ঘাস কোথায় গেল! এই ভাবতে ভাবতে আমার ঘুম ভেঙে যায়। গতকালও এই স্বপ্নটা দেখলাম।'

আমি কিছুক্ষণ চুপ করে রইলাম। আমার কি খুব জোরে হেসে ওঠা উচিত? বাট ও যেভাবে স্বপ্নটার কথা বলল, আমার হাসি পেল না। কী বলব? আমি তো ফ্রয়েড নই! রাজু আমার দিকে খুব ইন্টারেস্ট নিয়ে তাকিয়ে আছে। কী চাইছে? আমি স্বপ্নটা ব্যাখ্যা করি?

'ইউ আর ক্রেজি! অন্য স্বপ্ন কিছু দেখিস না?'

'দেখি নিশ্চয়ই। কিন্তু মনে থাকে না। এটা বারবার দেখি তো। মনে থেকে যায়।'

আমি টোটোচালকের দিকে একটু চেয়ে ওর কানের কাছে মুখে নিয়ে গেলাম। নিজের গরম শ্বাসের সঙ্গে ওর কানে ভরে দিলাম, 'সাপোজ তুই স্বপ্ন দেখলি অনেকগুলো মেয়ে তোকে ঘিরে ধরেছে... তারা কিছু পরে নেই... তুইও কিছু পরে নেই... এমন কিছু দেখিস না? শুধু ভেড়া দেখিস? ভেড়া তো লোকে ঘুমোনোর আগে দ্যাখে। শুয়ে শুয়ে ভেড়া গোনে। যাতে ঘুমটা তাড়াতাড়ি চলে আসে। ওটা একটা স্লিপিং টোটকা। বাপি বলেছিল। তোর বয়সে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে ভেড়া নয়, মেয়ে দেখতে হয়। কিংবা তোরও হয়তো ওটা এরোটিক স্বপ্ন। ভেড়াগুলো ছদ্মবেশী সব মেয়ে। ঘাস হল মেয়েগুলোর পিউবিক হেয়ার।... ঘুম ভেঙে গেলে কী দেখিস? হিউজ একটা ইরেকশন হয়?'

'তুই অসভ্য কথা বলতে খুব ভালো পারিস।'

আমি রাজুর দিকে তাকালাম। মুখটা একটু লাল হয়েছে। এক্সাইটেড হয়েছে কি? হলে ভালো।

'আমি অসভ্য কথা বললে তোর ভালো লাগে না? খারাপ লাগে?'

কথাটা রাজু শুনতেই পেল না মনে হল। আমি আরেকটু গা ঘেঁসে বসলাম। রাজু সরে গেল না। মে বি বুঝতেই পারল না।

বেশ হাসি পাচ্ছিল আমার। বাট হাসলাম না।

আমি চারদিকটা দেখতে লাগলাম। বৃষ্টির পরে একটা স্যাঁতসেঁতে ফগি ভাব শহরটায় ছড়িয়ে পড়েছে। কেমন বিদেশের মতো লাগছে লোকজন যানবাহনের

চলাফেরা। এই শহরটা বাপির কথায় চলে। সব্বাই বাপিকে চেনে। অনেকেই আমার দিকে তাকাচ্ছে। চোখ সরিয়ে নিচ্ছে। আমি ওদের চিনি না। কিন্তু ওরা আমাকে চেনে। বিবেকানন্দ বসাকের মেয়ে।

দূরে পাহাড়টার মাথায় এখন বৃষ্টি থেমে যাওয়ার পরের কড়া রোদ।

পোস্টারগুলো চোখে পড়ছিল। পুরোনো স্টাইল— খবরের কাগজের ওপর কালি দিয়ে লেখা হয়েছে। বাপি, এমএলএ, বিনোদ ঘোষাল আর আলেফের নামে সব পোস্টার। লেখা হয়েছে ওরা পাহাড় চুরি করছে। লেখা হয়েছে এই শহরে পাহাড় আর থাকবে না। জাস্টিস চাইছে। বাট কারা চাইছে? শহরে বাপির নামে আলেফের নামে পোস্টারিং করার হিম্মত কাদের হল? আমার ইচ্ছে করছিল টোটো থেকে নেমে পোস্টারগুলো একের পর এক ছিঁড়ে ফেলে দিই। সেটা হাস্যকর হয়ে যাবে। ক্রেজি হয়ে যাবে। বাপির পক্ষে খুব খুব সিলি একটা ব্যাপার হয়ে যাবে। বাপি তো বলেছে পলিটিকস করতে হলে অপমান সহ্য করতে হবে। একজন মালা পরালে দুজন অপমান করে যাবে, এটাই পলিটিকস। আজ যে অপমান করছে, আগামীকাল সে-ই মালাও পরাবে, এবং ভাইস ভার্সা।

বাট পাহাড় বাঁচাও কমিটি?? আই মিন, সিরিয়াসলি??? হোয়াট আ ফাক! এই জগন্নাথ গোস্বামীটা খুব বাজে লোক। বাপির সঙ্গেই ছিল। মনে মনে ইচ্ছে ছিল বাপিকে স্কিপ করে চেয়ারম্যান হবে। যখন বুঝল সেটা হওয়ার নয়, এই টাউনে হিন্দুত্ববাদ নিয়ে এল, আর নিজে তার নেতা হয়ে বসল। এখন গেরুয়া ফ্ল্যাগ নিয়ে ঘোরে। শহরে কোথায় একটা বিরাট রামমন্দির করছে। আমি জানি না কোথায় সেটা। জানার ইচ্ছেও নেই। ডার্টি রটেন স্কাউন্ড্রেল একটা! ওর কিছু করে না কেন বাপি বা আলেফ? একটা শিক্ষা তো দেওয়া দরকার! এত সাহস পায় কী করে!

এরপর নিশ্চয়ই হাইকোর্টের রায়টা নিয়ে পোস্টারিং করবে! বাপি নিশ্চয়ই গায়ে মাখবে না। বাপি খুব টাফ লোক। বাপির দিকে যখন তাকাই মনে হয় লোকটার ওপর দিয়ে কত বিপদ গেছে, কত ঝড়তুফান গেছে, বাট বাপি মাথা নীচু করেনি, ঠিক সোজা হয়ে হেঁটে চলেছে। বাপির মতো মানুষ হয় না। সেই লোকটার নামে যদি কিছু লোক আজেবাজে কথা বলে, আমি মেয়ে হয়ে সহ্য করি কী করে!

আমি রাজুর দিকে ফেরালাম। রাজু অ্যাজ ইউজুয়াল আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে।

পাখি গুনছে? মেঘ খুঁজছে? আমাদের বাড়িতে আসার পর থেকে শেভ করেনি। নরম গোঁফদাড়ি হয়েছে মুখে। মুখটা তাতে আরও সুন্দর লাগছে।

ওর চোখদুটো কী ওয়ান্ডারফুল! ঠিক বৃষ্টির পরের আকাশেরই মতো। ডানা মেলে উড়ে যাবে দুটো চোখ যেন! ন্যাচারাল উইংড আইজ!

অ্যাজ ইফ আমার পাশে থেকেও আমার পাশে বসে নেই এখন ও!

আচ্ছা, রাজু কি পরে সাধু-টাধু কিছু হয়ে যাবে? আই মিন, অপ্সরা হয়ে কি ওর ধ্যান ভাঙাতে হবে?

আমি আরও একটু ঘেঁসলাম ওর গায়ে।

নাহ্! টের পেল না।

আরেকটু গেলেই আমাদের বাড়ি। বাট টোটোটা জ্যামে আটকে গেল। একটা বিরাট লরি ঢুকছে উলটোদিক থেকে। এই রাস্তাটা ডাবল লেন নয়। পুরো রাস্তাটাই লরিটা নিয়ে নিয়েছে। ড্রাইভারের সঙ্গে ট্র্যাফিক পুলিশের ঝামেলা হচ্ছে। এমন সময় তো শহরে লরি ঢোকার কথা নয়! বাপি নিয়ম করে দিয়েছে সকাল এগারোটা অবধি কোনো লরি বা ট্রাক রূপনগরে ঢুকবে না। বাইপাস দিয়ে বেরিয়ে যাবে। নাহলে টাউনের বাইরে ওয়েট করবে। এটা ঢুকল কী করে? নির্ঘাত পুলিশ টাকা নিয়ে ছেড়ে দিয়েছে। কী বিচ্ছিরি! অনেক মোটরবাইক, টোটো, ছোটো গাড়ি আটকে গেছে। চেঁচামেচি চলছে।

হোয়াট দ্য...

সত্যিই এ দেশটার কী হবে? কেউ নিয়ম মানে না! নিজেদের সুবিধামতো চলে!

রাজু যেমন আকাশের দিকে চেয়েছিল, তেমনই এখন ভিড়ের দিকে চেয়ে আছে, অ্যাজ ইফ দুটো একই ব্যাপার। ওকে যদি এখানেই আরও দু-ঘণ্টা ওয়েট করতে হয়, ওর হয়তো কিছুই এসে যাবে না। আশ্চর্য ছেলে সত্যিই! আমার তো ইচ্ছে করছে নেমে হেঁটে চলে যাই। আরেকটু গেলেই তো...

ওঁক!

কার যেন হাত আমার মুখটাকে চেপে ধরল... সারা মুখে গলায় ঘাড়ে কী যেন মাখিয়ে দিচ্ছে কেউ আমার... আমি তাকাতে পারছি না... আমার বুকের মধ্যেও একবার হাত ঢোকাল... কী বিশ্রী গন্ধ! কী এটা! এটা কী...

অ্যাসিড!

'ওহ!' আমি চিৎকার করে উঠলাম।

কমলা রঙের পোশাক পরা দাড়িওলা রোগা লোকটা আমাকে ছেড়ে দিয়ে এক দৌড়ে ভিড়ে মিশে গেল। আমি ভালো করে তাকাতেই পারছিলাম না। বাট বুঝতে পারলাম ওকে আর ধরা যাবে না। কেবল চোখে লেগে রয়ে গেছে লোকটার ডানচোখের তলায় একটা বড়ো কাটাদাগ।

কী দিয়েছে আমার মুখে? রাজু দেখলাম খুব ঘাবড়ে গেছে। রুমাল দিয়ে আমার মুখটা মুছিয়ে দিচ্ছে। বারবার কীসব জিজ্ঞেস করছে। আমার মাথায় ঢুকছে না। টোটোওয়ালাও নেমে পড়েছে টোটো থেকে। লোকজন জমে গেছে। আমি এদের চিনি না। বাট বুঝলাম সকলেই আমাকে চেনে। কী বলছে ওরা! নাহ আমার মাথায় ঢুকছে না। অ্যাসিড শব্দটা কানে আসছে বারবার। বাট আমার মুখ তো জ্বালা করছে না!

একজনের কথা কানে এলো, 'কিছু না। নর্দমা থেকে ময়লা তুলে এনে মাখিয়েছে।'

ড্রেনের ময়লা আমার মুখে! ও মা গো!

সকালের মধ্যে দ্বিতীয়বার আমার বমি পেল।

পুলিশ এসে কোনোরকমে আমাদের টোটোটা বের করে দিল ভিড় থেকে। আবার টোটো চলতে শুরু করেছে। গায়ে আবার একটু হাওয়া লাগছে। উফ! এই গন্ধটা আর কতক্ষণ আমাকে সহ্য করতে হবে! বাড়ি কতদূর!

তারমধ্যেই আমি রাজুকে বললাম, 'বাড়িতে ফিরে বাপিকে এসব কিছু এখনই বলবি না। আমার বাড়ি থেকে বেরনোই বন্ধ করে দেবে ভয় পেয়ে।'

রাজু বলল, 'কিন্তু ওঁকে জানানোর দরকার নেই এটা?'

'না। আমি সময় মতো বলব। তুই কিছু বলবি না। ভয় পেয়ে যাবে। প্রমিস?'

বলেই আমার মনে হল বিবেকানন্দ বসাক ভয় পায় এমন কিছু আছে নাকি এ শহরে?

বাড়ি ফিরে সোজা চলে এলাম নিজের ঘরে। ফোন ব্যাগ আর বইগুলো ছুড়ে দিলাম বিছানায়। ওয়াশরুমে ঢুকলাম। ড্রেসটা টেনে খুলতে গিয়ে ছেঁড়ার শব্দ এল। ছিঁড়ে যাক। পা দিয়ে ওটাকে ওয়াশরুমের এককোণে ছুড়ে দিলাম— এই নোংরা ড্রেসটা আমি আর কোনোদিনই পড়ব না। সাওয়ারের তলায় দাঁড়িয়ে সারা শরীরে জলের তীব্র প্রবাহটা ফিল করতে করতে খুব কান্না পেল। মনে হচ্ছিল আমার সব কিছু ছিঁড়ে কান্নাটা উঠে আসছে। বাট আমি কাঁদব না। আমি কোনোদিন কাঁদিনি। আমি কাঁদিইনি জীবনে, টু টেল দ্য ট্রুথ। সোনিয়া বসাকের চোখে আজও জল কেউ দ্যাখেনি। জল কখনো-কখনো আসতে চায়। আমি আসতে দিই না। মা যখন মারা যায়, আমি খুব ছোটো। কেঁদেছিলাম কি? আজ উলঙ্গ হয়ে জলের মধ্যে দাঁড়িয়ে হাউহাউ করে কাঁদব। না। কিছুতেই না। বাট মনে হচ্ছিল আমার একটা অংশ কাঁদছে, আর আমারই আরেকটা পার্ট অবাক হয়ে সেটা দেখছে।

এই অপমান আমার নয়। এই অপমান আমার বাপির। এই পরাজয় আমার নয়। আমাকে নোংরা মাখিয়ে বাবার মুখেই আসলে সেটা মাখিয়ে গেছে লোকটা। এই শহরে তার মেয়েকে নোংরা মাখিয়ে দিয়ে গেল একটা লোক!

বাপির জানা উচিত আজ কী হয়েছে। কিন্তু এখনই যদি বলতে যাই, বাপি আর আমাকে বাড়ি থেকে বেরোতেই দেবে না। এমনিতেই আমি বাড়ি থেকে বেরোলে চিন্তায় থাকে। সঙ্গে লোক দিতে চায়। এরপর তো আর কোনো কথাই শুনবে না।

জলটার মধ্যে খুব ঠান্ডা লাগছে। কাঁপতে কাঁপতে ভাবছিলাম সঙ্গে বডিগার্ড নিয়ে ঘুরে বেড়ানো আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

বাপিকে বলতে হবে। আজই বলতে হবে। বাট খুব ট্যাক্টফুলি বলতে হবে।

অসম্ভব বুদ্ধিমান লোক আমার বাপি। যতই ঢাকবার চেষ্টা করি না কেন, ঠিক বুঝে নেবে।

আলেফ আর আমার ব্যাপারটাও বাপি জানে। আমি জানি, বাপি জানে। কিছু বলে না। আমাকে ফুল ফ্রিডম দিয়েছে বাপি। আমার সেক্সুয়ালিটি নিয়ে আমি কী করব, সেটা আমার ব্যাপার। আমি তো কাউকে ফোর্স করছি না আমার সঙ্গে জড়াতে!

কলেজ থেকে বেরিয়ে যখন আমি বললাম লিটারেচার নিয়ে ভরতি হব, বাপি কিছু বলেনি, সেটাই নিতে দিয়েছিল। ইউনিভার্সিটি থেকে বেরিয়ে যখন বললাম কিছু করব না, কলকাতায় থাকব না, রূপনগরে ফিরব, বাড়িতেই থাকব, বাপির সঙ্গেই থাকব আজীবন, চাকরি করব না, আমাকে একটা চাকরি পাইয়ে দেওয়া বাপির কাছে বাঁ-হাতের ব্যাপার ছিল, চেন্নাইয়ে গিয়ে রমেশ গুণশেখরের ডুয়ালিটি অব ট্রমা নিয়ে রিসার্চ করতে পারতাম, অফারটা ছিল, বাট গেলাম না, বললাম জীবনে বিয়ে করব না, কিছু বলেনি, একটুও ফোর্স করেনি। আমার কেরিয়ার, আমার সেক্সুয়ালিটি... কোথাও কোনো বাধা দেয়নি। কেবল আমার সিকিয়োরিটি নিয়ে কোনো কম্প্রোমাইজ করবে না। সেক্ষেত্রে আমার সঙ্গেও না। আমার কোনো কথা শুনবেই না।

রিয়েলি, কীভাবে বলব ব্যাপারটা?

তারপর বাপি কী করবে?

হয়তো এই টাউনটাকে জ্বালিয়ে দেবে।

৬

বাপি এখন আমার মুখোমুখি হলে চোখ ফিরিয়ে নেয়। দ্রুত সরে যায় আমার সামনে থেকে। বাপিকে দেখে বোঝা যায় কিছু একটা চলছে ভিতরে। সেটা এমনিতেও সবসময়ই মনে হয়। বাপির ভিতরে সবসময় একটা বয়লার খুব শান্তভাবে ফুটতে থাকে। আমার ঘটনাটা অলমোস্ট স্বাভাবিক মুখে শুনেছিল বাপি। ভেবেছিলাম রাগে ফেটে পড়বে। আমার বাইরে যাওয়া বন্ধ করে দেবে। সেসব কিছুই করেনি। কেবল ঠান্ডা গলায় বলেছিল, 'এরপর থেকে বেরোলে সঙ্গে কাউকে নিয়ে যাস।' জোরের সঙ্গে বলেনি। কথাটা কেমন যেন অস্ফুটে বেরিয়ে এসেছিল। অমন গলায় বাপি আমার সঙ্গে কথা বলে না। মনে হচ্ছিল বাপি যেন খুব জটিল একটা অঙ্ককে মেলানোর চেষ্টা করছে। আমার ঘটনাটার চেয়েও সেটা বড়ো। একটু অভিমানই হয়েছিল আমার। আমি বলেছিলাম, 'রাজু তো সঙ্গে ছিল! আচমকা কেউ ঝাঁপিয়ে পড়লে কে কী করবে?' বাপি কোনো উত্তর দেয়নি। চোখদুটো খুব স্থির মনে হচ্ছিল। তখন আমি বলেছিলাম, 'তোমারও একটু কেয়ারফুল থাকা উচিত

কিন্তু!' হাসেনি। কোনো উত্তর দেয়নি। মনে হয়েছিল আমার কথাটা যেন বাপি শুনতেই পায়নি।

আমি বাপিকে যতটা চিনি, আমার সঙ্গে ঘটে যাওয়া এই ইনসিডেন্টটা বাপিকে সবসময় খোঁচা দিচ্ছে। বাইরে কিছু বুঝতে দিচ্ছে না। বাপি অমনই। অসম্ভব ফ্ল্যাট একটা মুখ করে রাখতে পারে, ভিতরটা যখন জ্বলেপুড়ে যাচ্ছে, বাষ্প জমছে, যে-কোনো মোমেন্টে বার্স্ট করতে পারে। আমার মতোই। আমি যেমন আজ অবধি কারও সামনে কাঁদিনি। আর যখন বাপি বার্স্ট করবে— তখন খুব বিপদ ঘটতে পারে অনেকের। বাপির নিজেরও কি বিপদ ঘটতে পারে না তখন? বাপি একা কোথাও যায় না। কিন্তু যারা সঙ্গে থাকে তারা কেউ আলেফ নয়।

আলেফ একটা বোমার মতো এসেছিল। সঙ্গে আলম। দুজনেরই হাতে খোলা রিভলভার। এসেই আলেফ ফেটে পড়েছিল। ওকে দেখে বুঝতে পারছিলাম ও আমার ব্যাপারটাকে রেপ হিসেবে দেখছে। স্ট্রেট বাপির পারমিশন চাইছিল জগন্নাথ গোস্বামীকে খতম করে দেওয়ার। ওর ধারণা জগন্নাথই এটা করিয়েছে। বাপি ওকে শান্ত করেছিল। বুঝিয়েছিল গায়ে নোংরা মাখিয়ে দেওয়ার মানে এই নয় যে, আমি রেপড হয়ে গেছি। তারপর ঘরের দরজা বন্ধ করে দুজনের কিছু কথাবার্তা হল। আলেফ যখন বেরোল, তখনও ওর চোখে আগুন। বাট কিছুটা কুল লাগছিল। বাপি ওকে বলেছে জগন্নাথ অত কাঁচা ছেলে নয়। সেদিন রাতে সাধন বকশিও এসেছিলেন। দরজা বন্ধ করেই বাপির সঙ্গে কথা বললেন। তারপর আমাকে বললেন, ওঁর ধারণা এটা কোনো পাগলের কাজ। ওঁকে অবিশ্যি আমার ডিসগাস্টিং লাগে। কেমন একটা জানোয়ারের মতো মুখ! কুতকুতে চোখ! একটা সবজান্তা হাসি। হামবড়া চলাফেরা!

পাগল? যেভাবে আমাকে নোংরা মাখিয়ে চোখের পলক ফেলতে না ফেলতেই লোকটা ক্রাউডের মধ্যে মিশে পালিয়ে গেল, সেটা কোনো ম্যাডম্যানের পক্ষে সম্ভব? আর ওর পোশাকের কালারটা? সেটা নিয়ে বাপি বা সাধন বকশি কোনো কমেন্টই করল না। ও নিশ্চয়ই হিন্দুত্ববাদী পার্টির লোক। লোকটার চোখের তলায় কাটাদাগের কথাও বললাম। সেটা একমাত্র কোনো শার্প ওয়েপন থেকেই হতে

পারে। তার মানে লোকটা এসব কাজ করতে অভ্যস্ত। লোকটা গুন্ডা। সেটা নিয়েও ওরা কিছু বলল না।

আমি জানতাম এ ব্যাপারে আমার বেশি কথা বলা চলবে না। বাপির সমস্যা হতে পারে। ওরা নিজেদের মধ্যে কী কথা বলেছে, সেটাও আমি জানতে পারব না।

লোকাল খবরের কাগজে ব্যাপারটা নিয়ে যাতে কিছু লেখা না হয়, বাপি সে ব্যবস্থা করেছিল। বাট এর মধ্যে ঘটনাটা শহরে ভালোই ছড়িয়েছে। প্রচুর আলোচনা হচ্ছে। লোকজন একটু ভয় পেয়েছে। এ শহরে খোলাখুলি গ্যাং ওয়ার এখনও অবধি হয়নি। বাট সবাই জানে রূপনগর শহরটা একটা বারুদের গাদার ওপর বসে আছে। যে-কোনো মোমেন্টে প্রচুর লোকের রক্ত ঝরে যেতে পারে এ শহরে। এই ব্যাপারটায় আলেফ আর বিনোদ ঘোষাল নিশ্চয়ই একসঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়ত জগন্নাথ গোস্বামীর ওপর। শহরে একটাও হিন্দুত্ববাদী বেঁচে থাকত না তাহলে। আর তার ফল হয়তো সারা পশ্চিমবঙ্গকে ভুগতে হত।

বাপি এবার সেটা হতে দিল না। আলেফকে সামলে নিল। আলেফকে সামলাতে একমাত্র বাপিই পারে। বাপিই ওর ফ্রাংকেনস্টাইন। ও যদি কোনোদিন বাপির হাতের বাইরে চলে যায়, কী যে হবে, আমি ভাবতেই পারি না।

এরমধ্যে যেটা হল, হাইকোর্টের রায়ের ব্যাপারটা রূপনগরের লোক প্রায় ভুলে গেল। আমার ঘটনাটা বাপির পক্ষে শাপে বর হল বলা যায়। অথচ ঘটনাটাকে ওই রায়ের প্রতিক্রিয়া হিসেবেও তো লোকে নিতেই পারত! সেটাই হওয়ার কথা! অথচ... পশ্চিমবঙ্গের পাবলিক সত্যিই অদ্ভুত!

বাট বাপি ঠিক কী ভাবছে? কোনোভাবে নিজেকে আমার হ্যারাসমেন্টটার জন্য দায়ী ভাবছে কি? গিলটি ফিল করছে? আমার সঙ্গে আজকাল সেভাবে কথা বলছে না কেন? বাপি আমার সঙ্গে কথা বলা কমিয়ে দিয়েছে, আমার চোখের দিকে তাকাচ্ছে না, বাপির চোখের মধ্যে আগুনের স্পার্ক দেখতে পাচ্ছি, অথচ নিজেকে কুল দেখানোর চেষ্টা করছে, এটা আমার জন্য কতটা পেইনফুল, আমার কতটা লোনলি লাগে, বাপি কি বোঝে না?

আমি এখনও বাইরে বেরোই। কিছু আর হয়নি। একাও বেরোই। বাট সঙ্গে বেশিরভাগ সময়ই রাজু থাকে। ও সঙ্গে থাকা আর একা বেরনো তো একই

ব্যাপার। রাস্তার রোগা কুকুরকেও ও সমীহ্ করে চলে।

রাজু। এই ছেলেটা যে কী! গ্র্যাজুয়ালি বুঝতে পারছি ওর বাবা কেন ওকে আমাদের বাড়িতে পাঠিয়ে দিয়েছেন। আর পেরে উঠছিলেন না আসলে। বাট আমাদের বাড়িতে এসেও কি ও কিছু বদলেছে? আমার মনে হয় না। বাপির সঙ্গে ওর কথা খুবই কম হয়। বাপি এমনিতেই বিজি, তারপর রাজু ইদানীং যেন বাপিকে এড়িয়ে চলতে শুরু করেছে। দুজনের কথা খুবই কম হয়। তাহলে ওর এখানে এসে লাভ কী হচ্ছে বুঝি না! বাপির মধ্যেও ওর প্রতি খুব একটা ইন্টারেস্ট তো আমি দেখতে পাই না। বেশিরভাগ সময় রাজু একা থাকে। আমার সঙ্গেও কথা খুব বলে এমন নয়। একটা বই নিয়ে সেটায় মুখ গুঁজেই সময় কাটিয়ে দেয়। দেখেছি ওর বই পড়ার কোনো বাচবিচার নেই। এই হয়তো আমার কালেকশন থেকে নিৎসের 'দাস স্পেক জরাথ্রুস্ট্রা' পড়ছিল, তারপরেই দেখা গেল বেশ মন দিয়ে জেমস হেডলি চেজ পড়ছে, তারপরেই হয়তো বাপির আলমারি থেকে নিয়ে পড়ছে তারাশঙ্করের কোনো উপন্যাস। আমার সঙ্গে সিনেমাও দেখে বসে বসে। সেখানেও বিশেষ কোনো চয়েসের ব্যাপার নেই। এই হয়তো ওয়েস অ্যান্ডারসন দেখছে, তারপর আমার হয়তো মজা করে ইউটিউবে অঞ্জন চৌধুরীর 'ছোটবউ' চালাতে ইচ্ছে হল, ওকে একটু খোরাক করার জন্যই, যদি ও একটু চটে যায়, দেখলাম সেটাও বেশ এনজয় করছে। আমি চরম এরোটিক ছবিও চালিয়ে দেখেছি, ন্যুডসিন বা সেক্সসিনগুলো আমার সঙ্গে বসে দেখতে ওর কোনো বিকারই নেই। কিংবা হয়তো এক্সাইটেড হয়। আমাকে বুঝতে দেয় না। ওর পক্ষে সবই সম্ভব।

আচ্ছা ও কী গে? আলেফের দিকে কেমন যেন তাকিয়ে থাকে! অবিশ্যি সেটা আমার ভুল হতে পারে। কিন্তু আমি ইশারা দেওয়ার পরেও একটা ছেলে আমার গা টাচ করে না, এটার কোনো ব্যাখ্যা আমার কাছে নেই। জাস্ট নেই।

ও নিজের একটা ফ্যানবেস বানিয়ে ফেলেছে রূপনগরে। তারা রূপনগর কলেজের কিছু স্টুডেন্টস। তারা তো এই কয়েকদিনের মধ্যেই রাজুকে বিরাট এক মসিহা ভাবতে শুরু করেছে! এটা শুরু হয়েছিল সেদিন রেস্টুরেন্টের ব্যাপারটার পর থেকে। বাংলা মিডিয়ামে পড়া মফসসলের ছেলেমেয়েদের কোনোকিছুতেই হাঁ হয়ে যেতে সময় লাগে না। আমি নিজে রূপনগরের মেয়ে, বাট মফসসলের কোনো ছাপ

আমি নিজের মধ্যে আসতে দিইনি, বাপিও সেটার জন্য দায়ী। বাপি খুব কনশাসলি আমাকে সেভাবে মানুষ করেছে। কলকাতায় মাসিবাড়িতে রেখে লা মার্টিনিয়ার থেকে পড়িয়েছে। আমার গল্পের বইয়ের শখ জানতে পেরে সেরকম ক্ল্যাসিক সব বই কিনে দিয়েছে, ছুটিতে বাড়ি ফিরলে নিজে পাশে বসে সেরকম সিনেমা দেখিয়েছে। এ শহরে আমার বয়সের মেয়েরা যখন বাংলা সিরিয়াল দেখেছে, আমি তখন কোয়ান্টিন টারান্টিনোর মুভি দেখেছি বাবার সঙ্গে বসে। এ শহরে আমার বয়সের মেয়েরা যখন ছেলেদের সঙ্গে ফুচকা খেয়ে চিত্তরঞ্জন পার্কে গেছে, আমি হোস্টেলের বিকেলবেলায় পড়েছি আগাথা ক্রিস্টি। এখনি যদি চিফ মিনিস্টারের সঙ্গে আমাকে কথা বলতে হয়, বা স্টেজে উঠে কিছু বলতে-টলতেও হয়, আমি অ্যাট লিস্ট ঘাবড়ে যাব না। আসলে ব্যাপারটা হল, আমাকে পসিবলি রূপনগরের মেয়ে মনে হয় না। কলকাতারই মনে হয়।

আমি বলছি না কলকাতার মেয়ে হওয়াটা কোনো একটা হিউজ ব্যাপার। বাপি তো বলে যত দিন যাচ্ছে কলকাতা একটা গ্রামে পরিণত হচ্ছে। বাট সিটি লাইফ মানুষকে কিছুটা হলেও বড়ো হতে শেখায়— তুমি চাও বা না চাও পৃথিবীর অনেককিছুর তুমি সরাসরি কনট্যাক্টে চলেই আসবে। আর মফসসল শেখায় কুঁকড়ে থাকতে— নিজের ছোটো জগৎটাকেই সারা ওয়ার্ল্ড ভাবতে। রাজুর যারা ফ্যান হয়েছে, তাদের ওকে দেখে চমক লেগে গেছে, কারণ অমন ছেলে ওরা দ্যাখেনি, কাউকে ওভাবে কথা বলতে ওরা শোনেনি। আমিও রাজুর মতো ছেলে দেখিনি, ওভাবে কথা বলতে শুনিনি কাউকে। বাট আমার বিস্ময়বোধটা এ শহরের চেয়ে অনেক বড়ো না। আমাকে অবাক করা সোজা নয়।

তাই রাজুকে নিয়ে আমি কোনো আদিখ্যেতা করিনি।

একদিন রাজুর সঙ্গে আমিও পার্কে যেতে চাই। ওর সঙ্গে ছেলেমেয়েগুলোর কী কথাবার্তা হয়, আই অ্যাম কিউরিয়াস। ইচ্ছে ছিল একদিন দেখব ও কেমন ইনফ্লুয়েন্সার। বাট আমাকে দেখলে কি ছেলেমেয়েগুলো আর কথা বলবে? বিবেকানন্দ বসাকের মেয়েকে দেখলে এ শহরে সবাই গুটিয়ে যায়। বিবেকানন্দ বসাকের বাড়িতে থাকে, এটা জানার পরেও ওরা যে রাজুকে ঘিরে আছে, এটাই

অদ্ভুত লাগে। ওরা ভয় পাচ্ছে না রাজুকে? রাজু কি কোনো জাদু জানে? মানুষকে বশ করার কোনো বিশেষ ট্রিক কি জানা আছে ওর?

আমি একদিন জিজ্ঞেস করলাম, 'ওরা তোকে বিশ্বাস করে?'

ও ওর ডায়েরিতে কিছু লিখছিল। প্রায়ই লেখে। কাউকে ধারেকাছে দেখলেই লুকিয়ে ফেলে। কী লেখে কে জানে! হয়তো পোয়েমস-টোয়েমস হবে। আমার কথা শুনে ডায়েরিটা বন্ধ করল। কেমন যেন একটা ট্রান্সের মধ্যে আছে মনে হল। তবু জিজ্ঞেস করল, 'কারা?'

'যে ছেলেমেয়েগুলোকে নিয়ে তুই তোর গ্যাং তৈরি করেছিস?'

রাজু জোরে হাসল। ও গড! ওর ওই হাসি দেখলে মনে হয় ওকে নিয়ে সোজা শুয়ে পড়ি। অন্য কোনো কথা ভাবারই দরকার নেই মনে হয়। বাইরে যেমনই দেখাক, অন্যরা আমাকে যাই ভাবুক, আমার মধ্যে একটা বন্য মেয়ে বাস করে। সে ফুল দেখলে চটকে ফেলতে চায়। মোরগ দেখলে কেটে খেতে চায়। নদী দেখলে ঝাঁপিয়ে পড়ে স্নান করে নিয়ে বুঝতে চায় সেটা কেমন বয়ে যাচ্ছে। রাজুকে নিয়ে শুতে আমার ইচ্ছে করে। আলেফ জানলে প্রচুর রেগে যাবে। পাগলও হয়ে যেতে পারে। বাট কিছু করার নেই। আমি আমার ইচ্ছেকে গলা টিপে মারতে শিখিনি।

রাজু হাসতে হাসতে বলল, 'আমার কোনো গ্যাং নেই। ওরা আমার কথা শুনতে ভালোবাসে। হয়তো ওদের মনে হয় অনেককিছু সম্পর্কে আমার ধারণা বেশ আগ্রহোদ্দীপক। সে আগ্রহ ওদের মধ্যে কতদিন থাকবে জানি না। মনে হয় ওরা আগ্রহ হারাচ্ছে।'

আগ্রহ! আগ্রহোদ্দীপক! উফ! এসব শক্ত-শক্ত বাংলা ওয়র্ডস কি ও ইচ্ছে করে বলে? ও কি ভাবে আমি ইংলিশ মিডিয়ামের স্টুডেন্ট, তাই আমি এসব বুঝব না? নাকি আমাকে বাংলাভাষায় বাপ্তাইজড করতে চায়? ইদানীং ওর সামনে স্বচ্ছন্দে কথা বলতে বলতেই খেয়াল রাখতে হয় খুব বেশি ইংরেজি শব্দ বলে ফেলছি কিনা। সেটা হলে ও ওর সেই পেটেন্ট হাসিটা হাসবে। যে হাসির মধ্যে আমার জন্য কোনো প্রমিস রাখা নেই। অথচ হাসিটা আমার শরীরে আগুন লাগিয়ে দেয়। আমার রাতে ঘুমোতে অসুবিধা হয় রাজুর হাসিটা মনে পড়লে। মাস্টারবেট করে ঘুমোতে হয়।

'আই ওয়জ আস্কিং... ওরা তোকে বিশ্বাস করে কি? সেটার উত্তর তো দিলি না!'

'এতে বিশ্বাসের প্রশ্ন কোথা থেকে আসে? মানুষ মানুষের সঙ্গে কথা বলবে, এটা তো খুব স্বাভাবিক ব্যাপার!'

'স্বাভাবিক নয়। কারণ তুই ওদের কেউ নোস। কারণ তুই ওদের ক্লাসে বিলং করিস না। তোর জীবনে কোনো গোলমাল নেই। দারিদ্র্য নেই। ব্যাধি নেই। শোক নেই। আপশোস নেই। তুই এমনিতে বেশ সুখী মানুষ। বিগ সিটির ছেলে। বড়োলোকের ছেলে। জীবনে কিছু না করলেও তোর যে চলবে না এমন তো নয়! নির্ঝঞ্ঝাট জীবন তোর। তা ছাড়া তুই মানুষকে হাসাতে পারিস না। তোর হাসি দেখলে মানুষের মুখে একটা স্মাইল হয়তো চলে আসে। কিন্তু তুই তো ভাঁড় নোস, তাই না? তাহলে তোর সঙ্গে ওরা রিলেট করে কীকরে?'

'আবার ইংরেজি বলছিস?'

'ভাষার ওরকম কোনো ইংরেজি বাংলা হয় না রাজু। আমি বোঝাতে চাইছি, আর তুই বুঝতে পারছিস, আমাদের মধ্যে এমন একটা ভাষা থাকলেই চলে যাবে। সেটার শুদ্ধতা নিয়ে আমি মাথা ঘামাই না। তুই ঘামাস দেখে আশ্চর্য লাগছে। তা ছাড়া তুই কি আমার স্পিচকে কন্ট্রোল করতে চাইছিস নাকি?'

'না রে। তুই যখন ইংরেজি শব্দগুলো বলিস, তোকে মাটির চেয়ে অনেক দূরের মনে হয়। মনে হয় তুই দোতলা বা তিনতলায় দাঁড়িয়ে কথা বলছিস, আর আমি মাটিতে দাঁড়িয়ে শুনছি।'

'তোর পায়ের তলায় আদৌ মাটি আছে রে?'

রাজু নিশ্চয়ই ভাবতে পারে না আমিও গুরুগম্ভীর বাংলা বুঝতে পারি বলতে পারি। বঙ্কিমচন্দ্র হয়তো পড়তে পারি না, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ পড়তে পারি। যেমন আমি বলতে পারি রাজুর মধ্যে ধূর্ততার লেশমাত্র নেই, কৃত্রিমতা নেই, অন্তঃসারশূন্যতা নেই। ওকে দেখলে মন ভালো হয়ে যায়। বাট হাসিতে ফেটে পড়তে পারে না কেউ। ওর কথায় মানুষ বিরক্ত হতে পারে, বাট ওকে উড়িয়ে দিতে পারে না কেউ। ওর সিরিয়াসনেস নিয়ে আমার অন্তত মাঝেমধ্যেই সমস্যা হয়। আর সেটা মাস্টারবেট করে উড়িয়ে দেওয়ার নয়।

একদিন ওকে একটা স্মার্টফোন কিনে দিতে চেয়েছিলাম। বাপি আসলে আমাকে বলছিল ওকে যেন মোবাইলের ব্যাপারগুলো সব দেখিয়ে দিই। মোবাইল ছাড়া একটা ছেলে আজকের দিনে কী করে থাকতে পারে! আমি বললাম। বাট ও রাজিই হল না। বলল, 'বাবা আমার ফোন কেড়ে নিয়ে ভালোই করেছে। বেঁচে গেছি আমি।'

'কীরকম?'

'দেখ স্মার্ট শব্দটা শুনলেই আমার কেমন যেন গা ঘুলোয়। শরীর খারাপ লাগে। স্মার্টফোন হল সেই জিনিস যেটাকে আজ কেনা তো যায়, কিন্তু সেটার মালিক হওয়া যায় না। এমন জিনিস আমার মাথায় খুব বিপজ্জনক একটা চাপ তৈরি করে। বাবা জানত না, আমি মোবাইলগুলো ইচ্ছে করেই হারিয়ে ফেলতাম।'

'তাহলে তুই আপডেটেড থাকবি কী করে?'

'মোবাইল যাদের হাতে থাকে তারা কি সবাই আপডেটেড?'

আমি একটা হাই তুলেছিলাম। সরাসরি প্রশ্নটাকে ইগনোর করার জন্য বলেছিলাম, 'সবাই নিশ্চয়ই নয়। বাট মোবাইল ছাড়া তোকে এ সময়ের ছেলে বলা যায় না। তোর অন্যদের জ্ঞান দেওয়ার জায়গাটাও কেমন যেন নড়বড়ে মনে হয় আমার তখন।'

'আমি জ্ঞান দিই না রে সোনিয়া!'

'হোয়াটএভার...!'

'শোন আমি মনে করি মোবাইলের প্রেতটাকেই তুই মোবাইল ভাবিস। ওইটুকু একটা চারকোণা জিনিস, হাত থেকে পড়লে ভেঙে যায়, কিন্তু তার ছায়া তোকে গিলে নেয়, তোর জীবনটাকে ক্লোন করে নেয়— একদম তোর নকল, কিন্তু সেটা তো তুই নোস। তুই যা নোস, তুই সেটাই হয়ে উঠিস, সেটার ইশারাতেই নাচিস। আসল সোনিয়া বসাক আর কোথাও থাকে কি তখন? তোর নিজের আত্মপরিচয় তুই তখন নিজেরই হাতের মুঠোয় ধরতে পারিস কি? আমার তো মনে হয় গুগল আর ফেসবুকের অ্যালগরিদম এক-একটা ভয়ংকর হাঁ মেলে আমাকে গিলতে আসছে। আমি নিজেই একটা প্রোডাক্ট হয়ে গেছি। প্রতি মুহূর্তে আমার দিকে

তাকিয়ে আছে ওরা। আমার মনোযোগ নিয়ে বেচাকেনা হচ্ছে। আমার পছন্দ-অপছন্দ নিয়ে ব্যাবসা করছে ওরা।'

'সেই আবার জ্ঞান দিতে শুরু করলি?'

'না রে, আমি কাউকে জ্ঞান দিই না। সে যোগ্যতা আমার নেই। তা ছাড়া মোবাইল ফেলে একবার রাস্তায় বেরিয়ে দেখ জীবনকে একটা কার্নিভাল মনে হবে। সেখানে কেউ কাউকে জ্ঞান দিতে পারে না। আমি আমার মতো করে জীবনের উৎসবটাকে বোঝার চেষ্টা করছি। অন্যদের সঙ্গে সংলাপ বিনিময় করছি। তোর কি মনে হয় পার্কে গিয়ে আমি ওদের উপদেশ দিই? মোটেই না। ওরাই বরং আমাকে অনেক কিছু শেখানোর চেষ্টা করে। ওরা অনেককিছু আমার চেয়ে অনেক ভালোভাবে জানে। গতকাল যেমন সুদীপা বলল মিথ্যে খবর ওর ভালো লাগে, ও মিথ্যে খবরগুলো খুঁজে খুঁজে পড়ে, কারণ বাস্তবেরই একটা অন্য ব্যাখ্যা মিথ্যে খবরগুলো থেকে পাওয়া যায়, ও সেটা উপভোগ করে। আমারও মনে হয় মিথ্যে খবর আজকের জীবনের একটা অঙ্গ হয়ে উঠেছে। মিথ্যে খবরগুলো একরকম বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে— ওরা সরকার আর সমাজের বাইরে দাঁড়িয়ে মানুষের আচরণের সঙ্গে খেলা করছে। কিন্তু আমি নিতে পারব না। শেষে হয়তো আমাকে কোনো রিহ্যাবে পাঠিয়ে দেবে বাবা।'

'ফেক নিউজ নিয়ে মেয়েটা তোকে এসব বলতে পেরেছে কারণ ও নিশ্চয়ই রেগুলারলি সোশ্যাল নেটওয়ার্ক করে!'

'তারপরও মাথাটা ঠিক রাখতে পেরেছে।'

'সোশ্যাল নেটওয়ার্ক করলে মাথা খারাপ হয়ে যায় এমন বুড়োদের মতো ধারণা তোর কী করে হল?'

'সোশ্যাল নেটওয়ার্কে ঢুকলে আমার মাথাটা হয়তো আরও খারাপ হয়ে যাবে রে সোনিয়া! ওখানে তো একজন আরেকজনের সঙ্গে নির্ভেজাল কথা বলে না, একজন আরেকজনকে বিনোদন দেয়। ধারণার বিনিময় নেই ওখানে, কেবল ইমেজের বিনিময় আছে। সমাজের সমস্যাগুলো নিয়ে কোনো সংলাপ হয় না, কেবল নেতানেত্রীদের নাটক নিয়ে ঠাট্টাতামাশা চলে, ফাঁপা সেলিব্রিটি আর কুড়ি ওভারের ক্রিকেট নিয়ে তর্ক হয়। যে সত্য সত্য নয়, যে সত্যকে তৈরি করা হয়েছে, আমি

তো সেটা সহ্য করতেই পারব না! যেখানে অজস্র তথ্য, কিন্তু সেগুলোর কোনো সারবত্তা নেই, যেখানে সবাই ছিপ ফেলে বসে আছে আমার বুদ্ধি আর আবেগকে টোপ দিয়ে টেনে তোলার জন্য— আমি দিশাহারা হয়ে যাব। আমার সেই ঝুঁকি নেওয়া ঠিক হবে না।'

'বাট তুই একা সেটা থেকে দূরে থেকে কী করবি? বরং নিজেই ইরেলেভান্ট হয়ে যাবি। তা ছাড়া মোবাইলের সার্ভিসগুলোর কী হবে? ব্যাংকিং, রেলওয়েজ, পোস্টাল সার্ভিস, স্টক মার্কেট, ইনসিয়োরেন্স, এক্সামস, অনলাইন ক্লাসেস, পডকাস্টস, মুভিজ, ইবুকস, শপিং... এমনকি মাস্টারবেট যে করবি তার জন্য পর্ন... কোনটা এখন মোবাইল ছাড়া হয় রে? তুই তো দোকানে খেয়ে তাহলে অনলাইন পেমেন্টটাও করতে পারবি না! কোথায় আছিস, কোথায় যাবি সেসব লোকেশন জানতে পারবি না! একলা একটা মানুষ হয়ে ঘুরে বেড়াবি? জাস্ট পথভোলা এক পথিক?'

'একজন একলা মানুষও কম নয় সোনিয়া। তা ছাড়া পাগলরা তো পথ ভুলেই ভালো থাকে, তাই না?'

'তুই পাগল নোস। ইউ আর জাস্ট এ স্ট্রেঞ্জ পার্সন। ইন ফ্যাক্ট, আমার মনে হয় না তুই মোবাইল অপারেট করতে পারিস না। তুই আসলে করতে চাস না। যেমন নিজের এডুকেশনের বারোটা বাজিয়েছিস, সেটাও ইচ্ছে করেই। তুই পারিস না এমন নয়। আচ্ছা তোর যখন খুশি মায়ের সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছে হয় না?' আমি নরম গলায় বলেছিলাম, 'একটা পুরোনো দিনের মোবাইল জোগাড় করার চেষ্টা করি? আলেফকে বললেই পাওয়া যাবে। যেটায় তুই কেবল কথা বলতে আর এসএমএস করতে পারবি।'

'তুই-ই তো বলেছিস, আমি ভাঁড় নই!'

৭

আমি জানি, আমি অনুভূতিশূন্য একটা মেয়ে। শরীর দিয়ে যেটা ফিল করতে পারি না, আমি সেটা একেবারেই বুঝতে পারি না। আমার ইমোশনস আছে কিনা, ফিলিংস আছে কিনা, এসব যাচাই করতে হলে আমাকে অন্য একটা মেয়ের শরীরে ঢুকে কিছুদিন বাস করতে হবে। অন্য মেয়েরা যেমন আবেগের প্রতিমা হয়ে ঘুরে বেড়ায়, একটা কিছু হলেই হু-হু করে কেঁদে ফেলে, পান থেকে চুন খসলেই চোখে

জল এসে যায়, একটা ইনোসেন্ট কুকুরকে রাস্তায় দেখলেও মনে হয় সামনে যেন বাঘ বেরিয়েছে, আমি তেমন নই কেন? আমার আনন্দ, আমার দুঃখ, আমার ভয়, আমার আশা সব কিছু কেমন যেন আমার শরীর থেকে উঠে আসে। অ্যাংজাইটি আর ডিপ্রেশনের রোগীরা মেডিসিন নেয়, কারণ ওগুলো তখন তাদের শরীরের ব্যাপার হয়ে যায়, তাদের মনের কন্ট্রোলে তাদের ত্রাস আর বিষাদ তখন আর থাকে না। আমারও কি তেমন? আমার মন সব কিছুতে তেমন করে রেসপন্ড করে না কেন? বেজে ওঠে না কেন? আমি যেন শরীর দিয়েই ভয় পাই! যেন শরীর দিয়েই আনন্দ পাই! যেন শরীরেরই দুঃখ হয় আমার!

মা যখন মরে গেল, আমি খুব ছোটো। মনে আছে মাকে শোয়ানো হয়েছিল দোতলার বারান্দায়। আবছা মনে আছে সেদিন খুব হাওয়া বইছিল। হাওয়ার শব্দ যেন কানে লেগে আছে। অনেক ফুল ছিল। অনেক ধূপের ধোঁয়া। সেগুলো নাকে লেগে আছে। বাবা মাথার কাছে বসেছিল। আর ছিল প্রচুর কান্নার শব্দ। কারা কাঁদছিল আজ আর মনে নেই। আমাদের খুব বেশি আত্মীয়স্বজন তো নেই। যারা আছে, বাপি তাদের সঙ্গে দূরত্ব রেখে চলে। তাহলে অনেকের কান্নার শব্দ যে মাথায় গেঁথে আছে, সেটা কি আমার কল্পনা? আমি কেঁদেছিলাম কি? মনে আছে আমি মাকে একদম চিনতে পারছিলাম না। বাবাকে মঞ্চের ওপর দেখলে যেমন অচেনা লাগে, অনেক দূরের মনে হয়, মাকেও সেদিন তেমনই লাগছিল। খুব ছোটো ছিলাম, তাই হয়তো মনে নেই আমি কাঁদছিলাম কিনা। কেবল মনে আছে দুঃখ হয়নি। একটা অন্যরকম এক্সপিরিয়েন্স হয়েছিল, খুব তেতো, দম আটকে আসা, একটা বাচ্চার তা যেমন লাগে আর কী! হয়তো মৃত্যু ব্যাপারটা নিয়ে কৌতূহলী হয়েছিলাম। ভয় পেয়েছিলাম কি?

নাহ! কেঁদেছিলাম বলে মনে হয় না।

আচ্ছা আমার মনটা কি খুব কঠিন? একটা বিড়াল মরে গেলে তার লোম যেমন বাড়ির অনেক জায়গায় লেগে থাকে, তেমনই মাকে কিছুটা মনে আছে। শত্রুরা এখনও বলে বাপি নাকি মাকে মেরে দিয়েছিল। বিষ খাইয়ে। বলা হয় বাপি নাকি কোনো তদন্তও হতে দেয়নি। বাপির নামে অজস্র কুৎসার ওটাও একটা। আমি কিছুমাত্র বিশ্বাস করি না। ছেলেবেলা থেকেই মায়ের হার্ট খুব খারাপ ছিল। ডাক্তার

বলে দিয়েছিল বেশিদিন বাঁচবে না। বাপি তবু মাকে বিয়ে করেছিল। ইট ওয়াজ আ লাভ ম্যারেজ। বাপি কি মাকে খুব ভালোবাসত? ঝগড়া হত কি দুজনের? ভাব? না, আমার কিছু মনে নেই। বাট বাপি তো চাইলেই আরেকটা বিয়ে করতে পারত। করেনি। বাপির জীবনে তারপর আর কোনো মেয়ে আসেনি। আমাকে নিয়েই কাটিয়ে দিল।

অনেক ভেবেছি বাপিকে নিয়ে। যত ভেবেছি গর্ব করার অনেক কারণ খুঁজে পেয়েছি। অ্যান্ড বাপিকে কোনোদিন ছেড়ে না যাওয়ার পেয়েছি থাউজেন্ড রিজনস।

যেমন অনেক ভেবেছি আলেফকে নিয়েও। আমি কি ওকে ভালোবাসি? ভালোবাসার অনুভূতিটা ঠিক কেমন কেউ যদি আমাকে বুঝিয়ে দিত, তাহলে হয়তো বলতে পারতাম। বাপিকে যেমন ভালোবাসি, বাপির শরীর খারাপ হলে চিন্তিত হই, রাতে বেরোলে মনে হয় ঠিকঠাক ফিরবে তো, আমার চোখের দিকে না তাকালে খারাপ লাগে, এগুলোই নিশ্চয়ই ভালোবাসা, বাপিকে নিশ্চয়ই আমি ভালোবাসি। বাপি নেই এমন একটা জীবন নিজের জন্য ভাবতে পারি না। বাপি নেই, অথচ সূর্য উঠছে, হাওয়া দিচ্ছে, সবাই নিজের নিজের কাজ করছে, কোথাও কোনো ডিফারেন্স নেই, ভয়েড নেই, এমন একটা পৃথিবী কল্পনাই করতে পারি না। আলেফের ক্ষেত্রে তো সেসব কিছু নয়। আলেফ নেই এমন একটা জীবন আমার কাছে কিছুমাত্র আনরিয়েল নয়। আলেফকে খুব রিস্কি কাজে যখন যেতে হয়, তখন মনে হয় ওকে আর কোনোদিন নাও পেতে পারি, বাট খুব যে একটা বিচলিত হই, নট লাইক দ্যাট। সেটা একমাত্র বাপির ক্ষেত্রে হয়। ফ্রয়েড পড়ি বা না পড়ি, আলেফকে আমার বাপির সাবস্টিটিউট আমি ভাবতে পারি না। আলেফ যদি দুম করে কোনো গ্যাং ওয়ার-এ মরে-টরে যায়, গড ফরবিড, আমি এমন কিছু হেদিয়ে পড়ব না।

তাহলে কি আলেফ আমার প্রেমিক নয়? ফ্র্যাংকলি স্পিকিং, আমি জানি না প্রেমিক কাকে বলে। আলেফের জায়গায় একটা অন্য ছেলে থাকতেই পারত। একটা মেয়েও থাকতে পারত। আমি বাই-সেক্সুয়াল। ছেলে হোক, বা মেয়ে হোক, একটা পছন্দসই মানুষের বডি পেলেই আমার চলে যাবে। প্রেমিক থাকা কি অনুভূতির কোনো বিশেষ ব্যাপার? স্থায়ী কোনো অনুভূতি? পজিটিভ? সেক্রেড? তাহলে বলতে হয় জীবনে কখনও প্রেম করার তাগিদ আমার আসেনি। স্কুললাইফে মেয়েরা

যখন ছেলেদের গল্প করত, আমি ইমাজিন করার চেষ্টা করতাম ছেলেগুলোর পেনিস আর মেয়েগুলোর ভ্যাজাইনা একসঙ্গে কেমন লাগবে। ছেলেগুলোর মধ্যে কোনোরকম ড্রিমলাইক কোয়ালিটিজ আমার মাথায় ঢুকতই না। ছেলেদের আমার চিরকালই কেমন হাঁদা মনে হয়েছে। বড্ড প্রোজেইক।

পসিবলি আমি জন্মগতভাবেই এমন। আলেফও আমার একটা প্রয়োজনের নাম। ইট'স আ নিড, নাথিং এলস। আমার লাইফের কোনো একটা ফাঁকা জায়গায় ওকে রেখেছি। জায়গাটাকে তাই আর অত ফাঁকা লাগে না। এমন নয় যে অন্য কাউকে ওর জায়গায় বসাতে পারব না। ও আমাকে চোখে হারায় আমি জানি। হি ক্যান ডাই ফর মি, আমি জানি। বাট ওর জন্য সত্যিই কিছু ফিল করি না। ওকে আটকাই না। কেন আটকাব? একটা বন্য মেয়ে যেমন পুরুষকে চায়, বা কোনো নারীকে চায়, ও ঠিক তেমনই। কিন্তু ও যদি আমার জীবনকে কন্ট্রোল করার সুযোগ পায়, ও তো আমার ঈশ্বর হয়ে যাবে, জীবনের পার্শ্বচরিত্র আর থাকবে না। আমি হিন্দু, ও মুসলমান, এটা আমার কাছে কোনো ফ্যাক্টর নয়। বাপির কাছেও নয়, আমি জানি। আমি জাস্ট ওকে সেখানেই রাখতে চাই যেখান থেকে ও আমার জীবনটাকে হাতে নিতে পারবে না।

বাঙালি হিসেবে আমি কি খুব খারাপ একটা মেয়ে? খুব খারাপ একটা মানুষ? বাঙালি কালচারে হয়তো তাই। এবং কালচারকে আমি কিছুটা গুরুত্ব দিই। আলেফও দেয়। ওর চেহারা, ওর কথাবার্তা সবসময় বুঝিয়ে দেয় ওর পূর্বপুরুষ কোথা থেকে এসেছিল। অ্যান্ড হি ইজ প্রাউড। আমিও প্রাউড। বাপি খুব ছোটো থেকে আমাকে বুঝিয়ে দিয়েছে যতই ইংলিশ মিডিয়ামে পড়ি, হলিউডের সিনেমা দেখি, ইন্টারন্যাশনাল বেস্টসেলার বইগুলো পড়ি, আমি বাঙালি, এবং নিজের বাঙালিত্বকে সম্মান করতে হবে। যদিও সেই বাঙালিত্ব খুবই অস্পষ্ট একটা ব্যাপার। আমাকে যদি কেউ জিজ্ঞেস করে বাঙালি হওয়া ব্যাপারটা ঠিক কী, আমি বলতে পারব না। তবে মনে হয় সেক্সুয়ালি বাঙালি হওয়াটা আজকের দিনেও একটা মেয়ের পক্ষে খুবই জটিল। বিশেষ করে ইফ শি ট্রায়েস টু বি ট্রু টু হারসেলফ। নিজের শরীর বা নিজের আত্মার সঙ্গে ভণ্ডামি করে নিজের কালচারের প্রতি ফেইথফুল হওয়ার চেষ্টা না করাই ভালো। ওটা আমার দ্বারা হবেও না।

বাপি বলে মানুষ কখনও খারাপ হয় না, মানুষের পরিস্থিতি খারাপ হয়। বাট বাপি যে অর্থে কথাটা বলে, আমার ক্ষেত্রে মনে হয় খাটে না। চাইলেই কি কেউ ভালো মেয়ে হয়ে উঠতে পারে? বাংলা সিনেমার নায়িকাদের মতো? আমি হয়তো সন্ধ্যা রায় বা সাবিত্রী চ্যাটার্জি হয়ে জন্মাইনি, তাই না? কী করতে পারি আমি? আমি ভ্যাম্প হয়েই হয়তো জন্মেছি। অ্যাট লিস্ট আয়্যাম নট আ হিপোক্রিট।

আজ সকালে রাজুর ঘরে গিয়েছিলাম। কাজুও ইশিগুরোর একটা বই ও নিয়ে গিয়েছিল, 'দ্য রিমেইনস অফ দ্য ডে', অথচ সেটার কয়েকটা পাতা আমার পড়তে বাকি থেকে গিয়েছিল। আমার মাথায় কোনোরকম চিন্তা ছিল না। অন্যমনস্কভাবেই গিয়েছিলাম। দেখলাম ঘরে ও নেই। ওর ওয়াশরুম থেকে জলের শব্দ আসছিল। তখনই আমার মাথায় চিন্তাটা আসে। আমাদের বাড়ির প্রত্যেকটা ইঞ্চি আমার চেনা। আমি জানতাম ওর ওয়াশরুমের দরজায় একটা ফুটো আছে। পুরোনো বাড়ির পুরোনো দরজা।

আমি দরজায় চোখ রাখলাম। হ্যাঁ। ওকে দেখলাম আমি। এক্সপেক্ট করছিলাম দেখতে পাব। দেখলাম শাওয়ারের তলায় দাঁড়িয়ে আছে। স্টার্ক নেকেড। রোগা শরীর। বাট শরীরটা খুব সুন্দর। সেটাই ভেবেছিলাম। ওকে যেভাবে ইমাজিন করেছি, ও ঠিক তেমনই। লম্বা লম্বা চুলগুলো চোখ ছাপিয়ে সারা মুখে ছড়িয়ে পড়েছে। হাঁ করে আছে ছুটে আসা জলের ফোর্সের সামনে। যেন যে-কোনো মুহূর্তে শাওয়ারটার সামনে হার মেনে নেবে।

ওর পেনিসটাও দেখলাম। শক্ত হয়ে একটু উঠে আছে।

ইরেকশন হয়েছে নাকি! ইরেকশনই তো ওটা, আর কী! কী দারুণ লাগছে ওটাকে!

রাজুর তাহলে ওয়াশরুমে ইরেকশন হয়! কথাটা মাথায় আসতেই হাসি পেয়ে গেল।

দেখলাম ও ওটায় হাত দিচ্ছে না। সারা শরীরের সাবানে হাত চালাচ্ছে। কিন্তু ওটায় নয়। ওটাকে ছেড়ে দিয়েছে জলের জন্য। জলই ওটাকে ধুয়ে দেবে। সেটাই দিচ্ছে। আর ওটা তিরতির করে কাঁপছে। ওর মুখ দেখে মনে হচ্ছে যেন যে-কোনো মুহূর্তে হি উইল কাম।

ও কি রোজ ওয়াশরুমেই মাস্টারবেট করে?

নিশ্চয়ই করে। নাহলে একই বাড়িতে আমার সঙ্গে থাকে কী করে! মেয়েরা মাস্টারবেট করে নিজের সঙ্গে একটা বেটার আন্ডারস্ট্যান্ডিং-এ পৌঁছোবে বলে, ছেলেদের ব্যাপারটা নিশ্চয়ই তেমন নয়। নট আ বিগ ডিল।

রুম থেকে চলে আসার আগে দেখলাম ওর ডায়েরিটা বিছানায়। পেনটা দিয়ে পেজমার্ক করা আছে। কী সব লেখে ও ওটার মধ্যে? জার্নাল গোছের কিছু? নাকি লুকিয়ে লুকিয়ে নভেল-টভেল লেখে? বাংলা নভেল হলে আমার খুব একটা ইন্টারেস্ট নেই। আমার বইটা বিছানায় পড়ে আছে। ওয়াশরুমে ঢোকার আগেই নিশ্চয়ই পড়ছিল। বইটা নিলাম না। নিলে ও জানতে পারবে আমি এসেছিলাম। জানলে কি কোনো সমস্যা আছে? কিছুই সমস্যা নেই। আমার বাড়ি। আমি যে-কোনো রুমে যেতেই পারি, তাই না? ওর ঘরে যে নক করে ঢুকতে হবে, ঢুকতেই হবে, নইলে মহাভারত এঁটো হয়ে যাবে, এমন কোনো কথা আছে কি?

নক করতে আমার ভালো লাগে না। কী করব?

বাট নিজের ঘরে এসে বুঝলাম আমি চরম হর্নি হয়ে গেছি। এখনই আলেফকে পেলে হত। ডাকলেই চলে আসত। বাপি আজ বাড়িতে আছে। সেটাও কোনো ব্যাপার না। আমার কাছে আসতেই পারে। বাট আলেফ এখন টাউনের বাইরে গেছে। সন্ধ্যার আগে ফিরবে না। সন্ধ্যা অবধি থাকা সম্ভব নয় এভাবে। দরজা বন্ধ করে প্রায় আধঘণ্টা সময় নিয়ে মাস্টারবেট করলাম। কিছুই হল না। ক্লান্ত হয়ে গেলাম নিজেকে নিয়ে। সব কিছু আনবিয়ারেবল লাগছিল। কিন্তু রাজুর দৃশ্যটা তারপরেও মাথা থেকে গেল না। শরীরের হিটটা জ্বালিয়ে মারছিল আমাকে।

দুপুরে আবার ওর রুমে গেলাম। দেখলাম আদিম মানুষদের নিয়ে একটা বই পড়ছে। ওটাও আমার কালেকশন থেকেই নিয়েছে। আমি নিজে এখনও পড়িনি বইটা। কিনেছিলাম। কিন্তু পড়ার ইন্টারেস্ট আজও পাইনি। রাজু আমাকে খেয়ালই করল না। একটু অপেক্ষা করলাম। দাঁড়িয়ে থাকলাম। তারপর একটু শব্দ করেই ওর বিছানায় বসলাম। রাজু বইটা সরিয়ে আমার দিকে তাকাল, একটু হাসল, অন্যমনস্ক হাসি, হাসিটা আমার একটুও ভালো লাগল না, কেমন যেন কমন একটা হাসি ওটা ওর, সবাইকে দেখেই অমন হাসে। ও কি বুঝতেও পারে না আমি ওর কাছে কী

চাই আজকাল! সেটা চাওয়া কি খুব অস্বাভাবিক? একই বাড়িতে দুজন আছি। দিনের বেশিরভাগ সময় একসঙ্গে। ও তো আমার ছোটোভাই নয়!

নিঃশ্বাস বন্ধ করে বললাম, 'একটা কথা বল তো রাজু, কোনো মেয়ের জীবনে যদি দুজন পুরুষ আসে, সে কি খারাপ মেয়ে? আমি বেঙ্গলি মেয়েদের কথাই বলছি। তোর কী মনে হয়?'

কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল রাজু। ওর চোখদুটো দেখছিলাম। কী আছে ওই চোখে? ওর চোখের দিকে তাকালে নিজেকে কেমন লস্ট মনে হয়। মনে হয় যেন ভেসে যাচ্ছি, অথচ আমার নোঙর তো ফেলাই আছে, তবু! কেমন যেন অপরাধ বোধও আসে!

বাট খুবই স্বাভাবিক গলায় রাজু বলল, 'আজকের দিনে এটা তো কোনো প্রশ্নই নয়!'

আমি জেদি গলায় বললাম, 'তবু। তোর কী মনে হয়? দেখ, আমি এথিক্স নিয়ে মাথা ঘামাই না। আমি শুধু তোর ওপিনিয়নটা চাইছি।'

সেই আশ্চর্য দৃষ্টি মেলেই রাজু জিজ্ঞেস করল, 'কেন? আমার মত নিয়ে তুই কী করবি?'

আমি চোখ ফিরিয়ে নিলাম। বললাম, 'সংলাপ! তুই-ই তো বলিস জীবনে ডায়ালগ খুব জরুরি! আজ দেখি না তোর আমার সংলাপ থেকে কী বেরিয়ে আসে!'

একটু সময় নিয়ে রাজু বলল, 'তুই কি বিশ্বাসের প্রসঙ্গে আসতে চাইছিস? দেখ, পলিগ্যামি ব্যাপারটা মানুষের জীবনে, আমার মনে হয়, অনিবার্য। ওটার ব্যতিক্রম থাকতে পারে, কিন্তু থাকলেও তারা ঠিক স্বাভাবিক মানুষ নয়। একটা মানুষের প্রতি আরেকটা মানুষ যতই চেষ্টা করুক, শরীর-মন সবদিক থেকে বাঁধা থাকতে পারে না। সেটা সম্ভবই নয়। শরীর না হলেও মন বিদ্রোহ করবেই। অবচেতন মনে বলেও একটা ব্যাপার আছে। সেটার কী হবে?'

'সেটা আমিও জানি।' আমি জোরে বলে উঠলাম, 'এসব পুরোনো টপিক। পৃথিবীতে অজস্র আলোচনা হয়েছে এসব নিয়ে। আমি জানতে চাইছি, সেক্সুয়ালি দুটো ছেলের জায়গা হতে পারে না কি একটা মেয়ের জীবনে? সেক্ষেত্রে প্রবলেম কি হবেই? তোর পার্সোনাল ওপিনিয়নটা কী?'

রাজু বইটার দিকে তাকিয়ে ছিল। বইটা বিছানায় পাতা মুড়ে রেখে বলল, 'আজ থেকে ৬০০০০ বছর আগে পৃথিবীতে একসঙ্গে চার প্রজাতির মানুষ ছিল। ইন্দোনেশিয়ায় হোমো ফ্লোরেন্সিস, ইউরোপ আর পশ্চিম এশিয়ায় হোমো নিয়েন্ডারথালেন্সিস, সাইবেরিয়ায় হোমো ডেনিসোভানিয়ান্সিস আর আমরা অর্থাৎ হোমো সেপিয়েন্স। তখন তুষার যুগ চরমে পৌঁছেছে। সারা উত্তর গোলার্ধ আর পৃথিবীর একটা বিরাট অঞ্চল পুরু বরফের আচ্ছাদনে ঢাকা। তার মধ্যেই পাথরের কুড়ুল, পাথরের ছুরি, বর্শা, পাথরের ফলা বসানো তির দিয়ে এই চাররকমের মানুষ শিকার করত হাতির চেয়েও অনেক বড়ো ম্যামথ, বলগা হরিণ, দানবিক এল্ক হরিণ, গুহা ভল্লুকদের। সেই প্রজাতিগুলো নিজেদের মধ্যেও লড়াই করত। টিঁকে থাকার লড়াই। তারপর তুষার যুগ একসময় শেষ হল। পৃথিবীতে জলের স্তর অনেক বাড়ল। আবহাওয়া আমূল বদলে গেল। একে একে হোমো সেপিয়েন্স ছাড়া বাকি প্রজাতিগুলো মুছে গেল। প্রকৃতি ওদের বাঁচার অবলম্বন ছিল, সেই প্রকৃতিই ওদের শেষ করে দিল।'

আমার অসহ্য লাগছিল ওর বক্তৃতা। শার্প গলায় বললাম, 'তার সঙ্গে আমার প্রশ্নটার কী সম্পর্ক?'

'একটা মেয়ের জীবনে অনেকগুলো পুরুষ এলে ওই মানবপ্রজাতিগুলোর মতোই ব্যাপারটা হবে। কিছুদিন তারা পাশাপাশি থাকবে, যে যার মতো করে খাদ্য পাবে, মেয়েটার জীবনের আলাদা আলাদা এলাকায় চরে বেড়াবে। তারপর তাদের মধ্যে সংগ্রাম শুরু হবে। মেয়েটার জীবনে কে টিকে থাকবে তার লড়াই হবে সেটা। সে লড়াই রক্তক্ষয়ী হতে পারে। প্রাণঘাতীও হতে পারে।'

'কঠিন বাংলাগুলো বলিস না।'

'বলছি শেষ অবধি খুনখারাপি হতে পারে, হতে পারে কেন! হবেই। সেটাই প্রকৃতির নিয়ম।'

'অথচ, রাজু, পৃথিবীতে কিন্তু থ্রিসাম সেক্স হয়। ব্লুফিলমের বাইরেও হয়। সেটা অনেকের কাছেই খুব এনজয়েবল, যতদূর জানি।'

'কিন্তু যারা ভালোবাসে তাদের মধ্যে কি থ্রিসাম হয়? দু-বোন একজন পুরুষকে বিয়ে করেছে এমন ঘটনা অজস্র আছে। তাদের মধ্যে কি থ্রিসাম হতে পারে?

যৌনকর্মীদের ক্ষেত্রে তো হতেই পারে। কিন্তু যারা ভালোবাসে, তারা কি থ্রিসাম করতে পারে?'

'আই ডোন্ট নো। প্রেম ভালোবাসা সম্পর্কে আই সিম্পলি ডোন্ট হ্যাভ এনি আইডিয়া। তোর কী মনে হয়?'

'মনে হয় না সবাই সেটা পারে। কিন্তু পারা তো উচিত! যদি না সংস্কার বাধা হয়ে দাঁড়ায়। আমি যদি কাউকে ভালোবাসি, তাকে অন্য কারও সঙ্গে ভাগ করে নিতে আমার কোনো সমস্যা নেই। একজন মানুষ যদি আরেকজন মানুষের সঙ্গে নিজের শরীর নিয়ে খেলা করতে চায়, আর চায় তাদের মধ্যে আরেকজন সেই খেলায় আসুক, দুজনেই যদি সেটা চায়, তিনজনেই যদি সেটা থেকে তৃপ্তি পায়, সে তো খুব আনন্দের ব্যাপার। সেটায় সমাজের বাধা দেওয়া অপরাধ। এই অপরাধ সমাজ আর ধর্মের নামে করা হয়। আরও হয়তো কয়েক শতাব্দী করা হবে। তারপর মানুষ নিশ্চয়ই মুক্তি পাবে— তার শরীরের মুক্তি। মুক্তির সময়টাই তো সত্যযুগ, তাই না? ভালোবাসা আর মানুষের কামপ্রবণতাকে একসঙ্গে মিলিয়ে দেওয়ার কোনো দরকারই আমি বোধ করি না। কিন্তু আমার কথা আলাদা।'

'আলাদা কেন?'

'আমার তো মাথার ঠিক নেই! সবাই সেটা জানে।'

আমি আর পারছিলাম না। এত কাছে ও বসে আছে। ওর শরীরটা পুরোপুরি ফিল করতে পারছি। হাত বাড়িয়ে দিলে কি ও শকড হয়ে যাবে? যদি এখনই ওকে বলি আমাকে নিতে? আমাকে চুষে নিংড়ে টিপে ছিবড়ে করে ফেলতে? ও কি পারবে না? হয়তো পারবে না। কিন্তু আমি তো পারি! ওকে কিছু করতেই হবে না। কিন্তু এত কথা কেন বলছি আমি ওর সঙ্গে!

'যদি কাউকে ভালো না বাসি? বাট তার সঙ্গে শুতে ইচ্ছে করে? না ভালোবেসে সেক্স করা কি তোর মনে হয় পাপ? কাউকে ভালো না বেসে তার সঙ্গে বেড শেয়ার করলে তোর পাপী লাগবে নিজেকে?'

এর বেশি আর কি বলতে পারি? এর চেয়ে ক্লিয়ার করে আর কী বলতে পারি? নাহলে কিছু বলা চলে না। সোজা ওকে টেনে নিতে হয় নিজের শরীরে। সেটা কেন

পারছি না? কীসে আটকাচ্ছে? ঘরে ঢুকে কোনো কথা না বলাই ঠিক ছিল। কেন মুখ খুলতে গেলাম!

'আমি তো পাপ আর পুণ্যে সেভাবে বিশ্বাসই করি না! যা মানুষকে আনন্দ দেয় তা হল পুণ্য। যা মানুষকে যন্ত্রণা দেয় তা হল পাপ। এর বেশি আমি ভাবতে চাইনি কখনও। আর ভালোবাসা? আমার ভালোবাসা? মুশকিল কী জানিস সোনিয়া, আমি খুব সহজে লোককে ভালোবেসে ফেলি। সময়ই লাগে না। সঙ্গে সঙ্গেই ভালোবেসে ফেলি। আমি সবাইকেই ভালোবাসি। যারা আমাকে ভালোবাসে না, আমি তাদেরও ভালোবাসি। ভালো না বেসে কারও সঙ্গে শোয়া আমার সাধ্যেই নেই।'

আমি ছিটকে উঠে পড়লাম। মনে হচ্ছিল আমাকে বরফের মধ্যে পুঁতে দেওয়া হয়েছে। আমার সারা শরীর ধীরে ধীরে হিম হয়ে যাচ্ছে। অসাড় লাগছে নিজেকে আরও। হ্যাঁ। বড্ড বেশি এক্সপেকটেশন নিয়ে এসেছিলাম ওর ঘরে। আমি তো এমনিতেই অনুভূতিশূন্য একটা মেয়ে। এই ঘরে আমার সামনে যে ছেলেটা বসে আছে, হাত বাড়ালেও ও কি ওর শরীরটা আমাকে দিয়ে দেবে? আপত্তি করবে না? আমি জানি না। ও বুঝতে পারছে নিশ্চয়ই আমার কষ্ট হচ্ছে। আমি আর পারছি না। ও কি বুঝতে পারেনি ওর শরীরটা নিতেই আমি এসেছিলাম? কেন সেটা হল না!

ওই যে সংলাপ! কেন যে কথা বলতে গেলাম! ঘরে ঢোকার আগে যে কথাগুলো মাথাতেই আসেনি, সেগুলোই বলতে শুরু করলাম! কেন!

ও আমাকে ভালোবাসে। জানি জিজ্ঞেস করলেই বলবে ও আমাকে ভালোবাসে। ও সবাইকেই ভালোবাসে। ও এ যুগের যেশাস ক্রাইস্ট।

আমি তো ভালোবাসা চাইনি ওর কাছে!

আমি কারও কাছেই ভালোবাসা চাই না।

যদি সেই ভালোবাসা একটা ভুল ধারণা হয়, ইলিউশন হয়, তাহলেও চাই না।

রাজু তো আলেফকেও ভালোবাসে, তাই না?

ওহগড! কেন এতটা শরীরী করে তুললে আমাকে! কেন আমি নিজেকে ধরে রাখতে পারি না! তুমি আমাকে স্যাপিয়োসেক্সুয়াল বানালে না কেন!

আমার গ্রে ম্যাটার তো কারও চেয়ে কম ছিল না!

আফ্রিকান একটা প্রবাদ আছে— যতদিন না সিংহ তার নিজের গল্পটা লিখতে পারছে, প্রত্যেকটা গল্প শিকারিকেই গ্লোরিফাই করবে। ভাবছি, আমি কি সিংহের গুহায় বাস করছি, নাকি শিকারির তাঁবুতে? রূপনগর শহরটা ভিতর থেকে গরম হয়ে উঠছে। এ শহরে যারা বাস করে, সবাই সেটা টের পাচ্ছে। একটা চাপা এক্সাইটমেন্ট সব জায়গায় ফিল করা যাচ্ছে। কিন্তু বাইরে দেখা দিচ্ছে না। সেটা খুবই বিপজ্জনক। এমন সময় যে কোনোকিছু এ শহরে ঘটে যেতে পারে। এনিথিং ক্যান হ্যাপেন। এনিথিং। এ শহর এমনিতেই খুব সেফ জায়গা নয়। বর্ডারের কাছে, পশ্চিমবঙ্গের ম্যাপে এটা স্মাগলিং-এর একটা নামকরা রাজধানী। মাসের মধ্যে দু-একটা ডেডবডি রূপনগরে দেখতেই পাওয়া যায়। তাদের কেউ এখানকার লোকের চেনা, কেউ পুরোপুরি স্ট্রেঞ্জার। মার্ডার ব্যাপারটা এখানে কাউকে অবাক করে না। বাট ছিনতাই হয় না। ডাকাতি হয় না। চুরি হয় না বললেই চলে। মেয়েদের মলেস্টেড হতে হয় না। রাত নটা-দশটার পরেও মেয়েরা টিউশন থেকে নিশ্চিন্তে বাড়ি ফিরে আসে। গ্যাং ওয়ার কখনোই ভিতর থেকে ওপরে তার ফণা তোলে না। খুনখারাপি বোঝাপড়া যা কিছু হয়, সব নিজেদের মধ্যে। সাধারণ মানুষ ঝামেলার মধ্যে নেই।

বাট এ সময়টার কথা আলাদা। এ সময় সব কিছু বদলে যেতে পারে। অনেক বাইরের লোক শহরে ঢুকে পড়েছে এখন। রেললাইনের পাশের বস্তি এলাকাটায় তারা আস্তানা নিয়েছে। ও জায়গাটা দিনের বেলাতেই ভয়ানক। এমনিতেও এখন এ শহরে কেউ নিরাপদ আর নয়। ভোটের দিন ঘোষণা যে-কোনো দিন হতে পারে। হয়তো পুজোর পরেই ভোটটা হবে। শহরের বেছে নেওয়া ওয়ালগুলোয় এরইমধ্যে হোয়াইট ওয়াশ করা হয়ে গেছে। দিন ঘোষণা হলেই লেখা শুরু হয়ে যাবে। বেশিরভাগ ওয়াল বাপিরই দখলে আছে। জগন্নাথ গোস্বামী বড়ো রাস্তার ওপর কোনো ওয়ালই প্রায় পায়নি। যা পেয়েছে গলিগুলোর মধ্যে। প্রচার যে-কোনোদিন শুরু হয়ে যাবে। আপাতত জনসংযোগ চলছে।

বাপির কাছে এখন সবসময়ই বিভিন্ন লোকের আনাগোনা লেগে আছে। বিভিন্ন লেভেলের লোকের সঙ্গে বাপি আলাদা আলাদাভাবে কথা বলে চলেছে। তাদের অনেককেই আমি চিনি না। অনেকেরই চোখের দিকে তাকাতে ভয় করে।

রূপনগরের মিউনিসিপালিটিকে এই অঞ্চলে বিধানসভা বা লোকসভার চেয়ে কম ইম্পর্ট্যান্ট বলে ধরা হয় না। বরং বেশিই ধরা হয়। এমএলএ সাধন বকশি যা করেন, বাপিকে জিজ্ঞেস করেই করেন। এমপি সিটটা অবিশ্যি হিন্দুত্ববাদীদের দখলে এখন, কিন্তু এমপির এ অঞ্চলে তেমন কিছু করার নেই, তিনি একজন অভিনেত্রী, পলিটিকসের কিছু বোঝেন না, পার্লামেন্টে বা রূপনগরে তাঁকে দেখা যায় না।

আসল কথাটা হল, মিউনিসিপালিটির জন্য দুটো দলই জান লড়িয়ে দেবে। পাবলিকও কোন দলকে চায়, কিছু বোঝা সম্ভব নয়। বাপি কী প্ল্যান করেছে, আমি সেটাও বুঝতে পারছি না।

আমাদের বাড়িতে বন্দুক ঢুকেছে বেশ কয়েকটা। বিনোদ ঘোষাল আর আলেফ দিনের মধ্যেই কয়েকবার করে আসছে। কয়েকজন লোক বাড়িতেই রয়ে গেছে। তারা একতলায় আছে। একজন গলায় রুদ্রাক্ষের মালা-টালা পরে আছে। ওরা বেশ ধুমধাম করে সকাল-সন্ধে কীসব পুজো-টুজো করে। কাঁসর-ঘণ্টাও বাজায়। ওদেরই তো হিন্দুত্ববাদী মনে হয়! এদিকে রোজ বিরিয়ানি আনিয়ে খায়। বাপি ওদের নিয়ে কী করবে? লোকগুলোর জন্য আমার এখন আর একতলায় নামতে ইচ্ছে করে না। আলেফ এখন আমার রুমেই আসে।

আজ সকালে বাড়ির সামনে দিয়ে হিন্দুত্ববাদীদের মিছিল গেল। প্রায় শ-তিনেক লোকের মিছিল। প্রচুর বাইক। অনেকের হাতে ধারালো অস্ত্র। সেগুলো ওরা হাওয়ায় নাচাচ্ছিল।

বাট এ তো রামনবমীতে হত! আজ কেন! নিজেদের পাওয়ার দেখাচ্ছে!

বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ ধরে স্লোগান দিল ওরা। মাথায় কমলা ফেট্টি। কমলা পোশাক। জয় শ্রীরাম আর জয় শ্রীরাম! বাড়িতে তখন আলেফ ছিল। আমার তো ভয় করছিল ও না পেশেন্স হারিয়ে ফেলে। বাট বাপি থাকতে সেটা হওয়ার নয়। হিন্দুত্ববাদীরা পসিবলি চাইছিলই আমাদের বাড়ি থেকে কেউ কিছু করুক। তাহলে কি ওরা বাড়িতে ঢুকে আসত? এরকম সময়েই আমি বুঝতে পারি আমি আমার বাপি নই। আমি পুরোপুরি আলাদা একটা মানুষ। আমার রিঅ্যাকশন আলাদা। আমার চিন্তা আলাদা। আয়নায় তাই আমি নিজেকেই দেখি, বাপিকে দেখতে পাই না। আমার পক্ষে ওই সোর্ডস, কুড়ুল, ভোজালি, কুকরি, টাঙিগুলোর

সামনে কুল থাকা সম্ভবই নয়। ওরকম সময়ে আমার তীব্র ইচ্ছে হয় কেউ যদি আবার আমাকে আমার মায়ের ইউটেরাসে ফেরত পাঠিয়ে দিত! আবার একইসঙ্গে মনে হয় একটা গান হাতে নিয়ে ওদের সামনে দাঁড়াই। ভয়ের মধ্যে সে ইচ্ছেটাও টের পাচ্ছিলাম। মানুষের মাথা কী অদ্ভুত জিনিস! আমার মধ্যেও হয়তো একজন ভীতু টেরোরিস্ট বসে আছে। আবার একজন এসকেপিস্টও।

পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে একটা আগুন ভিতরে ভিতরে জ্বলে উঠেছে। সেটা কেবল পলিটিকাল আনরেস্ট নয়। অনেকরকম হিসাবনিকাশ সেটায় কাজ করছে। বাপির চোখের মধ্যে তার আভাস আমি আগেই পেয়েছি। বাপির চোখকে বদলে যেতে দেখেছি সেদিনের পরেই। হ্যাঁ, আমার ঘটনাটা আমার চেয়েও অনেক বেশি করে বাপিকে নাড়িয়ে দিয়েছে। বিবেকানন্দ বসাকের মেয়ের গায়ে কেউ হাত দেবে, নোংরা মাখাবে, এই শহরটার মধ্যে, এটা জাস্ট আনথিংকেবল বাপির কাছে। সবার কাছেই। ওটা কোনো পাগলের কাজ কিনা, বাপি এতদিনে নিশ্চয়ই জেনে নিয়েছে। ওটা যদি জগন্নাথ গোস্বামী করিয়ে থাকে, তার ফল তাকে ভুগতে হবে। আমি জানি। আমি বাপিকে যতটা জানি।

বাপি মামুলি প্রতিহিংসা নেওয়ার লোক নয়। বাপি যেটা মানে, সেটাকে জাস্টিস বলা যায়। আমাদের দেশে জাস্টিস শব্দটা খুবই কমপ্লেক্স একটা স্পেসের মধ্যে পাবলিককে নিয়ে যায়। সেটা সিবিআই-এর তদন্ত দিয়ে বোঝা যাবে না। হাইকোর্ট বা সুপ্রিম কোর্ট দিয়ে বোঝা যাবে না। পশ্চিমবঙ্গের পাবলিক আসলে জাস্টিস বলতে যেটা বোঝে, সেটা কিছুটা হয়তো সো কলড কমার্শিয়াল সিনেমাগুলোর মধ্যে ধরা পড়ে, কিন্তু অনেক বেশি রং চড়িয়ে, একটা অবাস্তব লেন্সের ভিতর দিয়ে। বাঙালির মধ্যে কতখানি ভায়োলেন্স আছে সেটা পাড়ায় একটা চোর বা বাসে একটা পকেটমার ধরা পড়লেই বোঝা যায়। বাপি মেকিয়াভেলি পড়েছে। সেনেকা পড়েছে। শেক্সপিয়র পড়েছে। বাট বাপির মতো মানুষকে বাঙালি পাবলিকের সাইকোলজিটাও মাথায় রাখতেই হয়।

রাজু কী অদ্ভুত ছেলে! আজ বাড়ির সামনে যখন হিন্দুত্ববাদীরা চিৎকার করছে, তার কিছুক্ষণ আগেই ও মর্নিং ওয়াক থেকে ফিরেছে। তখন আমার মাথা বিভিন্ন দিকে ছুটে যাচ্ছে, চিৎকারগুলো সহ্য করতে পারছি না, রাজু হঠাৎ আমাকে বলল,

'এজন্যই আমার মনে হয় সমাজে সব মানুষের শিক্ষিত হওয়া খুব দরকার। আর আমাদের মতো দেশে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোয় বাধ্যতামূলক ধর্মশিক্ষা চালু করা উচিত। সব ধর্মকেই সম্মান করতে শিখবে তাহলে মানুষ। পরীক্ষায় পাশ করার জন্য তাকে সেটা শিখতেই হবে। হিন্দু ছেলেমেয়েদের দেওয়া উচিত মসজিদে গিয়ে কাজ করার প্রোজেক্ট। মুসলিম ছেলেমেয়েদের মন্দিরে। এই যে এরা এত চেঁচাচ্ছে, আমার ওদের ওপর রাগ হচ্ছে না। দুঃখ হচ্ছে। এরা কি ধর্ম কাকে বলে জানে? এত যে এরা আস্ফালন করছে, তোর মনে হয়, এরা ঈশ্বর কাকে বলে জানে? যদি জানত, তাহলে ঈশ্বরকে নিয়ে চিৎকার করতে পারত না। এদের নিয়ে রাজনীতিও করা যেত না।'

ওর সরলতায় ভয়ের মধ্যেও আমার একটু মজা লাগল, 'তুই তো সেটা জানিস নিশ্চয়ই?'

রাজু মাথা নাড়ল, 'হয়তো জানি। হয়তো জানি না। কেউ বলতে পারে কি সে ঈশ্বরকে জানে কিনা? কিন্তু একজন মহিলার ইন্টারভিউ পড়েছিলাম। উনি ক্যানসার রোগী ছিলেন। কোমায় চলে গিয়েছিলেন। ডাক্তার বলেছিল উনি মারা গেছেন। সেই অবস্থা থেকে উনি ফিরে আসেন এবং অদ্ভুতভাবে সুস্থও হয়ে যান। মহিলা মৃত্যুর পরের ওই অবস্থাটা সম্পর্কে কী বলেছেন জানিস? উনি বলেছেন মৃত্যুর পরে মানুষের সঙ্গে তার জীবন থেকে নিয়ে যাওয়া কিছুই থাকে না। এক আশ্চর্য আনন্দের মধ্যে মানুষ জেগে ওঠে। সে সব কিছুই দেখতে পায়। সব কিছুই শুনতে পায়। কিন্তু তার চোখ বা কান বলে কিছু থাকে না। মহিলা বারবার কেবল বলেছেন সেটা একটা আশ্চর্য অবস্থা। তিনি নিজের দেহটা দেখতে পাচ্ছিলেন। সেটা শুয়ে আছে হাসপাতালের কেবিনে। সেটা ঘিরে নার্স ডাক্তার আত্মীয়রা আলোচনা করছে। ওঁর মা কাঁদছিলেন। ওঁর ইচ্ছে করছিল সবাইকে বলেন উনি ভালো আছেন, খুব ভালো আছেন, অত ভালো উনি জীবনে কখনও বোধ করেননি। কিন্তু বলার উপায় ছিল না। যোগাযোগের কোনো উপায় ছিল না। এক অপার অনুভূতির মধ্যে ডুবেছিলেন উনি— কিংবা নিজেই হয়ে উঠেছিলেন সেই অপার অনুভূতির একটা অংশ। সেটাকে উনি বলেছেন নিঃশর্ত ভালোবাসা। যে ভালোবাসার মধ্যে ভালোবাসা ছাড়া আর কিছুই নেই। উনি বলেছেন ওটাই মৃত্যুর পরের অবস্থা। বলেছেন ওই

নিখাদ ভালোবাসাই হলেন ঈশ্বর। ঈশ্বর নিঃশর্ত ভালোবাসা ছাড়া আর কিছুই নন। আমার খুব ভালো লেগেছে ওঁর কথাটা— 'ঈশ্বর হলেন নিঃশর্ত ভালোবাসা।'

জয় শ্রীরাম স্লোগানে কান ফেটে যাচ্ছিল। তারমধ্যেও জিজ্ঞেস করলাম, 'উনি কি খ্রিস্টান?'

'না। হিন্দু। কেন?'

'হিন্দুরা কি ঠিক ওভাবে ঈশ্বরের কথা ভাবে?'

'অবশ্যই! ওঁর বর্ণনার সঙ্গে তো ব্রহ্মের সম্পর্কে ভারতীয় যে ধারণা, তা হুবহু মিলে যায়!'

'ব্রহ্ম আর ঈশ্বর তো এক নয়, তাই না? ব্রহ্ম কী সে তো কেউ বলতে পারে না! অ্যাজ ফার অ্যাজ আই নো...'

'উনিও তো বলতে পারেননি! শুধু বলেছেন আশ্চর্য। বলেছেন আনন্দ। আর বলেছেন শর্তহীন ভালোবাসা। সেটার জন্য বিশেষ কোনো ধর্মের লোক তো হতে হয় না রে! ওঁর কথা অনুসারে মরার পর মানুষ তার ধর্ম সঙ্গে নিয়ে যায় না। যেমন জন্মানোর সময় সে কোনো ধর্ম সঙ্গে আনেনি। হিন্দুদের ঈশ্বর, খ্রিস্টানদের ঈশ্বর, মুসলিমদের ঈশ্বর, ইহুদের জিহোবা, বৌদ্ধদের নির্বাণ... সব ওই একই... ওই নিঃশর্ত নিখাদ ভালোবাসা।'

আমার কথাগুলো খুব ভালো লেগেছিল। তবু রাজুকে খোঁচা দেওয়ার লোভ হল, 'তোর মধ্যে কিন্তু মহামানব হওয়ার সবরকম গুণই আছে, বুঝলি?'

রাজু হাসতে হাসতে বলেছিল, 'এখন আমাদের মধ্যে একজনও মহামানব নেই। আমরা সবাই এখন আবার গুহামানব।'

তারপর আমি সারাদিন রাজুর কথাগুলো ভাবছিলাম। ও যা বলল, তাই যদি হয়, তাহলে তো মানুষের মরতে ভয় পাওয়া উচিত নয়! মরার পরেই মানুষ তাহলে সবচেয়ে ভালো থাকবে, ওর কথা যদি ঠিক হয়। আমি মৃত্যু নিয়ে কখনও ভাবি না। বাট রাজু আমাকে ভাবতে বাধ্য করল। তাহলে তো মায়ের কথাও ভাবতে হয়! মা নিশ্চয়ই খুব ভালো আছে। কারণ আমি যতদূর বুঝেছি মা ভালোবাসায় বিশ্বাস করত। বাপিকে ভালোবেসেছিল। আমাকে ভালোবেসেছিল। এখন নিশ্চয়ই আমাদের জন্য একটা ওয়ান্ডারফুল জগতে, বা অন্য একটা ডাইমেনশনে, অপেক্ষা করছে।

বাট মরার পর যদি কেবল নিঃশর্ত ভালোবাসাই থাকে, আমার কী হবে? আমি তো বুঝিই না ভালোবাসা কাকে বলে! বুঝতে চাইও না। রায়ান অ্যাডামসের একটা মিউজিক অ্যালবাম আছে— 'লাভ ইজ হেল'। আমার সঙ্গে একদম যায় নামটা।

সেদিন সকালের মিছিলটার পরেই বাপি বেরিয়ে গিয়েছিল। সন্ধ্যার পরেও ফিরল না। বাট সন্ধ্যার পরে আলেফ এলো। ওর মুখ দেখে বুঝতে পারছিলাম কিছু হয়েছে। ওর মুখ আমি চিনি। প্রত্যেকটা মাসলের মুভমেন্ট চিনি। খুব সিরিয়াস কিছু হয়েছে, বা হতে চলেছে।

বাপির কিছু হয়েছে? শরীরের মধ্য থেকে ভয়ের একটা বেসামাল করে দেওয়া অনুভূতিতে উঠে আসছিল আমার।

বাট তখনই বাপি কল করল। খুব স্বাভাবিক গলায় বলল, 'আলেফের বাইকে তুই একটু চলে আয়। ভয় পাস না।'

বাপি জানে কখন আমি ভয় পেতে পারি। বাপি জানে সেই ভয়টার ওপর আমার কন্ট্রোল থাকে না। তাই ফোনটা করল। নাহলে আলেফের কথাতেই আমি বেরিয়ে আসতে পারতাম। ওকে আমি পুরোপুরি বিশ্বাস করি। আমার জন্য ও প্রাণ দিতে পারে।

রাতের রূপনগর অনেকদিন পরে দেখছিলাম আলেফের রয়্যাল এনফিল্ডের পিলিয়ন সিটে বসে। কী ঝলমল করছে রূপনগর! আ গ্লোইং টাউনশিপ! এই শহরটা বাপি সাজিয়েছে। দশ বছর আগেও রাস্তায় এত ট্র্যাফিক ছিল না। রাস্তায় টু লেন ছিল না। এসব বাপি করিয়েছে। ত্রিফলা আলো বসেছে। রাস্তার ডিভাইডারে গাছ লাগিয়েছে। দশ বছর আগেও রূপনগরকে একটা গ্রামই মনে হত। এখন চেহারা আলাদা হয়ে গেছে। এই শহর তারপরও বাপির সঙ্গে বেইমানি করবে কি?

আকাশে মেঘ জমেছে। মাঝেমধ্যেই ফ্ল্যাশিং হচ্ছে। যে-কোনো মুহূর্তে বৃষ্টি নামবে। বাতাসে শীতের আমেজ। পুজো আসছে। কিন্তু প্রায় প্রতিদিনই বৃষ্টি হচ্ছে। হালকা বৃষ্টি।

খুব জোরে চালাচ্ছে আলেফ। হাত আর কাঁধের মাসলগুলো শক্ত হয়ে আছে। আমি ওর সিংহের মতো সরু কোমর ধরে আছি। যখনই ওকে জড়িয়ে ধরি, মনে হয় কী দুর্দান্ত ফিগার আলেফের! কী দুর্দান্ত পার্সোনালিটি! হলিউডের হিরোদের

মতো। রাস্তার দিকে যেন ওর কোনো পরোয়াই নেই! বাট আমি জানি ও খুব কেয়ারফুলি চালাচ্ছে। আমাকে পেছনে নিয়ে ও কোনো রিস্কের মধ্যে যাবে না।

বুঝতে পারলাম ও রেলকলোনির দিকে যাচ্ছে। জায়গাটা এ সময় খুবই বিপজ্জনক। কিন্তু আমার চিন্তা কী? আমি এ শহরের সবচেয়ে বিপজ্জনক মানুষটার সঙ্গেই তো যাচ্ছি! এই তো পিস্তলটা গোঁজাই আছে ওর কোমরে।

রেলকলোনির মধ্যে গেল না আলেফ। বাইক নিয়ে একটা মোরাম রাস্তায় ঢুকল। এটাও মিউনিসিপালিটির মধ্যেকার এলাকা। সেভাবে লোকজন থাকে না এখনও। ইলেকট্রিসিটি নেই রাস্তাটায়। কিছুটা যেতেই অন্ধকারে পাহাড়ের মতো একটা বিল্ডিং দেখা দিল। তৈরি হচ্ছে। কাজ এখনও অনেক বাকি। অনেকটা জায়গা পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। কিন্তু গেট নেই। সেটার মধ্যে ঢুকল আলেফ। জায়গাটা নিস্তব্ধ। আলেফের বাইকের আওয়াজ অনেক জোরে শোনা যাচ্ছে, কাঁপছে জায়গাটা। প্রচুর ইট বালি স্টোনচিপস তক্তা লোহা ছড়িয়ে আছে যেখানে সেখানে। ঝিঁঝি ডাকছে। ব্যাং ডাকছে। আমি মরে গেলেও এমন একটা জায়গায় একা ঢুকতে পারব না।

বৃষ্টি শুরু হল। বাট সেভাবে গায়ে লাগছে না। ফাইন রেইন। এরকম বৃষ্টি খুব ভালো লাগে।

'এসো।' আলেফ আমার হাত ধরল, যাতে অন্ধকারে পড়ে না যাই, হোঁচট না খাই।

কত কেয়ারিং ও!

বিল্ডিংটার একতলায় একটা আলো জ্বলছে। একটা হ্যারিকেন। কিছু লোককে দেখা যাচ্ছে। আলেফ সেদিকেই নিয়ে চলল আমাকে। কাছে গিয়ে বুঝলাম তাদের কাউকে কাউকে আমি চিনি। আমাদের বাড়িতে থাকে ওরা। রুদ্রাক্ষের মালা পরা লোকটাও আছে। খালি গা এখন।

ওই তো বাপি! আমার দিকেই তাকিয়ে আছে।

'আয়।'

আলেফ হাতটা ছেড়ে দিল। আমি বাপির কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম।

'দেখ তো মা, একে চিনতে পারিস কিনা!'

তখনই দেখলাম। একটা লোককে একটা পিলারের সঙ্গে বাঁধা হয়েছে। লোকটার কমলা রঙের পোশাক। সেটা ছিঁড়ে যেখানে সেখানে ঝুলে আছে। ব্লাডে ভিজে গেছে শরীরের অনেক জায়গা। মাথাটা বুকের ওপর ঝুঁকে পড়েছে। বিনোদ ঘোষাল লোকটার মাথার লম্বা চুল ধরে মুখটা তুলে আমাকে দেখাল। মুখের অনেক জায়গা থেঁতলে গেছে। নাকটা ভেঙে গেছে। দাড়ি থেকে ব্লাড গড়াচ্ছে। একটা চোখ খুলতে পারছে না। একটা দাঁত আলগা হয়ে মুখের বাইরে বেরিয়ে এসে ঝুলছে।

সেই লোকটা! আমার গায়ে হাত দিয়েছিল! নোংরা মাখিয়ে পালিয়ে গিয়েছিল! এই লোকটার মুখ আমি ভুলব না।

কিন্তু লোকটাকে দেখে আমার রাগ হল না। কেমন যেন গা গুলিয়ে উঠল। আই ফেল্ট লাইক থ্রোইং আপ।

বিনোদ লোকটার গালে একটা চড় কষিয়ে বলল, 'চোখ খুলে তাকা শালা! ভাইঝিকে মুখটা দেখতে দে! তারপর তোর হচ্ছে।'

বাপি কিন্তু শান্তভাবে জিজ্ঞেস করল, 'চিনতে পারছিস?'

আমি বমিটা আটকাতে খুব ট্রাই করছিলাম। কিন্তু মনে হচ্ছিল সেটা বেরিয়েই আসবে। বাপি কি তখন এদের সামনে আনইজি ফিল করবে? দমবন্ধ করে বললাম, 'হ্যাঁ। এই লোকটাই।'

'আচ্ছা। তুই এখন আয়। আলেফ, ওকে বাড়ি পৌঁছে দে।'

জায়গাটা থেকে বেরিয়ে এসে যেন লাইফ ফিরে পেলাম। ফেরার পথেও আলেফ কোনো কথা বলছিল না। ফ্রেশ হাওয়া মুখে লাগছে। সঙ্গে বৃষ্টির ফোঁটাগুলো আমাকে অনেকটা রিলিফ দিচ্ছে। এখন আর গা গুলোচ্ছে না। বাট আমার অসহ্য লাগছিল। লোকটাকে ওরা ধরেছে। প্রচুর মেরেছে, বোঝাই যাচ্ছে। লোকটা কি সেদিনের ইনসিডেন্টটা ডিনাই করছিল? তাই আমাকে ডেকে পাঠাল বাপি? নাকি আমাকে আমার রিভেঞ্জটা নিতে দিল ডেকে পাঠিয়ে? নাকি আমাকে রেডি করছে ফিউচারের জন্য? কী ফিউচার?

কেন জানি না, আমার সব কিছু খুব খারাপ লাগছিল।

'লোকটার সঙ্গে তোমরা কী করবে?'

আলেফ উত্তর দিল না। বাইকের শব্দ পেরিয়ে ওর কানে কি গেল না?

বাট আলেফ তারপরই কাটা কাটা গলায় বলল, 'ওই লোকটা একটা জানবর। হারামজাদাটা তোমার গায়ে হাত দেয়! অ্যাতো হিম্মত!'

জানোয়ার তো অবশ্যই। আমার মনে পড়ল লোকটা কী বিশ্রীভাবে আমার বুকের মধ্যেও হাত ঢুকিয়ে দিয়েছিল। বাট...

'ওকে কি... তোমরা উইল ইউ কিল দ্যাট ম্যান?'

'ও আদমি এখানকার নয়। বিহার থেকে ওকে এনেছে জগন্নাথ গোস্বামী। ওর সঙ্গে আরও কয়েকজন এসেছে। মালটা আজ রেন্ডিপাড়ায় গিয়েছিল। সেখানে বিনোদের লোকেরা ওকে পাকড়েছে। বিহারে একটা বাচ্চা মেয়েকে রেপ করেছে। পুলিশ ধরেছিল। কোর্টে প্রমাণ হয়নি। শালা ঘাগু মাল। আমার তো মেরে দেওয়ার ইচ্ছা। কিন্তু যা হবে, সেটার ফয়সালা আংকল করবেন। আমি বলার কে? আমি হুকুমের বান্দা।'

ঠিকই বলেছে। বাপি থাকতে কেউ কোনোকিছুর ফয়সালা করতেই পারে না। এই তো দেখলাম আলেফ আর বিনোদ আজ একসঙ্গে অপারেট করছে। বাপিই পারে সেটা। বাঘ আর গোরুকে একই ঘাটের জল খাওয়াতে।

আমাকে নামিয়ে দিয়েই আলেফ চলে যাচ্ছিল। আমি ওর হাতটা ধরলাম।

'ওপরে এসো।'

আলেফ আমার মুখের দিকে তাকাল। আমাকে ফিরিয়ে দেওয়ার সাধ্য ওর নেই। তবু দুর্বল গলায় বলল, 'আমাকে এখনই ফিরে যেতে হবে সোনিয়া। ওখানে কী হচ্ছে দেখতে হবে...'

'আয়্যাম সো ওয়েট ডাউন দেয়ার আলেফ! দশ মিনিটের জন্য এসো। তারপর চলে যেয়ো। আটকাব না।'

দশ মিনিটে আলেফ ওর জিভ দিয়ে আমার সব কিছু ভুলিয়ে দিল। সব। সব কিছু। আলেফই পারে আমার শরীরকে ওভাবে নিজের করে নিতে। আমার প্রত্যেকটা অর্গান যেন ওর চেনা, তারা কী চায় ওর জানা। আমার মনে হচ্ছিল আমি কী চাই আমার চেয়েও ভালো করে ও সেটা বোঝে। ইচ্ছে করছিল ওর নীচে আজীবন শুয়ে থাকি, এভাবেই গলে যেতে থাকি, শেষ হয়ে যেতে থাকি। দু-দিকে

আগুন লাগিয়ে দেওয়া একটা মোমবাতির মতো আমার সব কিছু ও চুষে নিক, চেটে নিক, নিংড়ে নিক। নিজের বলে আর কিছু আর আমি রাখতে চাই না।

লোকটা বাঁচবে না মরবে, আমার কী এসে যায়? কী এসে যায় রিভেঞ্জে?

যতক্ষণ আলেফ আমার সঙ্গে আছে, আমি কিছুই জানতে চাই না।

কোনোকিছুরই কোনো মিনিং নেই আমার কাছে।

ভালোবাসার তো নয়ই। ভালোবাসা একেবারেই নয়।

বাট তারপর খারাপ লাগাটা বাড়তে শুরু করল। আমি সেটাকে বুঝতে পারছিলাম না। গা গোলাচ্ছিল। সারারাত ভালো করে ঘুম এলো না। ছেঁড়া ছেঁড়া যে স্বপ্নগুলো দেখলাম, আলেফকে দেখছিলাম, ওর সারা গায়ে ব্লাড, মুখে ব্লাড, হাতে ব্লাড... যে হাত দিয়ে আমাকে আদর করে... নিজের বাচ্চাকে খেয়ে নেওয়া বিড়ালের মতো লাগছিল ওকে! মনে হচ্ছিল ও আমার সামনে থেকে সরে যাক! আমার গায়েও ব্লাড লেগে যাবে! এখুনি সরে যাক! ওকে সহ্য করতে পারছিলাম না।

সকালে বিছানায় শুয়ে শুয়ে তবু আলেফকেই ভাবছিলাম। বিছানার চাদরে ওর একটু সিমেন লেগে আছে। আজ দাগটা ভালো লাগছিল না। ওর কথা ভাবতে ভালো লাগছিল না। ওর হাতে নিজের শরীরটা ছেড়ে দেওয়ার কথা জাস্ট আর ভাবতে পারছিলাম না।

এতদিন যে ওর কথা ভাবতে ভালো লাগত! সেটা কী?

বাই এনি চান্স আমি কি আলেফের প্রেমে পড়েছিলাম নাকি? জানতেও পারিনি!

ব্যাপারটা চলে যাওয়ার পর সেটা জানতে পারছি!

বাট, এভাবে প্রেম চলে যেতে পারে!

ও একজনকে মেরেছে বলে? সেটা কেন হবে! বাপিও তো অনেক লোককে মেরেছে! বাপিকে তো আমি ভালোবাসি!

রাজকুমার চৌধুরি

৯

কলকাতায় শরৎ যখন আসে, এমনিতে তো বোঝা যায় না, কলকাতার ঋতু পরিবর্তনগুলো অন্যরকম, সুবিধা আর অসুবিধার তারতম্য দিয়ে তাদের বুঝতে হয়, কিন্তু তাহলেও কলকাতার আকাশের দিকে তাকালে বোঝা যায় রংটা বদলে গেছে,

মেঘগুলো বদলে গেছে। সেটারই মূল্য সেখানে অনেক। যেমন একজন অসুস্থ মানুষ বাইরের আলোবাতাসের দিকে সতৃষ্ণ চোখে তাকিয়ে থাকেন। রূপনগরে তো স্পষ্ট বোঝা যায় শরৎ এসে গেছে। পাহাড়টার মাথায় মেঘ দেখলেই বোঝা যায়। রাস্তার ধারে কোথাও গজিয়ে ওঠা কাশফুল দেখলে বোঝা যায়। হাওয়ার মধ্যে বর্ষার ভাবটা এখনও থেকেই গেছে, কিন্তু তার সঙ্গে একটা লুকোনো হিমেলভাব এসে পড়েছে। এই হল শরৎ! কত শান্ত! একটু উষ্ণ... কিন্তু কী উজ্জ্বল! বর্ষার শেষ ফোঁটাগুলো কখন যেন ঝরে গেছে, তবু এখনও মাঝেমধ্যেই জল নামছে উন্মুখ আকাশ থেকে।

বিবেকানন্দকাকুদের বাড়ির কাছেই একটা মোরাম রাস্তা সোজা চলে গেছে পাহাড়ের দিকে। আমি সেটায় রোজ হাঁটতে যাই। ভোরের আলো ফোটার আগে বেরিয়ে পড়ি। সকাল প্রসারিত হলে ফিরি। পাহাড় অবধি আমার আজও যাওয়া হয়নি। কিন্তু এই রাস্তাটার দু-দিকে অনেক পাথর দেখা যায়। মস্ত মস্ত পাথর। গতরাতে জল হয়েছিল। চূর্ণ রক্তের মতো রং মোরামের। পা ফেললেই কাঁকড়ের শব্দ কড়মড় করছে। পাথরগুলো ভিজে চকচকে কালো হয়ে আছে। সেগুলোকে ঘিরে বেড়ে উঠেছে বর্ষার নাম না জানা কত গাছ আর আগাছা! কী সবুজ সেগুলো! কী প্রাণবন্ত! জীবন যেন লাফিয়ে উঠছে সেগুলোর মধ্য থেকে! দেখলে বুকের মধ্যে কেমন করে! একটা পাহাড়ি শহরে এই যে দিনগুলো কাটাচ্ছি, কেমন যেন স্বপ্নের মতো লাগে। বিশ্বাসই হয় না এই দিনগুলো আমার জীবনে এসেছে। আমি হাঁটছি, আমার দিকে চেয়ে আছে গাছে গাছে সবুজ একটা পাহাড়... সত্যিই ভাবা যায় না।

আজ অবধি আমার পাহাড়টায় যাওয়া হল না। বিবেকানন্দকাকু তো সবসময়ই ব্যস্ত! এখন আমার সঙ্গে কথা বলারই সময় পান না। সোনিয়ার পাহাড় নিয়ে কোনো আগ্রহই নেই। সেটা স্বাভাবিক। ছেলেবেলা থেকে নিশ্চয়ই অজস্রবার ও গেছে ওখানে। আমি তাহলে কার সঙ্গে যাব! আলেফ বলেছিল আমাকে পাহাড়ে নিয়ে যাবে। আজও নিয়ে গেল না। আলেফ আমাকে ভালোবাসে না। আমি জানি। কিন্তু আমি ওকে ভালোবাসি। কাউকে ভালোবাসার জন্য কি তাকেও আমাকে ভালোবাসতে হয়! এমন তো নয়। আমরা সবাই নক্ষত্রের গুঁড়ো দিয়ে তৈরি। স্টারডাস্ট। আমাদের এই শরীর তৈরি হয়েছে কোটি কোটি বছর আগেকার বিস্ফোরিত নক্ষত্রদের গুঁড়োয়। অজস্র নক্ষত্রের মরণ আর্তনাদ আমাদের ক্ষুদ্র জীবনে

মিশে আছে। আমাদের শরীরের হাইড্রোজেন আর লিথিয়ামের কিছু অংশ তো বিগ ব্যাং-এর সঙ্গে উৎপন্ন হয়েছিল। আমরা এক-একটা মহাবিশ্ব। আবার আমরা একজন আরেকজনের চেয়ে আলাদা নই। তা ছাড়া আমরা সবাই খুব অল্প কিছু লোকের বংশধর। কত অল্প? ১৫০ থেকে ১০০০-এর মধ্যে। তারপর আমরা ছড়িয়ে পড়েছিলাম। আজ থেকে মোটামুটি ৫০০০০ বছর আগে। আমরা আক্ষরিক অর্থেই সবাই ভাই-বোন। মাইটোকন্ড্রিয়ার হ্যাপলোগ্রুপ দিয়ে মানুষের সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ার পথটাও খুঁজে পাওয়া যায়। অথবা আমরা একইসঙ্গে কণা ও তরঙ্গ হয়ে বেঁচে আছি। আমাদের বেঁচে থাকাটা কেবলমাত্র তরঙ্গ, কেবলমাত্র কম্পন। কিংবা হতে পারে আমার এসব চিন্তা ভুল। আমার জানার ওপর আমার নিয়ন্ত্রণ নেই।

কিন্তু ভালোবাসা তো ভুল নয়! ভালোবাসার জন্য কোনো যুক্তি লাগে না।

একদিন একাই পাহাড়টায় যাব। কিংবা সুদীপার সঙ্গে যাব। ও তো প্রায়ই আমাকে নিয়ে যেতে চায়। ওর সঙ্গে গেলে অনেক কথাও বলা যাবে। ও আমার সঙ্গে একা কথা বলার অনেক চেষ্টা করে। কিন্তু সুযোগ হয় না আমাদের। কথা শোনার লোক পেলে আমার খুব আনন্দ হয়। একসময় পাহাড়টায় হাতি, ভাল্লুক, চিতাবাঘ থাকত। এখন শুধু মাঝেমধ্যে নাকি কদাচিৎ হাতি দেখা যায়। আমরা দুজন গেলে বিপদের কিছু নেই। ওকে অনেক কথা বলব, যা পার্কে বসে বলা যায় না। এত কথা তৈরি হয় রোজ আমার মধ্যে!

যে উপন্যাসিকাটা লিখছি, হয়তো সেটা কিছুই হচ্ছে না, কিন্তু সেটার মধ্যে আমার কথাগুলো ইঙ্গিতে লিখে রাখছি। তারপরেও অনেককিছু বলতে বাকি রয়ে যায়। বলার চেয়ে না-বলা অনেক ভারী হয়ে ওঠে বুকের মধ্যে। পরে সেগুলোর আর নাগাল পাই না। নিজেই মনে করতে পারি না কী ভাবছিলাম। ফলে উপন্যাসিকাটাও কিম্ভুতকিমাকার হয়ে উঠছে। লিখতে চাইছি একরকম, হয়ে উঠছে আরেকরকম। মনে হচ্ছে যেন উপন্যাসিকাটাই আমাকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। মাঝেমাঝে নিজের লেখাকে খুব হিংস্র লাগে। কামুক লাগে। আমার নিজের ভাষা, নিজের চিন্তা, কোনোকিছুই চিনতে পারছি না সেটার মধ্যে। ওটাকে নিজের লেখা বলে শনাক্ত করতেই পারি না। নিজেকে ফ্রাংকেনস্টাইন মনে হয়, আর ওই

উপন্যাসিকাটা যেন সেই মৃত্যু থেকে জেগে ওঠা দানব। ওটার নিজের জীবন আছে, সেই জীবনটা আমার সঙ্গে জড়িয়ে আছে, তবু আমার চেয়ে আলাদা। অথচ লেখাটার একটা শব্দও হয়তো মিথ্যে নয়। যা লিখছি সবই আমার ভিতর থেকে উঠে আসা শব্দ। কিন্তু, যা মানুষের ভিতর থেকে উঠে আসে, তা কি সবসময় সত্য? ভিতরটা তো বদলেও যায়!

লেখক আমি হতে চাই না। আজ বাঙালি সমাজে লেখক পরিচয়টার আর কোনো মহিমা নেই। লেখকরা এখন সরকারের চাকর, নাহলে তাদের জীবনে উন্নতি হয় না। নাহলে লেখকরা কমিউনিস্ট, কিন্তু তারা সোশ্যাল মিডিয়ায় একটা ভুল স্বর্গ বানিয়ে বসে আছে। কী হবে লেখকের সংখ্যা আরেকটা বাড়িয়ে? লেখাটা কোনোদিন ছাপা হবে, এমন কোনো ভাবনাও আমার নেই। ছাপতে দিতেই চাই না। তবু লিখে যাচ্ছি। প্রতিদিনই লিখি। কেউ আজ অবধি পড়ে দ্যাখেনি। সোনিয়া মনে হয় সন্দেহ করে আমি কিছু একটা লেখার চেষ্টা করছি। কিন্তু মুখে কিছু বলে না। ও যদি কোনোদিন পড়তে চায়, হয়তো পড়াব। ও লেখা সবাইকে পড়ানোর নয়। কিন্তু সোনিয়াকে কেন পড়াব, জানি না। ও পড়তে চাইলে না বলতে পারব না বলেই হয়তো।

মা চাইছে পুজোটা কলকাতায় কাটাই। আমার ইচ্ছে করছে না। বাড়িতে গেলেই তো বাবা হয়তো খুবই রেগে যাবে। বাবা চাইছে আমি এখানেই থাকি। আমারও এখানে থাকতেই ভালো লাগছে। এখানে কারও আমাকে নিয়ে কোনো প্রত্যাশা নেই। কলকাতায় আমার নিজের বাড়িটা আমার স্বপ্নের মতো নয়। যদি কয়লার উনুনের ধোঁয়ায় কালো হয়ে যাওয়া একটা রান্নাঘরের একটা লোহার শিকবসানো ছোটো জানালা দিয়ে কাশবন ছাড়িয়ে দূরে ট্রেনের যাতায়াত দেখতে পেতাম! সেই খোলা জানালাটা দিয়ে তাকিয়ে থাকত আমার আটপৌরে মা আমার ছাপোষা বাবার বাড়ি ফেরার দিকে! যদি আজ থেকে এক শতাব্দী আগে জন্মাতাম, হয়তো এমন দৃশ্য আমার জীবনে থাকত। আমার মা আটপৌরে নয়। আমার বাবা ছাপোষা নয়। কিন্তু আমার সঙ্গে তাদের মানায়ই না। সোনিয়া প্রায়ই ক্লাসের কথা বলে। আমি জানি না আমার ক্লাস কী। একজনের একটা নির্দিষ্ট ক্লাস থাকা কি সম্ভব বাঙালি জীবনে? বিশেষ করে সে লোকটা যদি চিন্তাশীল হয়?

রূপনগরে আমি আমার মতো থাকি। পড়ি। লেখালেখি করি। একটা ডায়েরি ফুরিয়ে গিয়ে আরেকটা ডায়েরিতে এখন উপন্যাসিকাটা চলছে। কিছু হচ্ছে না জানি। কিন্তু লিখছি— এই চিন্তাটাই আনন্দ দেয়। চিন্তা করি। ভাবার অনেক সময় পাই এখানে। ভাবাও তো একটা কাজ! বিকেলে বৃষ্টি না হলে সুদীপা আর তার বন্ধুদের সঙ্গে চিত্তরঞ্জন পার্কে সময়টা চমৎকার কাটে। প্রথমে ওরা মজা দেখার জন্য আমার কাছে আসত। এখন হয়তো আমাকে ভালোবেসে ফেলেছে। আমার কথাগুলো এখন ওরা মন দিয়ে শোনে। কলকাতায় নিজের কথা শোনানোর লোকই পেতাম না।

আজ দিনটা কী সুন্দর! রাতে বৃষ্টি হলে পরেরদিন সকালটা যেমন সুন্দর হয়। ঝকঝকে তকতকে হয়। যেন গরিব লোকের বাড়ির আঙিনা নিকিয়ে পবিত্র করা হয়েছে। কিংবা প্রাচীন কোনো সমাধিক্ষেত্র থেকে উঠে আসা ফুলের গন্ধের মতো পবিত্র। এমন একটা সকালের জন্য জীবনের অনেক কষ্ট জগতের অনেক ব্যথা নিজেকে দেওয়া যায়। জীবনের নিবিড় প্রবাহের মধ্যে এমন কিছু আনন্দের চুমুক, আহা, একেই হয়তো বলে অনির্বচনীয়।

আজ থেকে লক্ষ বছর আগেও এই পাথরগুলো এখানেই ছিল। কেমন ছিল তখন সময়টা? কেমন সব জীব চরে বেড়াত এখানে? কেমন উদ্ভিদ হত? শরতের আকাশ বলে কি কিছু ছিল তখন? ৩৯০০০ বছর আগে শেষ তুষারযুগের ফসিল হিসেবে খুঁজে পাওয়া গিয়েছিল সাইবেরিয়ান ম্যামথকে। সেই অতিকায় ম্যামথের পেটের ভিতরে পাওয়া গিয়েছিল হজম না হওয়া ঘাস। তুষারযুগ কি এত দ্রুত এসেছিল যে ঘাস হজম করার সময়ও পায়নি সেই ম্যামথ? একদিন কি ঘুম থেকে উঠে দেখব দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে আছে বিপুল হিমবাহ? কিংবা সমুদ্রতলের উচ্চতা যেভাবে বাড়ছে, ১৯৯২ থেকে আন্টার্কটিকায় ৩ ট্রিলিয়ন টন বরফ গলে গেছে, হয়তো একদিন ঘরের মধ্যে আচমকা ঢুকে আসবে মহাসমুদ্র। আমরা কি হিমযুগে পৌঁছে মরব, নাকি উষ্ণায়নের ফলে জলে ডুবে? দ্বারকার মানুষরা কেমনভাবে মরেছিল? শ্রীকৃষ্ণ নিজের চোখে দেখেছিলেন সেই দৃশ্য! কেমনভাবে মরেছিল পম্পেঈয়ের মানুষগুলো? আজও তাদের প্রস্তরীভূত শরীরগুলোকে দেখতে পর্যটকরা যায়। রোদ থাক না থাক, যারা রবীন্দ্র সরোবরে রঙিন ছাতা খুলে বসে থাকে, তারা দ্বারকা বা

পম্পেঈ শহর কীভাবে ধ্বংস হয়েছিল সে নিয়ে ভাবে না। তারা কত ভালো আছে! মাথায় আজগুবি চিন্তা নিয়ে তাদের ঘুরতে হয় না।

দাঁড়িয়ে পড়েছিলাম নিজেরই অজান্তে। ভাবছিলাম। মাথায় ভাবনা এলে আমি হাঁটতে পারি না। একটা লুপের মধ্যে আটকে যাই। চিন্তার পিছনে চিন্তা আসে। একের পর এক। বেরোতে ইচ্ছে করে না। তখন দেখলাম জ্যোতির্ময়বাবুকে। জ্যোতির্ময় বারিক। শীর্ণ দেহ। সারা মাথায় রুপোর মতো চুল। একটা বাসন্তী রঙের পাঞ্জাবি পরে আছেন। উনি সকালে হেঁটে ফিরছেন। আমাকে দেখে দাঁড়িয়ে গেলেন। সত্তরের ওপর ওঁর বয়স হবে। রোজ সকালে হাঁটেন এই রাস্তাটা ধরেই। ছোটো ছোটো পা ফেলেন। কিন্তু অনেক দূর অবধি যান। আমি অতটা হাঁটতে পারি না। ওঁর ফেরার পথে আমার সঙ্গে প্রায়ই দেখা হয়। রূপনগর কলেজে দর্শনের অধ্যাপক ছিলেন। বামপন্থী ছিলেন। এখন প্রায় দশ বছর হয়ে গেল কোনোরকম সক্রিয় রাজনীতিতে থাকেন না। সুদীপা আর ওর বন্ধুদের মুখে যতদূর জেনেছি এ শহরের বামপন্থী সংগঠন সরকার বদলের পরেই ভেঙে গিয়েছিল। বেশিরভাগ কর্মী সরকারি দলে যোগ দিয়েছিল। তারপর বাকিদের অনেকে হিন্দুত্ববাদীদের সঙ্গে ভিড়েছে, তারা ভাবছে হিন্দুত্ববাদীরা রাজ্যে ক্ষমতায় এলে তাদের পরে বামপন্থীদের একটা সুযোগ আসবে। এখন কমিউনিস্টদের সংখ্যা এ শহরে আঙুলে গোনা যাবে। উনি পালানোর মানুষ নন। লজ্জায় আর ঘেন্নায় সরে এসেছেন। ওঁর অগাধ পাণ্ডিত্য। আমি তো মূর্খ। কিন্তু আমার সঙ্গে আলাপ জমাতে ওঁর কোনো সমস্যা হয়নি।

আমাকে দেখে হাসলেন, 'সকালে আপনার মুখটা দেখলে মনে হয় সারাদিন ভালো যাবে।'

আমিও হাসলাম, 'প্রায় প্রতিদিনই তো দ্যাখেন স্যার!'

উনি আমার মাথায় হাত রেখে বললেন, 'দেখেও তো তৃষ্ণা মেটে না! এই সময়টায় আপনি কোথা থেকে এলেন বলুন তো? এ তো আপনার সময় নয়!'

উনি ঠিক বলেছেন। উনি বুঝতে পেরেছেন আমাকে। তাই হেসেই জিজ্ঞেস করলাম, 'তাহলে কোনটা আমার সময়?'

'আপনার উচিত ছিল বুদ্ধদেবের সময়ে জন্মানো। উনি হয়তো আপনাকে খুব কাছে টেনে নিতেন। কিংবা শ্রীচৈতন্যের একজন পারিষদ হয়ে জন্মালেও আপনার

চলত। হয়তো-বা আজাদ হিন্দ ফৌজে সুভাষের পাশে থাকতে পারতেন। হয়তো অনুশীলন সমিতিতেও আপনার একটা জায়গা হতে পারত। আপনি ভুল সময়ে এসে পড়েছেন। এখন পশ্চিমবঙ্গের বাঙালির মধ্যে কোনো বিপ্লবী নেই। হুজুগের বাইরে কোনো বিপ্লব নেই। আপনার সুকুমার মন আর উন্মুখ জীবন অপচয়েই নষ্ট হয়ে যাবে রাজকুমার, এ আমি বলে দিচ্ছি আপনাকে। নিজেকে বাঁচিয়ে রাখুন। আপনার চোখ দেখলে মনে হয় আপনি পাখির মতো উড়ে যেতে পারলে বাঁচেন। পালাবেন না যেন সেভাবে! কিপ ইট আপ! বি ব্রেভ!'

আমি বলার লোভ সামলাতে পারলাম না, 'স্যার, আমার তো মনে হয় একটা সময়ের সঙ্গে আরেকটা সময়ের সেদিক থেকে কোনো পার্থক্য নেই। কারণ যে-কোনো সময়েই কিছু মানুষ আলোর দিকে যেতে চায়। তারা অন্ধকারে মুখ গুঁজে মরতে চায় না। যখন একজন মহামানব মানুষের মধ্যে থাকেন, তাঁর দেখানো পথে চললেই মানুষের হয়ে যায়। তাকে নিজের পথ খোঁজার ভার আর অতটা নিতে হয় না। কিন্তু যখন সমাজে কোনো মনীষী নেই, তখন মানুষকে নিজেরই মনীষার ওপর নির্ভর করতে হয়। সাধারণ মানুষকেও তখন নিজের সীমার মধ্যে অসাধারণ হয়ে উঠতে হয়। সেটা তার পক্ষে কি ভালো না খারাপ? যদি বিবেকানন্দ রামকৃষ্ণকে না পেতেন, তাঁর কী হত বলে আপনার মনে হয়? যদি আনন্দ বুদ্ধদেবকে না পেতেন, আনন্দের কী হত?'

উনি খুব উদ্ভাসিত মুখ নিয়ে আমার দিকে তাকালেন। মুখ থেকে ভালোবাসা উপচে পড়ছে। এই মানুষ যে আমাকে ভালোবাসেন, তা তাঁকে মুখ ফুটে বলতে হবে না। তাঁকে দেখলেই জানা হয়ে যায়। আমারই মতো এই মানুষটা ভালোবাসতে পারেন। ভালোবাসার কোনো বাঁধ নেই ওঁর। কী সৌভাগ্য আমার! এমন সুন্দর একটা সকালে, শরতের এই শান্ত শীতল আলোর মধ্যে আমি ওঁর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছি!

বললেন, 'বুদ্ধদেব আনন্দকে তাঁর শেষ কথা কী বলেছিলেন, আপনার মনে আছে রাজকুমার?'

'না। মনে পড়ছে না।'

সত্যিই আমার স্মৃতিশক্তি খুব দুর্বল। আমি পড়ি অনেক। কিন্তু সেগুলো স্পষ্ট স্মৃতি হয়ে মাথায় থাকে না। কেমন যেন একসঙ্গে মিলে মিশে একটা উজ্জ্বল কুয়াশার পিণ্ড হয়ে মাথার মধ্যে থাকে। আমি সেখান থেকে যখন কিছু উদ্ধার করার চেষ্টা করি, অন্য অনেকের কথা আমার নিজের কথা হয়ে যায়। কোনোকিছুকে অবিকল উদ্ধৃত করার শক্তিটাই আমার নেই।

জ্যোতির্ময় বললেন, 'বুদ্ধ আনন্দকে বলেছিলেন, 'এটা হতে পারে আনন্দ, তোমাদের কারও কারও মধ্যে এই চিন্তা হয়তো এলো যে, গুরুদেবের কথা শেষ হয়েছে, গুরুদেব আর আমাদের মধ্যে নেই। কিন্তু আনন্দ এমন চিন্তা উচিত হবে না। কারণ যেটাকে আমি ধর্ম এবং শৃঙ্খলা রূপে ঘোষণা করেছি এবং পরিচিতি দিয়েছি, যখন আমি তোমাদের মধ্যে থাকব না, সেটাই তোমাদের গুরু হবে।' আনন্দ ছিলেন বুদ্ধদেবের একদম উলটো একজন মানুষ। আনন্দ বোধি পাননি। মরজগতের সঙ্গেই তিনি সংশ্লিষ্ট ছিলেন। অথচ তিনি বুদ্ধের কৃপা পেয়েছিলেন। এ থেকে আমার মনে হয় রাজকুমার, মনীষী না থাকলেও মনীষীর বাণী রয়েই যায়। সেটাই পথ দেখায়। আর বাণী নিজেও কিন্তু তার মনীষীর সন্ধানে থাকে। রামকৃষ্ণ যদি নাও থাকতেন, বিবেকানন্দ অবশ্যই মহৎ হতেন। তাঁর অনেক সমালোচনার সুযোগ আছে। হয়তো তাঁর কিছু নিন্দাও আমরা করতে পারি। কিন্তু তাঁর বিরাটত্ব তাতে ক্ষুণ্ণ হয় না।'

'স্যার, বিরাটের স্বভাবই তো সমালোচনার সুযোগ তৈরি করা!'

'একদমই তাই। যখন পার্টি করতাম, অনেকেই অবাক হতেন বিবেকানন্দের প্রতি আমার আগ্রহ দেখে। আমি যে আস্তিক, এ নিয়েও কারও কারও খুব অস্বস্তি ছিল। এ দেশটা যে রাশিয়া নয়, চিন নয়, এ দেশে লাল পতাকা বরফের বুকে নয়, সবুজ ধানখেতের উপর উড়বে, এটাই অনেকে বুঝল না। ধর্ম আর রাজনৈতিক মতাদর্শ এ দেশে সমান মৌলবাদের জন্ম দেয়। আপনি তো সোশ্যাল মিডিয়ায় নেই। আমি এ বয়সেও আছি। সেখানে দেখতে পাই নতুন প্রজন্মের কমিউনিস্টদের মধ্যে তো হিন্দুত্ববাদীদের মতোই অন্ধত্ব! তারা কোনো ভিন্নমত সহ্য করতে পারে না, কারও সঙ্গে মতের মিল না হলেই জঘন্যভাবে দলবদ্ধ আক্রমণ করে। অথচ বলে হিন্দুত্ববাদ বাকস্বাধীনতা কেড়ে নিচ্ছে। কী বিশ্রী আচরণ তাদের! কী বিকৃত

রসবোধ! অশিক্ষিত প্রান্তিক মানুষদের প্রতি কী উন্নাসিকতা! মানুষ যে তাদের প্রত্যাখ্যান করেছে, এ নিয়ে তাদের কোনো গ্লানিই নেই! সোশ্যাল মিডিয়ায় একটা পোস্টে হয়তো একজন লিখছে— সাম্যবাদ ফিরে আসবেই। কিন্তু তার পরেই হয়তো কারও পোস্টের তলায় সে উল্লসিত কমেন্ট করছে— আরে এমন ফিশ স্টেকের স্বাদ তোর মতো চাষা বুঝবে না। আমাদের যৌবনে এ জিনিস আমরা ভাবতে পারতাম না। আমরা এক অন্যরকম স্বপ্ন নিয়ে সমাজতন্ত্রের পতাকা হাতে তুলে নিয়েছিলাম। এদের মনে হয় কোনো স্বপ্নই নেই, শুধু চায় আরেকবার কমিউনিস্টরা পশ্চিমবঙ্গের শাসন ফিরে পাক। আসলে মানুষের খণ্ডিত দৃষ্টির কোনো প্রতিবিধান নেই, তাই না?'

'মানুষ সব কিছু দেখতে পায় না বলেই হয়তো সে মানুষ হতে পেরেছে! পরের সেকেন্ডে কী তার জন্য অপেক্ষা করে আছে কেউ জানে না। অথচ নিৎসে বলেছিলেন মানুষের ভবিষ্যৎ তার বর্তমানকে ততটাই প্রভাবিত করে যতটা তার অতীত।'

জ্যোতির্ময় বারিক আমার মুখের দিকে চিন্তিতভাবে চেয়ে রইলেন। বললেন, 'আপনি আমাকে এভাবেই অবাক করে দেন রাজকুমার। এসব কথা আপনি বলেন কী করে? কেমন যেন কেঁপে উঠতে হয় মাঝেমধ্যে আপনার কথা শুনে! ইচ্ছে হয় আলিঙ্গন করি। আমার মনে হয়, রাজকুমার, আপনি কবি। নিশ্চয়ই আপনার কবিতা আপনি লুকিয়ে রেখেছেন? পড়াবেন না আমাকে?'

আমি খুব লজ্জা পেলাম। আমার শ্রদ্ধেয় এই মানুষ। উনি ভাবছেন ওঁকে লুকিয়ে আমি কিছু করি। অথচ, যদি লেখালেখি করি, ওঁর চেয়ে ভালো পাঠক আমি কোথায় পাব? খুব লোভ হল নিজের উপন্যাসটার কথা ওঁকে জানিয়ে দিই। কিন্তু সাহস পেলাম না। জীবনে কোনোকিছুই করে উঠতে পারিনি। এই লেখাটাও খুব অদ্ভুতভাবে এগোচ্ছে। হয়তো শেষ হবে না। হয়তো কেন, এমনই লেখাটা, এ লেখা শেষ হওয়ার কথা নয়। ওঁকে জানিয়ে কী হবে! কিংবা লেখাটা হয়তো শেষের মুখেই এসে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু কিছু হয়েছে কি?

স্টারডাস্ট। হয়তো আমার আর ওঁর অন্তঃকরণ একই নক্ষত্রের জিজীবিষা থেকে তৈরি হয়েছে।

'আপনার কী মনে হয় স্যার, যদি আমাদের সময়ে একজন বুদ্ধ থাকতেন, জাতপাত নিয়ে এই বজ্জাতি চলছে ভারতে, তা দেখে তাঁর কী মনে হত?'

জ্যোতির্ময়বাবু আমার দিকে তাকালেন। বললেন, 'এটা হয়তো আপনি ঘেঁটে দেখেননি। শিলচরে আমার এক বন্ধু আছেন। তাঁর নাম অর্জুনদেব সেনশর্মা। উনি আমাকে বলেছিলেন বুদ্ধদেব জাতপাত ভালোই মানতেন। অম্বট্‌ঠ সূত্ত, সোণদণ্ড সূত্তে তিনি স্পষ্ট ক্ষত্রিয়পন্থী। তিনি এক্ষেত্রে রাজর্ষি বিশ্বামিত্র, রাজা জনকের উত্তরাধিকারী। সাধনসূত্রে বুদ্ধ শুক্ল যজুর্বেদের মাধ্যন্দিন শাখার বীজ বহন করেছেন, যা যজ্ঞের চেয়ে যোগকে গুরুত্ব দেয়। যোগে লিঙ্গদেহ পরিবর্তন সীমিত ক্ষেত্রে স্বীকার করা হয়। তাই বুদ্ধ স্ত্রী ও শূদ্রদের সাধনাধিকার স্বীকার করেছিলেন। কিন্তু বিবাহে ও পঙক্তিভোজনে সামাজিক বর্ণভেদকেই মান্যতা দিয়ে গেছেন। তবে সন্ন্যাসী হলে তা আর প্রযোজ্য হবে না। চৈতন্য বা শ্রীরামকৃষ্ণও যে বর্ণভেদ মানতেন না, এটা ঠিক নয়। ইতিহাস বড়ো নিষ্ঠুর জিনিস রাজকুমার! বিশেষ করে ভারতবর্ষের ইতিহাস এক দু-মুখো তরবারি।'

মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল। বুদ্ধ সম্পর্কে আমার ধারণায় কী নির্মম আঘাত করলেন জ্যোতির্ময়বাবু! এমন আঘাত হয়তো বাঙালি কমিউনিস্টরা করতেই পারে। ভেবে দ্যাখে না সামনের মানুষটা কতটা রক্তাক্ত হল।

বড়ো রাস্তা অবধি একসঙ্গে হেঁটে এসে আমরা আলাদা হই। উনি আমাকে ওঁর বাড়িতে যেতে অনেকবার বলেছেন। যাব ঠিক করেছি। আমি ওঁকে আসতে বলিনি। আমার মনে হয়, উনি বিবেকানন্দকাকুকে ভালোবাসেন না। কারণটা বলেননি। আমার মনে হয় রাজনীতি করতে গিয়ে কখনও ওঁদের মধ্যে কোনো তিক্ততা তৈরি হয়ে থাকবে। সেটা নিয়ে আমি কিছু জিজ্ঞেস করিনি। যদিও জানি জিজ্ঞেস করলে স্পষ্ট উত্তর পাব।

বড়ো রাস্তায় এরমধ্যেই অনেক ট্র্যাফিক। ছোটো শহর হলেও রূপনগরে যানবাহন প্রচুর। অনেক লরি এই শহরের ওপর দিয়ে যাতায়াত করে। আমি দেখেছি অন্ধ্রপ্রদেশ উত্তরপ্রদেশ নাগাল্যান্ডের লরি বেশি যায় রূপনগর দিয়ে। গাড়ির নাম্বারপ্লেট থেকে রাজ্যের নামগুলো পড়তে আমার বেশ মজা লাগে। কত দূর থেকে লরিগুলো আসছে! কী দক্ষ সব ড্রাইভার তাদের! রাস্তার দু-দিকে চওড়া ফুটপাত।

কিন্তু ফুটপাতগুলো সব অস্থায়ী দোকানের দখলে। কোনোরকমে হাঁটা যায় সেগুলো এড়িয়ে। ফুটপাতগুলো টাকার বিনিময়ে ছেড়ে দিয়েছে সরকারি দল। সুদীপা বলছিল। কমিউনিস্টরা এ নিয়ে কাকুর বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখিয়েছিল। লাভ হয়নি।

মোড়ের সামনে দেখলাম খুব ভিড় জমেছে।

কী হল আবার! ভোরে যখন বেরিয়েছিলাম, কিছু তো হয়নি! কোনো দুর্ঘটনা হল কি? এটা ভাবতেই সুন্দর সকালটা আমার কাছে ম্লান হয়ে গেল। মানুষের দুর্ভাগ্য, মানুষের আঘাত, না চাইতেই কেন আমার চোখের সামনে এসে পড়ে! রাজকুমার সিদ্ধার্থের মতো এসব দৃশ্য আমাকে কোথায় নিয়ে যেতে চায়? কেন দেখানো হয়, কেন দেখতেই হয় আমাকে এসব!

ভিড় ঠেলে এগোলাম।

একজন মানুষ ফুটপাতের একফালি জায়গায় অদ্ভুতভাবে শুয়ে আছে। হাত-পা-গুলো এলোমেলো। সমস্ত শরীর যেন শক্ত হয়ে আছে। ময়লা ছেঁড়া পোশাক। যেখানে সেখানে প্রচুর রক্তের দাগ কালো হয়ে আছে। শরীরের যে জায়গাগুলো দেখা যাচ্ছে, আঘাতের স্পষ্ট সব চিহ্ন। প্রচুর অত্যাচার করা হয়েছে লোকটার ওপর।

আমি মানুষটার মুখ দেখার চেষ্টা করলাম।

মানুষটাকে তো খুব চেনা লাগছে! মুখে দাড়ি। একটা পুরোনো বড়ো কাটাদাগ। এমনই দাড়ি কোথায় যেন... কোথায় যেন...

হ্যাঁ হ্যাঁ... এ-ই তো সেদিন সোনিয়াকে ময়লা মাখিয়ে পালিয়ে গিয়েছিল!

লোকজন বলাবলি করছে একটু আগে একটা নম্বর প্লেটহীন ভ্যান এসে দাঁড়ায়, আর মুহূর্তের মধ্যে একে ফুটপাতে ফেলে দিয়ে পালিয়ে যায়। কেউ কিছু বুঝে ওঠার আগে।

কিন্তু ওর কী হয়েছে! নড়াচড়া করছে না কেন! রক্তমাখা হলদে চোখ দুটো সোজা তাকিয়ে আছে সামনের দিকে। অপলক। বিকট একটা চাউনি দু-চোখে। যেন সামনের কিছু দৃষ্টির মধ্যে নেই ওর!

ভালো করে দেখার চেষ্টা করলাম।

লোকটার রক্তে বিলিরুবিন বেড়ে গিয়েছিল।

তখনই দেখলাম লোকটার গলায় আড়াআড়ি একটা দগদগে গভীর ক্ষতচিহ্ন। সেটা শুকিয়ে কালো হয়ে আছে। কেউ খুব যত্ন করে ওর গলার নলিটা কেটে দিয়েছে। লোকটা বেঁচে নেই। ওটা একটা মৃতদেহ।

আমি ভিড় থেকে ছিটকে বেরিয়ে এসে ফুটপাতের ওপরেই বমি করলাম।

কিপ ইট আপ!

বি ব্রেভ!

১০

হ্যাঁ, ব্রেভ! ব্রেভ তো অবশ্যই! মৃতদেহটা দেখার সঙ্গে সঙ্গে আমার বমিটা হল। আর আমার ভিতরের পিশাচটা হুড়মুড়িয়ে বেরিয়ে এল। একজন মানুষ নিজেকে যত বেশি শ্রদ্ধা করে, নিজেরই মনের মধ্যে ওঁত পেতে থাকা উলঙ্গ পিশাচটাকে সে তত বেশি ভয় করে। আমিও ভয় করি। কিন্তু সেটার সঙ্গে আমার যে সংলাপ, তা তো বেরিয়েই আসে! আয়নার ওপর কিলবিল করে। রাস্তায় সঙ্গে সঙ্গে হাঁটতে থাকা ছায়াটার মধ্যে নড়াচড়া করে। কিন্তু আমি নিজেকে মানুষ হিসেবে শ্রদ্ধা করতে পারি না। করতে চাইও না। আমি তো অপদার্থ একটা ছেলে! একটা পরজীবী। উকুন। জীবনে কোনোদিন কিছু করে উঠতেই পারব না। আজকের দিনে একটা ফোন সামলাতে পারি না। অথচ বড়ো বড়ো কথা বলতে পারি। অনর্গল কথা। সেসব কথার কোনো দাম নেই। কিন্তু বিপদ আছে। বাবা তাই আমাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে।

কথা বলে আজকের পৃথিবীতে কী হয়? কথা বলার দিন কি আজ ফুরিয়ে যায়নি?

হঠাৎ যেন পড়ে থাকা মড়াটাকে ছাপিয়ে সোনিয়ার মুখ আমার সামনে ভেসে উঠল। ভিড়ের মধ্যেকার কথাগুলোও আর শুনতে পাচ্ছিলাম না। কেবল সোনিয়া। শুধুমাত্র সোনিয়া।

সোনিয়া একা একা থাকত। আমাকে পেয়ে ওর একটা কথা বলার লোক হয়েছে। কিন্তু ও আরও বেশি কিছু চায়। কেন চায়? ওর তো আলেফ আছে! কেন তবু ও স্নানঘরের ফুটো দিয়ে আমাকে দ্যাখে? মানুষ একটা চাওয়া থেকে আরও গভীর আরও জটিল অন্য কোনো চাওয়ার দিকে যায় কেন? যেতেই কি হয় তাকে? আমিও ওকে নিয়ে কুৎসিত অনেক কথা ভেবেছি। ভাবতে চাইনি। কিন্তু মাথায়

এসেছে। কেবল ওকে উলঙ্গ করে বিছানায় পাওয়া নয়। আরও অনেককিছু। ইচ্ছে করেছে হাতে ওর গু নিয়ে দেখি। ইচ্ছে করেছে আমি চিত হয়ে শুই আর ও আমার মুখের ওপর পেচ্ছাপ করুক। ইচ্ছে করেছে... ইচ্ছেগুলো আমাকে এমনভাবে কেন জ্বালায়? সেদিন ও আমার ঘরে সেক্স করার চেষ্টায় এসেছিল, আমি বুঝতে পারছিলাম ও চাইছে আমি ওকে নিই, তখনও আমার ওই ইচ্ছেগুলোই হচ্ছিল, কিন্তু সামলে নিয়েছিলাম। কেন সামলে নিয়েছিলাম? কী বাধা ছিল? একটা ইচ্ছুক মেয়েমানুষকে নেওয়ার মধ্যে কীসের বাধা ছিল? কী গাধা আমি!

জ্যোতির্ময় বারিককে দেখে মনে হয় তিনি আমাকে চিনতে পেরেছেন, কী চিনেছেন, চেনার কী আছে আমার মধ্যে, তা তিনিই বলতে পারেন, এবং তারপরও আমাকে ভালোবেসেছেন। জ্যোতির্ময়বাবুর মনের মধ্যেও কি গোখরো সাপ আর কাঁকড়া বিছেগুলো বসে আছে? ওঁর পিশাচ কি ওঁকে আজও জ্বালায়? উনি পার্টি ছেড়ে দিলেন কেন? শুধুই বীতস্পৃহা? আয়নার সামনে উনিও কি নিজের প্রতিচ্ছবির চোখে চোখ রাখতে পারেন না? ওঁর চোখ ঠিক আমার বাবার মতো। প্রচুর পড়াশোনা করা লোকগুলোর চোখের মধ্যে একরকম মিল থাকে। বাবা যতক্ষণ বিজনেস নিয়ে ব্যস্ত থাকে তার বাইরে বই পড়ে। অজস্র বই পড়েছে বাবা। সারা পৃথিবীর বই। বাবাকে দেখেই আমিও বই পড়তে শিখেছি।

আমার চোখ নাকি খুব সুন্দর! সবাই বলে। তাই কি বাবা আমার চোখের দিকে চায় না?

বাবাকে আমি দেখেছিলাম মায়ের নার্স রেবাদির গায়ে হাত দিতে। রেবাদি বাধা দিচ্ছিল না। হয়তো খুশিই হয়েছিল। কেন খুশি হবে না! কিন্তু বাবা দেখতে পেয়েছিল আমি দেখে ফেলেছি। সেই থেকে আজ অবধি আমার সঙ্গে বাবার সম্পর্ক আর ঠিক হয়নি। বাবা যে আমাকে ভালোবাসে না, বাড়িতে রাখতে চায় না, তার কারণ কি সেদিনের আমার ওই দেখে ফেলা? বাবা যেটা করেছিল সেটা তো কিছুই অন্যায় নয়! আমার অন্যায় বলে মনে হয় না। সোনিয়া সেদিন জিজ্ঞেস করেছিল, আমি থ্রিসাম নিয়ে কী ভাবি, আমি বলেছিলাম ভালো না বেসে আমি কারও সঙ্গে সেক্স করতে পারব না, কিন্তু কেউ কেউ নিশ্চয়ই পারে! যেমন আমার বাবা। বাবা যে রেবাদিকে ভালোবাসত না, সেটা আমি জানতাম। আমি জানি। বাবা আমাকেও

ভালোবাসে না। আমার যে স্কুল-কলেজের লেখাপড়া হয়নি, আমি যে কোনোকিছু করে উঠতে পারি না, সেটা হয়তো কারণ নয়। বাবা আমাকে ভালোবাসতেই চায় না।

যে মানুষগুলোকে আমি শ্রদ্ধা করি, হয়তো যাদের আমি শ্রদ্ধা করতে চাই, তাদের মনের মধ্যেকার অন্ধকার পাঁকটাকে ঘেঁটে দেখতে আমার ইচ্ছে করে না। অন্ধকার পাঁক কাকে বলে সেটাও তো একটা কথা! মানুষের অপরাধবোধের বাইরে তার মনের মধ্যে অন্য কোনো অন্ধকার তো থাকে কি! তবু আমার নিজের মনের মধ্যে অন্যদের অন্ধকার নিয়ে, অন্যদের অপরাধবোধ নিয়ে অনিচ্ছুক কৌতূহল চলকে ওঠে। সকলকেই কি আমার মতো আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে দেখার ভান করতে হয়? খুঁটিয়ে দেখতে গেলেই কি মৃতদেহের ওপর এসে বসা মাছির মতো সন্দেহ জ্বালাতে থাকে? সবাইকেই? সবার মধ্যেই কি নিজের চোখে চোখ রাখতে না পারা লোকটা বাসা বেঁধে আছে? আমি এক অসুস্থ মানুষ। আমার মধ্যে একটা পিশাচ আছে। আমি হয়তো সিদ্ধার্থ নই। আমি হয়তো কোনোদিন বুদ্ধ হব না। কিন্তু আমি খারাপ লোকও নই। না না, আমি সেটা নই! আমি অসুস্থ হতে পারি, নিশ্চয়ই আমার মধ্যে অনেককিছু ঠিক নেই, কিন্তু আমি বিদ্বেষপরায়ণ নই। আমি মানুষকে ভালোবাসতে চাই। পৃথিবীর প্রত্যেকটা ধুলোকণাকে আমি ভালোবাসতে চাই। আমি ভালোবাসতে চাই অশিক্ষিত লোকেদের। আমি ভালোবাসতে চাই চিন্তাশীল মানুষদের। মনীষীদের প্রণাম করতে চাই। মনীষীদের নিয়ে আমি অনেক ভাবি। খুব লোভ হয় যদি এ সময় একজন রবীন্দ্রনাথ বেঁচে থাকতেন, একজন বিদ্যাসাগর, একজন সুভাষ বোস...

আজ একটু আগেই তো জ্যোতির্ময়বাবুর সঙ্গে বিবেকানন্দকে নিয়ে কথা হল! গতকাল কথা হচ্ছিল নিৎসেকে নিয়ে। বিরাট বিরাট লোকেদের নিয়ে কথা বলতে আমার ভালো লাগে। তাদের শ্রদ্ধা করার জন্য আমি তো মুখিয়েই থাকি! তবু, মনে হয়, যারা সব প্রকাণ্ড থিয়োরি নিয়ে বসে আছে, যে বিকট থিয়োরিগুলোর মধ্যে নাকি পৃথিবীর সব সমস্যার সমাধান আছে, সব জিজ্ঞাসার উত্তর আছে, তারাও হয়তো একেকজন মানসিক ভারসাম্যহীন মানুষ! তাদের খুব কাছ থেকে দেখলে তাদের ভিতরকার ফাঁকিগুলো সাধারণ মানুষের চেয়েও বড়ো হয়ে ধরা পড়ে যাবে।

মনীষীদের দূর থেকে দেখতে হয়। রূপনগরের পাহাড়টার মতো। দূর থেকে ভালো লাগে। সমীহ হয়। কাছে গেলে হয়তো কিছু মাটি আর পাথর চোখে পড়বে।

এই পৃথিবীতে মনীষীরা না থাকলেও মনীষীদের বাণীগুলো থেকেই যায়।

মনীষীদের জন্মদিনে স্কুল ছুটি হয়ে যায়। ভাবা যায়! কী গুরুত্ব তাঁদের!

মনীষীরা কি এক-একজন উন্মাদ নন? তাঁদের জীবনচরিত পড়তে আমার এত ভয় করে কেন? আমি আজও প্রশান্তকুমার পালের লেখা 'রবিজীবনী' পড়িনি। ইন্দ্রমিত্রের লেখা 'করুণাসাগর বিদ্যাসাগর' পড়িনি। পড়তে চাই না। চাই না মনীষীদের খুঁটিয়ে দেখতে, ওই যে বললাম, আমার ভয় করে খুব। যেমন বাবাকে যদি অনেক দূর থেকে দেখতাম, বাবা যদি আমার জন্মানোর আগেই মরে যেত, রক্তমাংসের বাবাকে আমি যদি কোনোদিন দেখতে না পেতাম, কে জানে, আমি হয়তো জীবনে পুরোপুরি শ্রদ্ধা করার একটা মানুষ পেতাম।

কেবল ভালোবাসা তো যথেষ্ট নয়, তাই না? কিন্তু এখানে, রূপনগরে, কিছু মানুষ আমাকে গুরুত্ব দেয়, হয়তো আমি অন্যরকম একটা প্রাণী বলেই আমার ওপর তাদের আগ্রহ জন্মেছে। সুদীপা আর ওর বন্ধুরা আমার কথা শোনে। আমাকে তাদের কথাগুলো শোনায়। আমি বেশ আছি এখানে। আমি ভাবতে পারি সুদীপা আর ওর বন্ধুরা আমাকে ভালোবাসে। সেটা কল্পনা করতে অসুবিধে হয় না আমার। কল্পনা কেন? সুদীপার সঙ্গে কথা বলার সময় আমার ভাষাই বদলে যায় পুরোপুরি।

এই যে লোকটার গলা কেটে রাস্তার ওপর ফেলে দিয়ে গেল, এখনও লোকটা পড়ে আছে, প্রচুর ভিড় জমছে লোকটাকে ঘিরে, এ শহরে প্রায়ই খুন হয়, তবু খুন হয়ে যাওয়া মানুষকে জ্যান্ত মানুষরা ঠিকই ভিড় করে দ্যাখে, পুলিশ এখনও আসেনি, ধীরেসুস্থে আসবে নিশ্চয়ই, লোকটা হয়তো খুনিদের চোখে একটা গোখরো সাপ ছিল, কিংবা একটা কাঁকড়া বিছে। তাই এত নাটকীয়ভাবে লোকটাকে তারা মেরেছে। যে জায়গায় লোকটাকে পড়ে থাকতে দেখছি, সেখানেই, ঠিক ওই জায়গাটাতেই লোকটা সেদিন সোনিয়ার গায়ে হাত দিয়েছিল, নর্দমার নোংরা তুলে এনে ওর গায়ে মাখিয়ে দিয়েছিল। মরে যাওয়ার পর মানুষকে খুব অচেনা লাগে। তবু লোকটাকে আমি চিনতে পেরেছি। ওই দাড়ি। ওই পোশাক। ওই কাটা দাগ। এই জায়গাটাও আমার স্পষ্ট মনে আছে। একেই কি বলে রেট্রিবিউশন? একেই কি

বলে পোয়েটিক জাস্টিস? প্রতিশোধ? চোখের বদলে চোখ আর দাঁতের বদলে দাঁতকে প্রতিশোধ বলে। কিন্তু দাঁতের বদলে চোখ উপড়ে নেওয়াকে কী বলা যাবে?

কে নিল প্রতিশোধ লোকটার ওপর? কারা নিল?

প্রকৃতি? লোকটার নিজস্ব স্বভাব? এই শহরের পরিবেশ? মানুষের সামাজিক কলকবজা?

সোনিয়াকে পেরিয়ে গলাকাটা লোকটা আবার আমার চোখে পড়ছে। কী বিকটভাবে পড়ে আছে! প্রাণ চলে গেলে মানুষের শরীর কি এমনই জড় হয়ে যায়! যেন অবহেলায় পড়ে থাকা একটা আলুর বস্তা! আমার খুব কষ্ট হচ্ছিল লোকটার জন্য। কান্না পাচ্ছিল। ওভাবে রাস্তায় একটা কুকুর মরে পড়ে থাকলেও আমি কান্না চাপতে পারি না। আর ও তো একটা জ্বলজ্যান্ত মানুষ! হয়তো খুব ধূসর একটা মানুষ! কিন্তু মানুষ তো! যদি গোখরো সাপও হয়, সাপেরও তো ক্ষুধাতৃষ্ণা থাকে, রমণ থাকে, বাঁচার সাধ থাকে...

আবার, একই সঙ্গে, আমার ভালো লাগছিল। মনের মধ্যে একটা অদ্ভুত পুলক টের পাচ্ছিলাম। যেন এই লোকটা যে এভাবে মরে পড়ে আছে, সেটা আমার একটা জয়। যেন আমার কোনোকিছু চরিতার্থ হল লোকটার এই পশুর মতো খুন হয়ে যাওয়ায়। সেদিন যখন লোকটা সোনিয়াকে অপমান করেছিল, আমি কিছুই করতে পারিনি। করার শক্তি নেই আমার। করার সাহস নেই। এখন ইচ্ছে করছিল এগিয়ে গিয়ে লোকটার কদর্য মুখের ওপর আমার পা তুলে দিই। আমার পায়ের চাপে ওর কয়েকটা দাঁত নিশ্চয়ই ভেঙে যাবে! ওর ওই ঠিকরে বেরিয়ে আসা চোখদুটোকে গেলে দিই। রক্তমাখা গাল থেকে দাড়িগুলো ছিঁড়ে নিই।

এই মৃতদেহটা যদি কেউ আমার হাতে এখন তুলে দিত... উফ! কী করতাম! কী যে করতাম!

মড়াটার সঙ্গে কী করতে চাইছি সেটা টের পাওয়া মাত্র আমার ইচ্ছে হল নিজের গালে সপাটে একটা চড় মারতে। নিজেকে স্বাভাবিক করতে চড়টা মারব বলে হাতও তুললাম, যেমন লোক মশা মারতে হাত তোলে, যেমন মানুষ নিজের স্বভাবের কাছে ফিরে যেতেই চায়। তখনই চোখে পড়ল কিছু লোক আমার দিকে

তাকিয়ে আছে। নিজেদের মধ্যে কীসব বলাবলি করছে। আমাকে নিয়ে কথা বলছে কেন? আমাকে নিয়ে কথা বলার কী আছে?

হঠাৎ আমার আবার খুব বমি পেল। তখনই বমি করতে হবে, মনে হল। হয়তো কারও গায়েই বমিটা করে ফেলব। কারও গায়ে যদি বমিটা করে দিই? করে দিতেই তো পারি! কে কী বলবে!

সমস্ত চিন্তা ছাপিয়ে খুব ইচ্ছে হল সেটাই করি।

সেটা কোনোরকমে চেপে আমি ভিড় থেকে বেরোলাম। বাড়ির দিকে হাঁটতে লাগলাম। বাড়ির যত কাছাকাছি হলাম, একটা ঝলমলে সকাল আবার আমাকে ঘিরে নিচ্ছিল, আমি আবার পাখির ডাক শুনতে পাচ্ছিলাম, বাচ্চাদের গলার আওয়াজ, কোথায় যেন লোকগীতি বাজছে, বুঝতে পারছিলাম পিশাচটা আবার আমার মধ্যে গুটিয়ে যাচ্ছে, লুকিয়ে পড়ছে, সকালে যে মানুষটা প্রকৃতির মধ্যে আনন্দিত ছিল, যে মানুষটা সবাইকে ভালোবাসতে চায়, সে আবার মাথা তুলে দাঁড়াচ্ছে। আবার আমার কানে বাজছে আনন্দকে বলা বুদ্ধদেবের শেষ কথাগুলো।

এখন খুন হওয়া লোকটার জন্য আমার মধ্যে কেবল করুণা টের পাচ্ছি।

কষ্ট হচ্ছে কেবল লোকটার জন্য। শুধু কষ্ট। এই কষ্টটা আমার দরকার, নিজেকে মানুষ হিসেবে ফিরে পাওয়ার জন্য।

বাড়িতে ঢুকেই সোনিয়ার ঘরে গেলাম। ও খাটের ওপর বসেছিল। একটা প্রাচীন তৈলচিত্রের মতো লাগছিল ওকে। সকালের আলোয় সারা ঘর ভরে গেছে। ও একটা বাসন্তী হাউসকোট পরে আছে। হাঁটুর উপর চিবুক। এক ধ্রুপদি নারী যেন। আমার পায়ের শব্দ পেয়ে মুখ তুলল। আমি ওর চোখ দেখলাম। চোখ দেখেই বুঝতে পারলাম ও জানে আমি কী বলতে এসেছি।

তবু বললাম, 'সেই লোকটাকে কারা মেরে ফেলেছে রে। ফেলে রেখে গেছে রাস্তার ওপর। এইমাত্র দেখলাম। ভিড় জমে গেছে। পুলিশ এখনও আসেনি।'

ও কিছুক্ষণ অপলকে তাকিয়ে রইল আমার মুখের দিকে। কী অদ্ভুত মুখের ভাব! কী যেন সব খেলা করছে ওর সারা মুখে! ভয়! অনুতাপ! উল্লাস! বিলাপ! পুলক! ব্যথা! উৎকণ্ঠা! বিষাদ! আকাঙ্ক্ষা! তারপর মুখ ফিরিয়ে নিল। তাকিয়ে আছে জানলার দিকে। জানলার ওপারে শরতের সকাল। সেই সকালের মধ্যে একটা

লোকের মড়া পড়ে আছে। অনতিদূরেই। যেন বাদশাহি হারেমের মধ্যে একটা কুকুরের মড়া।

আমি একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসলাম।

আমার চোখে কি জল? আঙুলে নিয়ে দেখলাম সত্যিই জল।

বেশ কিছুক্ষণ সময় নিয়ে সোনিয়া বলল, 'কোন লোকটা?'

ও কেন আমার সঙ্গে ছলনা করছে!

'যে লোকটা সেদিন তোর গায়ে ড্রেনের ময়লা মাখিয়ে দিয়েছিল!'

'ওহ কারা মারল?'

ও জানলাটার দিকে তাকিয়ে আছে। আমার দিকে তাকাচ্ছে না। জানলাটার আলোকিত চতুষ্কোণ ওকে আলোকিত করেছে, আমার গায়েও আলো ফেলেছে। আর আমার দিকে তাকাচ্ছে না কেন? ওর মুখের ভাবগুলো আমি দেখে ফেলব বলে? কী লুকোতে চাইছে আমার থেকে? কী লুকোতে পারে একজন মানুষ আরেকজন মানুষের সামনে বসে থেকেও? আমি তাকিয়েই রইলাম ওর দিকে। একেই কি বলে বিষাদের প্রতিমা? ওর চোখেও কি জল আছে? সেটাই দেখাতে চাইছে না আমাকে? আমি কি উঠে গিয়ে ওর মুখ দুই করতলে ধারণ করব? তাকাব ওর চোখের দিকে?

আমি আস্তে আস্তে বলতে শুরু করলাম, 'যেখানে তোকে ময়লা মাখিয়েছিল, সেখানেই একটূ আগে লোকটাকে ফেলে দিয়ে গেছে। একই জায়গায়। আমি প্রথমে লোকটা যে মরে গেছে, বুঝতে পারিনি, জানিস! তারপর দেখলাম গলাটা গভীর করে আড়াআড়ি কাটা। তার আগে প্রচুর মেরেছে ওকে। খুব কষ্ট পেয়ে মরেছে রে লোকটা।'

সোনিয়া কি একটু কেঁপে উঠল?

সুদীপা বলে, সোনিয়া হল এই শহরের রাজকুমারী। বিবেকানন্দকাকু যেহেতু শহরের রাজা। কিছুদিন ধরে দেখছি বাড়িতে অদ্ভুত চেহারার লোকেরা এসে থাকছে। তারা আমাদের সঙ্গে খায় না। তাদের জন্য বিরিয়ানির প্যাকেট আসে প্রতিদিন দুপুরে। রাতে মাংস আর তন্দুরি রুটি। তারা প্রচুর মদ খায়। খালি বোতল অজস্র জমেছে একতলায় সিঁড়ির নীচে, তারা আমাদের সঙ্গে কথা বলে না। কেবল

কাকুর সঙ্গে তাদের যোগাযোগ। আর আলেফ এলে তাদের খুব আনন্দ হয়। তাদের সঙ্গে বেশ কিছু বন্দুকও ঢুকেছে। বন্দুকগুলো বেআইনি নিশ্চয়ই। কেন এসব হচ্ছে? আমি সোনিয়াকে জিজ্ঞেস করেছিলাম। ও বলেছিল এ অঞ্চলের পলিটিকসে টিকে থাকতে গেলে এগুলো দরকার। কিন্তু সুদীপা বলেছিল, কাকু এ এলাকায় পলিটিকস নয়, মাফিয়া রাজ চালাচ্ছেন। সুদীপা খুব অবাক হয়ে আমাকে জিজ্ঞেস করেছিল, আমি ও বাড়িতে থাকি কী করে!

আমার কোথাও থাকা বা না-থাকায় কিছু কি এসে যায়? আমার কতটুকু অস্তিত্ব আছে এ পৃথিবীতে!

কবি শ্যামলকান্তি দাশের লেখা লাইন মনে পড়ে যায়— 'তুমি ক্ষুদ্র পিপীলিকা। চিরজীবিতেষু। সংসারের নাট্যরস চেটেপুটে খাবে।' আমার তো ইচ্ছে করে ওদের সঙ্গে ভাব জমাতে। ওদের কাছে বন্দুক চালানো শিখে নিতে। সেই ইচ্ছেটাকেও আমি জিততে দিইনি আজও। হয়তো ওরা আমাকে ফিরিয়ে দেবে না। হয়তো ওদের মধ্যেও কোমল অন্তঃকরণ আছে। সেখানে বন্ধুত্ব আছে। নতুন সম্পর্কের পিপাসা আছে। ওরা শুধুই ঘাতক নয়। মাঝেমধ্যে দেখেছি বাড়িতে ফোন করে। তখন ওদের গলা নরম শোনায়।

হঠাৎ, আমার দিকে না তাকিয়েই, সোনিয়া বলল, 'তুই কি সত্যিই অদ্ভুত? নাকি এমন সেজে থাকিস রে?'

এই প্রশ্নটা ও অনেক আগে করলেই পারত। এখন কেন!

আবার বলল, 'না। সত্যিই খুব ছেলেমানুষ তুই। লোকে তোকে যাই বলুক। আলেফ তো বলে তুই খুব ডেঞ্জারাস। কিন্তু আমার মনে হয়, আসলে তুই একটা বাচ্চা। আমার আর রাগ হয় না তোর ওপর।'

'আগে তাহলে রেগে থাকতিস?'

'রাগের ওপর কি মানুষের কিছু করার থাকে রে?'

'কেন থাকে না? রিপুকে জয় করার নামই তো মনুষ্যত্ব!'

'ওসব বাজে কথা। যেশাসও রেগে গিয়ে একটা ডুমুর গাছকে অভিশাপ দিয়েছিলেন। কৃষ্ণ ভীষ্মের উপর রেগে গিয়ে রথের চাকা তুলে নিয়ে তেড়ে গিয়েছিলেন। ডিড নট হি?'

'কাকুও কি রেগে গিয়ে লোকটাকে মেরে ফেললেন?'

সোনিয়া চুপ করে গেল আবার। কথাগুলো যখন বলছিল, আমি ওর খিদে টের পাচ্ছিলাম। আমাকে খেতে চায়। আমি ওর খাদ্য। পাচ্ছে না। আমার একটু খারাপ লাগছিল। কিন্তু যে কথাটা আমাদের দুজনের মধ্যে ঘনিয়েই এসেছে, সেটা যদি বলা হয়ে যায়, তাহলেই তো ভালো! ও জানে আমি কী বলতে এসেছি। আমিও জানি ও আমার কাছে কী শোনার আশঙ্কা করছে। অথচ একটু আগেই কথাটা আমি নিজেকেও বলিনি। নিজেকেও বলতে পারতাম না।

অনেক দূর থেকে যেন সোনিয়ার গলা ভেসে এল, অনেক পাহাড় উপত্যকা নদী বনজঙ্গল পেরিয়ে ওর গলা যেন আমার কানে এসে ঢুকল, যখন ও বলল, 'বাপি তার রাগকে দমন করতে জানে। তার রাগকে কাজে লাগাতে জানে। হি নোজ হোয়াট টু ডু উইদ হিজ অ্যাঙ্গার। যেটা করেছে, আয়্যাম সিয়োর, চিন্তা থেকে করেছে, ডিসিশন নিয়ে করেছে। রাগ থেকে করেনি।'

চিন্তা থেকে করেছে! বিবেকানন্দকাকু একজন অত্যন্ত শিক্ষিত মানুষ। একজন খুব ভালো পাঠক। আগ্রাসী পাঠক। সারা পৃথিবীর অজস্র বই পড়েছেন। উপন্যাস পড়েছেন। নিজের জীবনটাকেও কি একটা উপন্যাস হিসেবেই গড়ে তুলছেন, যাতে ওঁর বদলে অন্য কেউ সেটা পড়তে পারে? কে পড়বে? সোনিয়া? প্রত্যেকটা মানুষই হয়তো তার নিজের জীবনের ঔপন্যাসিক! কেউ জানে সে বেঁচে থাকার ছলে আসলে একটা উপন্যাসই লিখছে, কেউ সারা জীবন বেঁচেও সেটা জানতে পারে না। বিবেকানন্দ বসাক আর জ্যোতির্ময় বারিকের মতো মানুষেরা নিজেদের লেখক সত্তা জানতে পারেন, কিন্তু নিজেদের জীবন-উপন্যাস এডিট করতে পারেন কি? সোনিয়া আমাকে বলেছে বিবেকানন্দকাকু দস্তয়েভস্কির ভক্ত। আবার দস্তয়েভস্কি ছিলেন মার্কুইস দি সাদের ধাতের লোক। দস্তয়েভস্কি বলেছিলেন তিনি এক বালিকার শ্লীলতাহানি করেছিলেন। নিজের পাপের কথা ভাবতে কিছু মানুষ এত ভালোবাসে কেন! এমনকি ফিওদর দস্তয়েভস্কিও নিজেকে পাপী ভাবতে চাইতেন! 'নোটস ফ্রম দি আন্ডারগ্রাউন্ড' যে পড়ে ফেলেছে, 'ডেমনস' যে লোক পড়ে ফেলেছে, 'ক্রাইম অ্যান্ড পানিশমেন্ট' যে পড়েছে, সে একটা অন্ধকার মানুষকে মেরে ফেলতে পিছপা কেন হবে? কিংবা, কেন হবে না? দস্তয়েভস্কি নামক মহান

ব্যাধিকে লেভ তলস্তয় নামক মহৎ প্রতিষেধক দিয়ে নিবারণ করা যায়। কিন্তু কাকু তলস্তয় সম্পর্কে কী ভাবেন আমি জানি না। রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে কী ভাবেন আমি জানি না। জিজ্ঞেস করতে সাহস পাইনি। এ বাড়িতে কেউ রবীন্দ্রসংগীত শোনে না।

অবান্তর একটা প্রশ্ন জেগে ওঠে— আমার নিজের উপন্যাসিকাটা হচ্ছে কি কিছু? হচ্ছে আদৌ কিছু?

লেখাও কি তার লেখককে লিখে চলে না? আমি ঠিক কীভাবে লিখিত হচ্ছি নিজের উপন্যাসিকায়?

কিন্তু এসব ভাবার জন্য কি আমি আজ সোনিয়ার ঘরে এসেছিলাম? না তো! তবে?

আমি কি লম্পট হতে এসেছিলাম এই ঘরে, আজ, একটা কুৎসিত হত্যার অছিলায়? কিন্তু আমিই তো আমাকে সেটা হতে দিলাম না! আমি হয়তো জিতলাম না, কিন্তু আমিই জিতলাম। আজও আমার কৌমার্য অটুট রাখলাম।

কৌমার্য! যৌন সততা! যৌন সততা দিয়ে কী প্রমাণ হয়! কেউ যদি যৌনভাবে সৎ না হয়, সে কি সভ্য হতে পারে না? এসব চিন্তাই হাস্যকর, তাই না? লম্পট হওয়াই তো আজ সবচেয়ে স্বাভাবিক ব্যাপার! কবে ছিল না? পরশুরাম তাঁর মায়ের মাথা কেটে ফেলেছিলেন। সে কি সভ্যতার বিকার নয়?

কিন্তু লাম্পট্য বলেও আলাদা করে কিছু আছে কি আজ আদৌ! কে লম্পট নয়, এই অদ্ভুত সময়ে? হ্যাঁ, এই সময়টাই তো অদ্ভুত! আমি অন্য কোনো সময় দেখিনি। দেখব না। এই সময়টাকেই দেখব। আমার জীবনের সময়। তবু মনে হয় সারা পৃথিবীতে আজ যেন অনিদ্রা। মনে হয় আগে নিশ্চয়ই এমন ছিল না। কোনো আড়াল আজ কোথাও থাকছে না— শুধু কাচ ভাঙার শব্দ। পৃথিবীতে কোনোকিছুই আজ অক্ষুণ্ণ নয়। জননক্রিয়ার বাইরে বেরিয়ে এসে, বিস্ময় আর আনন্দ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে মানুষের বিকট কামপ্রবণতা সব কিছুকে গলিয়ে তরল করে দিয়েছে। শুধু লিঙ্গই আজ দাঁড়ায়। শুধু যোনিই আজ দরজা খুলে দেয়।

মাংস। শুধু মাংস। তাহলে লজ্জা? লজ্জা বলে কিছু আজ থাকতে পারে না।

তাহলে? হত্যা? হত্যা বলেও কিছু কি আজ আছে?

এসব কী চিন্তা আসছে আমার মাথায়?

উফ! কেন আমি এখনই সোনিয়াকে জাপটে ধরছি না!

কেন! কেন!

না। কিছুতেই না।

আমি কিছুতেই নিজেকে লম্পট হতে দেব না। এই সময়টা আমাকে ধ্বংস করতে পারবে না।

কিপ ইট আপ! বি ব্রেভ!

১১

ব্রিটিশ শিল্পী জোসেফ টার্নার ১৮৪২-এ একটা ছবি এঁকেছিলেন— snow storm : steam-boat off a harbour's mouth। অনেকবার ছবিটা দেখেছি আমি। এক আশ্চর্য ছবি। সামুদ্রিক তুষারঝড়ের মধ্যে বন্দরের মুখে একটা বাষ্পীয় পোত। দেখলে তাকিয়েই থাকতে ইচ্ছে করে। চরাচরের প্রতি কী অপরিসীম বিস্ময়বোধ থাকলে ওই ছবিটা আঁকা যায়! আর প্রকৃতির শক্তির প্রতি কী অসম্ভব সম্ভ্রম ও সমীহ! আমার আজ রূপনগরের কথা ভাবতে গিয়ে ওই ছবিটার কথা মনে এল। ওই ছবিতে টার্নার যে বিধ্বংসী তুষারঝড়কে এঁকেছেন, যা কোনোকিছুকেই মানে না, মানুষ যার সামনে তুচ্ছ, তবু মানুষ লড়ে যায়, একটা বাষ্পীয় পোত ভয়াবহ ঝড়ের মুখেও সংগ্রাম চালিয়ে যায়, রূপনগর এখন ঠিক ওই ছবিটার মতো, আর

প্রত্যেকটা মানুষ ওই বাষ্পীয় পোতটার মতো। কিংবা ভিতর থেকে উপচে আসা পিশাচটার হা হা হাসি যখন আমি শুনতে পাই, আমিও ঠিক অমন। ওই ছবিটা যেন আমার অন্তঃকরণের ছবি। কী করে এঁকেছিলেন জোসেফ টার্নার! তিনি তো আমাকে চিনতেন না!

রূপনগরে অনেক খুন হয়, নিয়মিতই হয়, আমি শুনেছি। যদিও আমি আসার পর ওটাই প্রথম খুন হতে দেখলাম। এও শুনেছি খুন ব্যাপারটা নিয়ে রূপনগরের মানুষ মাথাই ঘামায় না। মৃতদেহ পড়ে থাকে, লোকজন পাশ কাটিয়ে নিজের কাজে চলে যায়। কারণ যারা মরে, রূপনগরের মানুষ মনেপ্রাণে বিশ্বাস করে মরে যাওয়াটাই তাদের পক্ষে ভালো, সবার পক্ষে ভালো। কিন্তু এই নতুন খুনটা হিসেব গোলমাল করে দিয়েছে। কার হিসেব? হয়তো রূপনগরের মানুষের হিসেব। হয়তো বিবেকানন্দকাকুর হিসেব। কারণ হিন্দুত্ববাদীরা গুটিয়ে যায়নি, বরং এই খুনটাকে পুরোপুরি রাজনৈতিকভাবে ব্যবহার করে নিয়েছে। সুদীপা বলল, জীবনে প্রথমবার জগন্নাথ গোস্বামী বিবেকানন্দকাকুকে একটা কিস্তির চাল দিতে পেরেছেন।

সুদীপা বলল, 'কিন্তু বিবেকানন্দবাবু একজন শিক্ষিত লোক। তাই হয়তো উনি আরও বিপজ্জনক। উনি ঠিক জগন্নাথবাবুকে মাত দেবেন। দেখে নিয়ো।'

আপাতত তুমুল প্রচার চালাচ্ছে হিন্দুত্ববাদীরা যে ওই লোকটা, অর্থাৎ রামাচল যাদব, ছিল তাদের একজন নেতা, লোকটার বাবা নাকি রামজন্মভূমির করসেবক ছিল এবং ১৯৯০-এর ২ নভেম্বর অযোধ্যায় নাকি গুলিও খেয়েছিল, লোকটা নিজেও একজন লড়াকু সনাতনি, সে বিহার থেকে এই শহরকে উদ্ধার করতে এসেছিল, এবং তাকে খুন করেছে আলেফ আলী, উদাহরণ হিসেবে রাস্তায় ফেলে দিয়ে গেছে যাতে রূপনগরে কেউ হিন্দুত্ব নিয়ে কথা বলতে আর সাহস না পায়। যেভাবেই হোক প্রচারটা খুব কাজেও লেগেছে। রূপনগরে এখন উত্তেজনা চরমে। হিন্দুরাই উত্তেজিত। চতুর্দিকে গেরুয়া পতাকা। মৃত লোকটার ছবি দেওয়ালে দেওয়ালে। খবরের কাগজ আর নিউজ চ্যানেলগুলোও ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। এখন একটু স্তিমিত হয়েছে তারা। অবিশ্যি জগন্নাথ গোস্বামী ব্যাপারটাকে থিতোতে দিতে রাজি নন। সামনের পৌরসভা ভোটে এটাই তাঁর তুরুপের তাস। তাঁর দলবল এখন মরিয়া। রাস্তায় কাউকে 'জয় শ্রীরাম' বলে উত্তর না পেলে হিন্দুত্ববাদীরা অকথ্য অপমানও

করছে কাউকে কাউকে। মুসলিমরা, যাইহোক, এখনও অবধি কোনো সাড়াশব্দ করেনি, অনেকখানি ধৈর্য আর সহ্যশক্তির পরিচয় দিয়েছে তারা। কিন্তু কতদিন? রূপনগরে হিন্দু আর মুসলিমের সংখ্যা প্রায় সমান।

সারা পশ্চিমবঙ্গ জানে রূপনগরের অবস্থা ভালো নয়। বাড়ি থেকে আমাকে কলকাতায় ফিরে যেতে বলেছে। মা রোজই ফোন করছে সোনিয়ার নম্বরে। মা এখন খুব অসুস্থ। হয়তো বেশিদিন বাঁচবে না। মন কেমন করে মায়ের জন্য। কিন্তু আমি এখনই যেতে চাই না। একটা ঝড় আসতে চলেছে। আমি সেটা টের পাচ্ছি। এমন একটা অভিজ্ঞতার সামনে দাঁড়িয়ে পালিয়ে যাব? বাবার বিরক্ত মুখটা দেখতে? তার চেয়ে মাস্তুলে বাঁধা এক উন্মাদের মতো ঝড়টার সাক্ষী হই না কেন? নিজের রক্তমাংসচামড়ার ভিতরে একবার উঁকি দিয়ে দেখি না, যদি না পালিয়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়ানোর মতো কিছু থাকে সেখানে! কী হবে? মরে যাব? সে সুযোগ কম। বিবেকানন্দ বসাকের বাড়িতে থেকে সে সুযোগ কম।

সুদীপাও হাসতে হাসতে বলল, 'তুমি যে বাড়িটায় আছ রাজুদা, ঝড় এলে সেটাই কিন্তু ঝড়টার কেন্দ্র হবে! আর ঝড়ের কেন্দ্র একদম শান্ত থাকে, জানো তো? সেখানে বসে বোঝাই যায় না ঝড় হচ্ছে।'

ও হাসছিল। আমি ওর হাসিটা দেখছিলাম। বিদ্রুপ করছে না। ওর ওই হাসিটার মধ্যে আমার প্রতি মমতাই লেগে আছে। ও চায় আমি বেঁচে থাকি। আমার বেঁচে থাকায় পৃথিবীর কোনো সুরাহা তো হবে না। তবু সুদীপা চায় তার রাজুদা বেঁচে থাক। মা চায় তার ছেলেটা বেঁচে থাক। আমিও চাই পৃথিবীর সবাই বেঁচে থাক। চাই ইজরায়েল আর প্যালেস্তাইনের যুদ্ধ থেমে যাক। একটা শিশুও যেন আর না মরে। কিন্তু আমার ভিতরের পিশাচটা... কেন মুসলিমরা হজে গিয়ে শয়তানকে পাথর মারে, আমি জানি, আমি বুঝি। ইদানীং আমার হাতে সবসময় একটা ঢিল থাকে। যখনই মনে কোনো উল্লসিত চিন্তা উঠে আসে, যে চিন্তায় নিজেই শিউরে উঠি, তখন নিজেকে নখ দিয়ে খামচে ধরি, নখ বসিয়ে দিই নিজের মাংসে, রক্ত ফুটে ওঠে চামড়ায়, শাস্তি দিই নিজেকে ওভাবে, যেমন তলস্তয়ের গল্পে ফাদার সের্গেয়ুস নিজের আঙুল কেটে ফেলেছিলেন এক নারীর সঙ্গে মৈথুনের ইচ্ছা দমন করার জন্য। এ আমার কোনো নৈতিক লড়াই নয়। যৌনভাবে সৎ থাকার কোনো যুদ্ধ আমি করছি

না। এ শুধু আমার নিজের সঙ্গে নিজের লড়াই। নিজেকে দমন করার চ্যালেঞ্জ। নিজের কাছে আত্মসমর্পণ করব না আমি, কিছুতেই। সেজন্যই সোনিয়াকে ফিরিয়ে দিয়েছি। ওর সঙ্গে সেক্স করতে মরে যাচ্ছি আমি। তাই করব না। কিছুতেই করব না। দেখি কে হারে— আমি, নাকি আমিই।

এ আমার কোনো বিবেকের ব্যাপার নয়। নৈতিকতার ব্যাপার নয়। এও এক অস্বাভাবিকতা। জানি। বাঁচার এ পথ নয়। দুইয়ে আর দুইয়ে আমি চার হতে দিচ্ছি না, পাঁচ করতে চাইছি। আমার স্বভাব যা চাইছে, আমি তা করছি না। স্বভাব আমার ওপর প্রতিশোধ কি নেবে না?

আশেপাশে কাউকে দেখতে পাচ্ছি না যার মধ্যে বাঁচার অভ্যাসটা বজায় আছে। আমি মানুষের মতো বাঁচার কথা বলছি। হ্যাঁ, স্বাভাবিক বাঁচার কথাই বলছি। সবাই পঙ্গু, নিজের নিজের মোবাইল নম্বরের হাতে। সত্যিকারের যে বাঁচা, তার প্রতি যেন এক সর্বজনীন বিদ্বেষ ছড়িয়ে পড়েছে সংক্রামক অসুখের মতো। মানুষ আর মনে করতেই চায় না মোবাইল আসার আগেও তাদের একটা জল মাটি আলো বাতাসের জীবন ছিল। সেই জীবনটা এখন অলীক। সেই জীবনটার কথা ভাবতে হলে সে যেন একটা শাস্তি মানুষের কাছে এখন। মোবাইল যেমন বাঁচায়, মানুষ ঠিক তেমন করে বাঁচে। কীসের এত ছলনা তবু আমাদের? কীসের এত ফাঁদ পাতছি আমরা? আজ যদি আমরা মোবাইল নম্বরের হাত থেকে মুক্তি পাই, যদি আমাদের ফিরিয়ে দেওয়া হয় বিংশ শতাব্দীর জীবন, আমরা নিতেই পারব না। আমরা তখন ভিক্ষা চাইব যেন আমাদের মোবাইল নম্বর আমাদের ফিরিয়ে দেওয়া হয়। এই যে আমি মোবাইল ব্যবহার করছি না, ভাবছি মোবাইলও আমাকে ব্যবহার করতে পারছে না, এ কোনো বিদ্রোহ নয় সোনিয়া বা সুদীপার চোখে। এ নিতান্তই উৎকেন্দ্রিকতা। খ্যাপামি। একটা খ্যাপাটে মানুষের। যার অনেক খামতি ওরা ক্ষমা করে দিতে প্রস্তুত।

হয়তো হাতে একটা মোবাইল থাকলে আমি অনেক স্বাভাবিক হতাম।

বিকেলে সুদীপার সঙ্গে প্রায় প্রতিদিনই চিত্তরঞ্জন পার্কে দেখা করি। ওর সঙ্গে কলেজের বন্ধুরা থাকে, কোনোদিন সংখ্যায় বেশি কোনোদিন কম। খুনটার পর থেকে সুদীপার সঙ্গে তেমন কেউ আর আসছে না আমাদের আড্ডার জন্য।

এমনিতেও আমাদের আড্ডা শেষ হতে হতে রোজই সন্ধে হয়ে যায়। সন্ধের পরে এখন রূপনগরের রাস্তায় লোকজন প্রয়োজন ছাড়া বেরোচ্ছে না।

দমবন্ধ ভয়ের পরিবেশ সারা শহরে।

সুদীপার বন্ধুরা কি আমাকে ভয় পাচ্ছে? যেহেতু আমি বিবেকানন্দ বসাকের বাড়িতে থাকি? আমাকে কি সন্দেহ করছে ওরা? আমি জানি রামাচল যাদবকে কারা মেরেছে, কেন মেরেছে। এই জানাটা যে কী ভয়ংকর একটা বিচ্ছিন্নতার দিকে আমাকে ঠেলে দিতে চাইছে! বুকের মধ্যে একটা পাথর নিয়ে ঘুরছি। আমাকে দেখে কি বোঝা যাচ্ছে, ওরা কি বুঝতে পারছে, আমি আরও আলগা হয়ে গেছি বাকি সমাজ থেকে? এমনিতেই অদ্ভুত আমি, আরও কদর্যভাবে একা হয়ে গেলাম। আমি এখানেও ব্যর্থ। ছেলেমেয়েগুলোকে ধরে রাখতে পারলাম না। আসলে শুধু কথা বলে আজকের দিনে কাউকে ধরে রাখা যায় না। তেমন ক্যারিশমা আমার নেই।

তবু সুদীপা বলল, 'তুমি যখন আমার দিকে তাকাও রাজুদা, মনে হয় কোথায় যেন হারিয়ে যাচ্ছি! কী আশ্চর্য তোমার চোখদুটো!'

ওর এই কথার মধ্যে কি প্রেমের ইশারা নেই? ওর কি ইচ্ছে করছে আমি ওর হাতটা ধরি? হাতটা যেন সেভাবেই ফেলে রেখেছে বেঞ্চে। ওর কি ইচ্ছে হচ্ছে... আমি ওর গায়ে হাত দিই, এই যে আশেপাশে কেউ কোথাও নেই, ও কি কিছুর অপেক্ষা করছে? কত সাবলীলভাবে বসে আছে! কিছু কি চায়?

আজ সুদীপার সঙ্গে কেউ আসেনি। আজ আমরা একা বসে আছি একটা বেঞ্চে। একটা গুলমোহর গাছের তলায় বেঞ্চটা। কিছু ফুল ঝরে আছে আশেপাশে।

সুদীপাও তো একটা মোবাইল নম্বর! তবু সুদীপা এ শহরের পাহাড় বাঁচাও কমিটিতে নাম লিখিয়েছে। কমিটি এখন আর সেভাবে কিছু করছে না। করার প্রয়োজন হচ্ছে না। পাহাড় থেকে পাথর কাটা বন্ধই হয়ে গেছে। ওর বয়সি একমাত্র সুদীপাই আছে কমিটিতে। ভয় পায়নি। ও আমাকে বলেছে ওই কমিটি হিন্দুত্ববাদীদের নয়, কমিউনিস্টদের। বলেছে পরিবেশকে বাঁচাতে হলে, পাহাড় বা নদীর জন্য রাস্তায় নামতে হবে, এসি কামরায় বসে কেউ পাহাড়-নদী বাঁচাতে পারবে না। তা ছাড়া সুদীপা রূপনগর কলেজের ভোটে দাঁড়িয়েছিল সরকারি ছাত্র সংগঠনের বিরুদ্ধে। হেরে গেছে। তবু দাঁড়িয়েছিল তো! এখন ও কলেজে ঢুকলে

ওকে টিজ করে সরকার পক্ষের ছাত্রছাত্রীরা। ও ঘাবড়ায় না। পালটা জবাব দেয়। জবাব দেওয়ার মতো ওর আত্মবিশ্বাস আছে— ৩৪ বছর শাসন করার পরে কমিউনিস্টদের যদি পতন হয় পীড়ন আর আত্মক্ষয়ের অভিশাপে, এই দুর্নীতিপরায়ণ চালাক সরকারকেও একদিন বাংলার মানুষ ছুড়ে ফেলে দেবে। ও আজকের দিনেও সাম্যবাদে বিশ্বাস করে। ও বলে একবার এ রাজ্যে ক্ষমতা ফিরে পেলে কমিউনিস্টরা আর আগের ভুলগুলো করবে না। হয়তো বোকার মতো ভাবে আর বলে এসব। আমার মতোই কি বোকা ও? ও বলে অন্ধকার কখনও শেষ কথা বলতে পারে না। কোথায় যেন ওর মধ্যে বিংশ শতাব্দীর মানুষদের ফেলে যাওয়া দিনগুলোর ক্ষয়ে আসা ইশারা আছে।

হ্যাঁ, ওর মধ্যেও আছে একটা হড়হড়ে গহ্বর, যেটার মধ্যে লিঙ্গ গেলে আমি শুধু পড়তে থাকব, কেবল তলিয়ে যেতে থাকব, আমার পতনের কোনো শেষ থাকবে না, আমার স্খলনের কোনো ক্ষমা থাকবে না আমার নিজের কাছে— আমার মনে হয়, তবু ওর মুখের দিকে তাকালে সেই গহ্বরটার কথা আমার সহসা মাথায় আসে না, আমার পড়ে যাওয়ার ভয় থাকে না। শান্তি আছে। ওর সঙ্গে কথা বলে শান্তি আছে। নিশ্চয়তা আছে। শান্তি কাকে বলে, নিশ্চয়তা কাকে বলে সেসব যেন কেউ আমাকে জিজ্ঞেস না করে। আমি এক ভুলভাল মানুষ। আমার কাছে আমার আচরণের কোনো উত্তর যেন কেউ আশা না করে।

হ্যাঁ। শুধু লিঙ্গই আজ দাঁড়ায়।

শুধু যোনিই আজ দরজা খুলে দেয়।

অথচ মানুষ তো ঈশ্বরকে প্রায় আবিষ্কার করেই ফেলেছে! মেরে ফ্যালেনি তাঁকে।

কেন আমি খ্রিস্টীয় ঈশ্বরের কথা ভাবছি!

'আমার চোখদুটো তাহলে তুমি নাও। রামচন্দ্র যেমন নিজের চোখ উপড়ে অঞ্জলি দিয়েছিলেন, আমিও দিই তোমার পায়ে?'

'উফ! কী দারুণ প্রেমিকের মতো কথা বলতে পারো তুমি রাজুদা! এও কি বই পড়ে শিখেছ? আমার ওপর প্র্যাকটিস করে নিচ্ছ, না? অবিশ্যি এর বেশি দৌড় তোমার নেই। আর কিছু করতে পারবে না। কেবল কথা আর কথা!'

সত্যিই তো! কেন পঁচিশ বছর বয়সি আমি কুড়ি বছর বয়সি সুদীপার সঙ্গে প্রেমের ভাষায় শুধু কথা বলি? অন্য ভাষা আসে না কেন আমার শরীরে? কেন ওর সামনে দাঁড়িয়ে আমার নিজের সঙ্গে কোনো লড়াই থাকে না? এ কেমন ইন্দ্রজাল! হ্যাঁ, আমি ওকে ভালোবাসি। ভালো আমি সবাইকেই বাসতে চাই। তবু সুদীপার সামনেই আমার ভাষা বদলে যায় কেন?

বাতাসে আজ বেশ হিমেল ভাব। এই বিকেলে আকাশ ঈষৎ মেঘলা। এখন পূর্ণ শরৎ। আর কয়েকদিন পরেই মহালয়া। বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের গলাটা শুনতে আমার খুব ভালো লাগে আধো ঘুমের মধ্যে।

সুদীপা অন্যমনস্ক হয়ে তাকিয়েছিল একটা শালিখের দিকে। শালিখটা এদিক-ওদিক লাফিয়ে বেড়াচ্ছে। ঘাসের মধ্য থেকে কীসব খুঁজে নিচ্ছে ঠুকরে খাওয়ার জন্য। মজার পাখি! সুদীপার মধ্যে যে একটা খুব নরম মেয়ে বাস করে, এমন সব মুহূর্তে বুঝতে পারি। মনে হয়, ও কি লুকিয়ে লুকিয়ে দিনলিপি লেখে? আচ্ছা, ও কি কবিতা লেখে? ওকে নিজের লেখা উপন্যাসটার কথা বলতে ইচ্ছে করে। যে উপন্যাসটা হয়তো কোনোদিন কেউ পড়বে না। সুদীপাকে যদি পড়াই? একজন পাঠক তো জুটবে! তাহলেই লেখাটা সার্থক।

একটা হলদে টি-শার্ট আর ডেনিম জিনস পরে আছে সুদীপা। টি-শার্টটার বুকে লেখা আছে LESS SPEAK। কেন? ও তো বেশি কথা এমনিতেই বলে না। তবু ওটা লেখা কেন? টি-শার্টটা কেনার সময় ও কি লেখাটা খেয়াল করেছিল?

ওর কাঁধে একটা কালো পিঁপড়ে। এই পিঁপড়ে কামড়ায় না।

আমি পিঁপড়েটাকেই দেখছিলাম। ও সুদীপার শরীরে উঠেছে কেন? খাদ্যের সন্ধানে? নাকি কোনো অচেনা দেশে বেড়াতে যাওয়ার মতো ব্যাপার ওটা ওর কাছে? ওর কাছে নিশ্চয়ই সুদীপার শরীর একটা বিরাট শহরের মতো। ও যে-কোনো মুহূর্তে রাস্তা হারিয়ে ফেলতে পারে। তখন কী করবে? এই পিঁপড়েটা ওর গোষ্ঠী থেকে বেরিয়ে এসে একটা অচেনা শহরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। নিশ্চয়ই ওর খুবই আশ্চর্য কিছু অভিজ্ঞতা হচ্ছে!

বললাম, 'তোমার খুব খারাপ লাগে তাই না, আমি বিবেকানন্দকাকুর বাড়িতে থাকি?'

সুদীপা হাসিমুখে আমার দিকে তাকাল। ওর হাসিতে কোনো ময়লা থাকে না। ওর হাসি দেখে মনে হল না আমার ও বাড়িতে থাকা বা না-থাকা নিয়ে ওর কোনো গ্লানি আছে।

হাসতে হাসতেই বলল, 'না তো! ও বাড়িতে থাকলে যে তুমি বদলে যাবে, নষ্ট হয়ে যাবে, তোমার সম্পর্কে আমি তেমন ভাবি না। তুমি এমনই মানুষ, তুমি যে-কোনো জায়গায় নিজের মতোই থাকবে। নিজের কথাগুলোই বলবে। আমি শুধু বলছিলাম ও বাড়িতে থাকলে তোমার চট করে কোনো বিপদ হবে না। শহরে যতই ঝড় উঠুক, বিবেকানন্দ বসাকের বাড়ি নিরাপদই থাকবে। সেটায় আমিও নিশ্চিন্ত। আরেকটা ব্যাপার হল, বিবেকানন্দ বসাক আর জগন্নাথ গোস্বামী কিন্তু একই কয়েনের দুটো পিঠ। ওঁদের শত্রুতা বা বন্ধুত্ব, কোনোটাকেই বিশ্বাস করি না আমরা।'

ও সহজভাবেই কথাগুলো বলছে। কথাগুলোর মধ্যে কোনো শ্লেষ নেই। 'আমরা' কারা? কমিউনিস্টরা?

ওকে কি বলব বিবেকানন্দকাকু কেমন তাঁর বাড়িতে অস্ত্রাগার গড়ে তুলেছেন, কেমন সৈন্য সমাবেশ করেছেন? একতলায় যে বন্দুক ঢুকেছে, অদ্ভুত লোকগুলো আস্তানা গেড়েছে, ওকে কি বলব? ওকে কি বলব, আমার ধারণা কাকুর কথায় আলেফ আলিই রামাচল যাদবকে মেরেছে? বলা কি ঠিক হবে? কিংবা, এখনই বলব না? কিন্তু কেন? শহরের লোকেদের কি কথাগুলো জানা উচিত নয়? আলেফকে আমি ভালোবাসতে চাই কিন্তু আমার মনের মধ্যে যে সত্যিটা লুকিয়ে আছে, কেন সেটাকে সুদীপাকে বলব না!

ওকে বললাম। হয়তো ঠিক করলাম না। বিশ্বাসঘাতকতাই কি করলাম কাকুর প্রতি? সোনিয়ার প্রতি? কথাগুলো বলার সময় সোনিয়ার মুখ আমার চোখের সামনে ভাসছিল। তবু বললাম। হয়তো আলেফ এরপর সমস্যায় পড়বে। কিংবা এ শহরে খুনটা কোনো ব্যাপার নয়, ও ঠিক সামলে নেবে।

সুদীপা গম্ভীর হয়ে গেল। তারপর আস্তে আস্তে বলল, 'আলেফ আলী যে রামাচলকে মেরেছে, এ খবরটা তুমি না দিলেও আমি আন্দাজ করেছিলাম। অনেকেই জানে ও লোকগুলো এসেছে, ও-বাড়িতে আছে। বন্দুকও এসেছে, সেটাই স্বাভাবিক। রূপনগরের রাজনীতি এ-রকমই। প্রত্যেক ইলেকশনের আগে এটাই

হয়। বিবেকানন্দ বসাক কোনোভাবেই মিউনিসিপালিটি তাঁর হাত থেকে যেতে দেবেন না। প্রয়োজনে যত রক্ত ঝরে, উনি ঝরাবেন। উনি চাইলেই এমএলএ বা এমপি হতে পারতেন। কিন্তু ওঁর শুধু এই শহরটাই চাই।'

এই খবরটা এবার নিশ্চয়ই শহরের কমিউনিস্টদের কাছে যাবে। হিন্দুত্ববাদীরাও জেনে যাবে।

কিন্তু সুদীপা তো বলছে সবাই আগে থেকেই জানে! আমি না বললেও সবাই জানত নিশ্চয়ই।

সুদীপা অন্যমনস্কভাবে বলল, 'তুমি শুধু ও-বাড়িটাই দেখেছ। সারা শহরে অনেক জায়গাতেই এখন মারাত্মক সব অস্ত্র ঢুকেছে। রেলকলোনিতে লুকিয়ে বোমা বানানো চলছে। আর কিছুদিনের মধ্যে খোলাখুলি ওয়ার শুরু হয়ে যাবে।'

'পুলিশ?'

'পুলিশ? হাসালে রাজুদা! তবে একবার লড়াই শুরু হয়ে গেলে তুমি আর আমি এখানে বসে এভাবে কথা বলতে পারব কিনা জানি না। ইলেকশনের ডেট ঘোষণা হয়ে গেলেই রূপনগর পুরো বদলে যাবে রাজুদা। হয়তো তার আগেই অনেক বদলে যাবে। তুমি তখন এই পাহাড়ি শহরটাকে চিনতে পারবে না। আমার অবিশ্যি চেনাই লাগবে। ছোটো থেকে দেখছি।'

'তোমার কি কোনো বিপদ হতে পারে সুদীপা?'

সুদীপা আবার সেই সুন্দর হাসিটা হাসল। আমার চোখের দিকে তাকিয়ে বলল, 'কেন জিজ্ঞেস করছ? আমার জন্য তোমার চিন্তা হয় রাজুদা? আমার কথা ভেবে কখনও রাতে জেগে থেকেছ? অন্তত কিছুক্ষণ জেগেছ, আমার কথা ভেবে?'

শুধু লিঙ্গই আজ দাঁড়ায়। শুধু যোনিই আজ দরজা খুলে দেয়। মাংস! মাংস! অথচ সুদীপা আমার দিকে তাকিয়ে এত অমলিনভাবে হাসে কী করে? শরতের এই ঈষৎ হিমেল বিকেলে, যখন সন্ধ্যা সমীপবর্তী, এই যে আমরা দুজন পাশাপাশি, অথচ আমার মনে কোনো যৌনচিন্তা আসছে না, এ থেকে মনে হয় মানুষ এই পৃথিবীতে অনেকদিন আরও বাঁচবে, মানুষ এত সহজে অবসানের দিকে যাবে না, নারী আর পুরুষের আজও পরস্পরকে অনেক কথা বলা বাকি আছে।

'আমার জন্য তোমার চিন্তা হয় না? বিবেকানন্দকাকুর বাড়িতে নিরাপদে আছি বলে?'

আমি প্রশ্নটা করলাম। করতেই হত।

সুদীপা চুপ করে তাকিয়ে রইল আমার দিকে।

আমিও ওর চোখ থেকে চোখ সরালাম না।

'সোনিয়ার থেকে সাবধানে থেকো। ওর সম্পর্কে অনেক কথা শুনি। সত্যি আর মিথ্যে মিলিয়েই সেসব কথা তৈরি হয়েছে। আমার নিজের ওর পার্সোনালিটি আর অ্যাপিয়ারেন্স দারুণ লাগে। যদি ছেলে হতাম, হয়তো সোনিয়ার প্রেমে পড়ে যেতাম। মেয়ে হয়েও প্রেমে পড়তে অসুবিধে নেই আমার। তবু তোমার জন্য ভয় করে রাজুদা। তুমি কত নিষ্পাপ! কত ইনোসেন্ট তুমি! এমনই থেকো। আমার জন্য না হোক। অন্য কারও জন্য। যে তোমার জীবনে আসবে। যে তোমার আজীবনের সঙ্গিনী হবে। তার জন্য নিজেকে ধরে রেখো। নিজেকে কিন্তু নষ্ট হতে দিয়ো না। সেই মেয়েটাও তো অনেক আশা নিয়েই তোমার জীবনে আসবে!'

এমন কথা আজও একটা মেয়ে বলতে পারে, একটা ছেলের দিকে চেয়ে!

কে বলে পৃথিবী একটা খারাপ জায়গা আজ!

কিন্তু সুদীপার সঙ্গে আজও আমার পাহাড়টায় যাওয়া হল না।

১২

'তোমার বাপ তো ঠাকুর-দেবতা কিছুই মানত না! যতদূর জানি তোমাদের বাড়িতে ধর্ম-টর্মের চর্চাও কিছু নেই। একসময় তোমাদের বাড়িতে অনেক গেছি। কোনোদিনই কিছু চোখে পড়েনি। তোমার বাবা তো সরস্বতী পুজোয় অঞ্জলিও দিত না! তোমার মধ্যে এসব ঝোঁক কোত্থেকে এল?'

বিবেকানন্দকাকু হাসতে হাসতেই প্রশ্নটা করলেন। কিন্তু ওঁর চোখ হাসছিল না। উনি হাসলেও ওঁর চোখ হাসে না। তাই ওঁর চোখের দিকে তাকাতে আমার অস্বস্তি হয়। চোখ নামিয়ে রাখি। ভয় করে না। মনে হয় যেন আমার সঙ্গে কথা বলতে ওঁর ভালো লাগছে না। মনে হয় আজকাল সোনিয়া ছাড়া কারও সঙ্গে কথা বলতেই ওঁর ভালো লাগে না। বেঁচে থেকেও ওঁর আর কোনো আনন্দ নেই, এমনও মনে হয়

আমার। কিন্তু আজ দেখছি বেশ হালকা মেজাজে আছেন। তবু, ওঁর চোখ হাসছে না।

'আমিও ঠাকুর-দেবতা মানি না কাকু। আমি মন্দিরে যাই না।'

'তাহলে ধর্মের হয়ে এত কথা বলো কেন? যুক্তি দাও কেন?'

'ঠাকুর দেবতা না মেনেও, জন্মান্তর না মেনেও, জাতিভেদ না মেনেও, বেদ না মেনেও, তাবিজ-মাদুলি না লাগিয়েও, সাম্প্রদায়িক না হয়েও তো ধার্মিক হওয়া যায় কাকু! নাস্তিকরাও ধার্মিক হতে পারে। ধর্মের মধ্যে সে অবকাশ রাখা আছে। মানুষের দার্শনিক জিজ্ঞাসার মধ্যে সে সুযোগ আছে। অজিত কেশকম্বলী বা চার্বাকও তো সনাতন ধর্মেরই লোক! তা ছাড়া আমি শুধু বলি ধর্মগ্রন্থগুলোকে অবহেলা করা ঠিক নয়। অনেক সম্পদ লুকিয়ে আছে ওদের মধ্যে। অনেক সংকেত। সেগুলোকে ডিকোড করতে পারলে আজকের মানুষ অনেক এগিয়ে যাবে। তা ছাড়া সমাজে ধর্মের প্রয়োজন আছে। কারণ ধর্মই সাধারণ মানুষকে অন্যায় আর অবৈধ কাজ করতে বারণ করে। বিজ্ঞান সেটা করে না।'

'সাধারণ মানুষ বলতে তো অজ্ঞ অশিক্ষিত মানুষ?'

অবাক হয়ে বললাম, 'আমি নিজেই তো অশিক্ষিত কাকু!'

একটু বিরক্ত গলায় উনি বললেন, 'যারা দুর্বল, তাদের জন্য ধর্ম! দুর্বল মানুষরা আইনের ভয়েই অনেক কাজ করে না। সুযোগ পেলেই করবে। তাদের নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য ধর্মকে বজায় রাখতে হবে, এ আমার মনে হয় না। দ্যাখো রাজু, শিক্ষিত হওয়ার জন্য স্কুল-কলেজে যেতে হয়, এটা আমিও বিশ্বাস করি না। আমি নিজে কলেজ-ইউনিভার্সিটিতে পড়েছি। যখন এ রাজ্যে সত্যিই লেখাপড়ার চল ছিল বলে কেউ কেউ মনে করে, তখনই পড়েছি। নিজে চাইলে কোনো কলেজের অধ্যাপকও হতে পারতাম। তোমার বাবাও সেটা হতে পারত। আমরা নিজেদের জন্য জীবনের অন্য পথ বেছেছি। কিন্তু লেখাপড়া ছাড়িনি সেটার জন্য। আমিই বলছি শিক্ষিত হওয়ার জন্য স্কুল-কলেজ লাগে না। তুমি এ ব্যাপারে আমাকে তোমার বন্ধু ভাবতে পারো। একজন অসমবয়সি বন্ধু। তোমার বাবা হয়তো তোমার বন্ধু হতে পারেনি। বাবারা অনেকসময় সেটা হতে পারে না। সেটা পুরোপুরি

সন্তানের ব্যর্থতাও নয়। হয়তো পরস্পরের মধ্যে অনেকগুলো ফ্যাক্টর এসে পড়ে, সেগুলোকে দুজনেই পেরোতে পারে না।'

আমরা দুজনেই কিছুক্ষণ চুপ করে থাকলাম। এই প্রথম উনি আমার সঙ্গে একা কথা বলছেন। এ বাড়িতে যতদিন আছি, ওঁর সঙ্গে একান্তে কথা বলার সুযোগ হয়নি। আজ উনি ডেকে পাঠিয়েছেন। কিন্তু কেন? এত ব্যস্ততার মধ্যে আমার জন্য সময় বের করলেন... অবিশ্যি রাত এখন অনেক হয়েছে। জানালার বাইরে ঘন অন্ধকার। নিস্তব্ধ শহর। ওঁর টেবিলে একটা বই। সাদা মলাট। বুকমার্ক দেওয়া আছে। ওরহান পামুকের 'ইস্তানবুল'। এই বইটা আমার পড়া হয়নি।

আমাদের মধ্যেকার স্তব্ধতা ভেঙে উনিই প্রথম কথা বললেন, 'বন্ধুত্বের হাত যখন বাড়িয়েই দিলাম, তোমার সঙ্গে আজ খোলাখুলি কথা বলব। এতদিনে তুমি বুঝে গেছ, নিজে না বুঝলেও তোমাকে নিশ্চয়ই বলে দেওয়া হয়েছে, আমি অবৈধ বা অন্যায়, এই দুটো শব্দে বিশ্বাস করি না। সেটার পিছনে আমার একটা যুক্তিও আছে। দ্যাখো আমি... আমি নাস্তিক নই। আমি জাস্ট তথাকথিত ধর্ম ব্যাপারটা নিয়ে ভাবিই না। আমি মনে করি একজন বুদ্ধিমান মানুষ, একজন অসাধারণ লোক, যার মধ্যে শক্তি আছে, উদ্যম আছে, অ্যাম্বিশন আছে, সে কখনও অন্যায় বা অবৈধ কাজ করে না। সে ভুল করতে পারে। তার গলতি হতে পারে। পা ফসকাতে পারে। কিন্তু সে অন্যায় করে না। যা হয় না, তা সে করবে কোত্থেকে? অন্যায়... অবৈধ... এসব শব্দ মূর্খ অশিক্ষিতদের জন্য। এসব শব্দের কোনো বাস্তবিকতা নেই। তুমি যাদের সাধারণ মানুষ বলো, তাদের জন্য এই শব্দগুলো তৈরি করা হয়েছে।'

কী বলব আমি? চুপ করে রইলাম। মনে পড়ছিল অনেকেই বলে এ দেশের আইন বিরাট অপরাধীদের স্পর্শ করে না, বিরাট অপরাধকেও স্পর্শ করে না। যে ক্রাইম, যে দুর্নীতিগুলো নিয়ে সংবাদমাধ্যমে তুফান ওঠে, ব্যাপারগুলো কোর্টে যায়, সবাই উৎকণ্ঠার সঙ্গে তাকিয়ে থাকে, কিছুদিনের মধ্যেই সেসব কেমন যেন মিলিয়ে যায়, সেগুলোর আর হদিশই পাওয়া যায় না, কিংবা সবাইকে অবাক করে দিয়ে সেগুলোর পরিণতি আসে— বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া। বিরাট বিরাট নেতা বা অভিনেতাদের জন্য যেন আইন তৈরিই হয়নি! কিংবা তাদের রক্ষা করার জন্য তৈরি হয়েছে! কিংবা তাদের যখন পতনের সময় আসবে, তখনই আইন তাদের

ছুঁতে পারবে। মানুষের এখন ধারণা হয়েছে, আইন সাধারণ মানুষদের জন্য, একবার তাদের ছুঁলে আর রেহাই নেই। ধারণাটা নিশ্চয়ই ঠিক নয়! কিন্তু বিবেকানন্দকাকুর ধারণাটা কি ঠিক হতে পারে? ওঁর মধ্যে যেন কোনো ধ্রুপদি ট্র্যাজিডির নায়ক কথা বলছে!

উনিই বললেন, 'কী? আমাকে ভিলেন মনে হচ্ছে? আমি তোমার সঙ্গে বন্ধুত্ব করব বলে আজ ডাকলাম, আর তুমি হয়তো আমাকে শয়তান ভাবলে!'

আমি অনিশ্চিতভাবে মাথা নাড়লাম, উত্তরটা যেন মুখে তৈরিই ছিল আমার, নিজেই জানতাম না, 'আপনি নিশ্চয়ই একটা আইডিয়াতে বিশ্বাস করেন। সেই আইডিয়ায় ওই দুটো শব্দের হয়তো কোনো অস্তিত্ব নেই।'

উনি খুশি হলেন, 'ঠিক বলেছ। আইডিয়া। জীবনটাকে মানুষের মতো কাটাতে হলে একজনের একটা আইডিয়া লাগে। একজন বুদ্ধিমান সচেতন মানুষ তার আইডিয়া নিয়ে চলে। ওই আইডিয়াই তাকেও বহন করে নিয়ে যায়।'

'কিন্তু কোথায় নিয়ে যায়?'

'হয়তো সফলতার দিকে। হয়তো ধ্বংসের দিকে। কিছু করার নেই।'

'একটা আইডিয়া নিয়ে কি সারাজীবন কাটিয়ে দেওয়া যায়? মানুষ তো বদলায়!'

'মানুষটার যদি পরিবর্তন হয়, সেটাও আইডিয়া অনুসারেই হয়। কারণ আইডিয়ারও বিবর্তন আছে। মিউটেশন আছে। ওই আইডিয়াই তার ঈশ্বর। ওই আইডিয়ার প্রতি অনুগত থাকাটাই আমার মনে হয় তার ধর্ম। এখানে তোমার ধর্ম নিয়ে যে ধারণা, তার সঙ্গে নিশ্চয়ই মিলল না?'

'কিছুটা হয়তো গীতার ধর্মের সঙ্গে মিলল। কৃষ্ণ এই ধর্মের কথাই বলেছিলেন। তবে বলেছিলেন সব ধর্ম পরিত্যাগ করে তাঁর শরণ নিতে।'

'কিছুটা মিললেও অনেকটা হয়তো মিলল না। আর, শরণ নেওয়ার ধাত আমার নয়। কিছু করার নেই। পৃথিবীতে কারও সঙ্গে না মিললেও আমি তো আমিই থাকব। যদি ভাবো আমি জীবনে প্রচুর সুখ আর টাকা পেতে চেয়েছি, তুমি কিন্তু পুরোপুরি ভুল ভাববে। আমি শুধু ভেবেছিলাম এই জীবন একটা গেম। একটা স্টিমুলেশন। আমি শুধু ঘুঁটিগুলোকে নিজের ইচ্ছা অনুসারে চালাতে চেয়েছি। এই রূপনগর শহরটা আপাতত আমার খেলার ছক। ময়দান। খুব বিরাট ছক আমার পছন্দ নয়।

আর, রাজু, তুমি যদি ভাবো বিবেকানন্দ বসাক রিপুর দাস, ভুল ভাববে। আমি খুব নিস্পৃহ একজন মানুষ।'

আমি নিজের ভিতরকার শয়তানটার কথা ভাবছিলাম। কাকুর এই কথায় সেটা নিশ্চয়ই খুব খুশি হয়েছে! তাই কথাগুলো আমারও এত ভালো লাগছে। চিন্তারই কেন দায় থাকবে বাস্তবের দিকে আসার! বাস্তবেরও কি দায় থাকে না একজন মানুষের চিন্তার মাপসই হয়ে ওঠার? নিজের ঊরুতে নখ বসালাম। তীব্র ব্যথা লাগল। দাঁতে দাঁত চেপে সেটা সহ্য করলাম, গ্রহণ করলাম।

'ডেমোক্রেসি হ্যাজ ফেইলড ইন আওয়ার কান্ট্রি। একটা ভুল সিস্টেমের মধ্যে আমাদের বাঁচতে হচ্ছে। আমি আমার মতো বাঁচছি। তোমাকে আমি কোনোরকম কৈফিয়ত দিচ্ছি না। অন্যের মুখ থেকে আমার সম্পর্কে অনেককিছুই শুনে থাকবে। যেমন তোমার পার্কের বন্ধুরা নিশ্চয়ই বলেছে?'

ওঁর গলায় কোনো বাঁকা সুর নেই। খুব সহজভাবেই কথা বলছেন।

'তাই আমি ভাবলাম আমার মুখ থেকেই তুমি শোনো। তোমার নিশ্চয়ই অনেক ক্ষোভ আছে ওই লোকটাকে, মানে রামাচল যাদবকে আমি কেন মারলাম! আমিই যে মেরেছি তা তুমি বুঝতে পেরেছ। ওকে আমি মারলাম কারণ একজন পুরুষমানুষ হয়েও সেদিন ও যখন সোনিয়াকে লাঞ্ছিত করছিল, তুমি নিজে ওকে মেরে ফেলতে পারোনি। যদি তুমিই সেদিন ওকে রাস্তার মধ্যেই মেরে ফেলতে, তোমার কেউ কিছু করতে পারত না, আমি যতক্ষণ আছি, আর তাহলে আমাকেও আর ওকে মারতে হত না। হত কি? ধরে নাও, তুমি মারোনি বলেই আমি ওকে মারলাম।'

উনি যে আমার দিকে তাকিয়ে আছেন, আমি চোখ না তুলেও বুঝতে পারলাম। প্রশ্নটা করে চুপ করে আছেন। উত্তর আশা করছেন কি?

আমি অস্ফুটে বললাম, 'সবাই তো সব কিছু পারে না কাকু! তা ছাড়া পুরুষ ব্যাপারটাকে আমি ওভাবে দেখি না।'

'সোনিয়ার গায়ে যে হাত দিয়েছে, তাকে বাঁচিয়ে রাখা কি চলে! শাস্তি দিতে হবে না তাকে?'

'কাউকে মেরে ফেলা তো কোনো শাস্তি নয় কাকু! মেরে ফেললে তো সেই লোকটাই আর থাকল না! তার অপরাধও আর থাকল না! লোকটা অনুশোচনার

কোনো সুযোগই পেল না। প্রতিহিংসা কখনও বিচারের জায়গা নিতে পারে না।'

'সেটা তোমার আইডিয়া। তুমি যে এ কথা বলতে পারছ, তার কারণ হয়তো এই যে, তুমি সোনিয়াকে যথেষ্ট ভালোবাসো না। তার সম্মান আজও তোমার সম্মান নয়। কিংবা, তুমিও খুব নিস্পৃহ মানুষ। কিন্তু ঠিক আমার মতো নও। নিজের পরিবারকে আমি খেলার অন্তর্গত করি না। তাহলে আজ তোমাকে এত কথা বলতাম না। আজ তোমাকেও আমি নিজের পরিবারের ছেলে ভাবি।'

'আমি সবাইকেই ভালোবাসি কাকু। সবাইকেই ভালোবাসতে চাই।'

'সবাইকে কেউ ভালোবাসতে পারে না রাজু। তুমি তো ধর্ম মানো! কৃষ্ণ বা যিশু বা গৌতম বুদ্ধও সেটা পারেননি। রামাচল যাদবকেও ভালোবাসতে চেয়েছ নাকি?'

'হ্যাঁ। চেয়েছি তো অবশ্যই! হয়তো পারিনি।'

আমরা দুজনেই চুপ।

'সোনিয়াকে কেমন ভালোবাসো? ওকে পেতে চাও জীবনে?'

আমি ঘেমে উঠলাম। উনি কি আজ আমাকে উলঙ্গ করে দেখার জন্য এ ঘরে ডেকেছেন?

'ওর সঙ্গে আলেফের শারীরিক সম্পর্ক আছে। জানো তো? জানো নিশ্চয়ই। অনেকেই জানে। আমি বাধা দিইনি। কেন দেব? আমি সোনিয়াকে পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছি। কেন ওর সুখের পথে বাধা হব? কেবল চাই ও বেঁচে থাক। আনন্দে থাক। আমার সঙ্গে থাক।'

বাইরে নিস্তব্ধ রাতকে চিরে একটা কুকুর ডাকতে শুরু করেছে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আরও কয়েকটা কুকুর তার সঙ্গে যোগ দিল। দূর থেকে একটা লরির হর্ন ভেসে এল। কুকুরগুলো সঙ্গে সঙ্গে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ডাকতে শুরু করল। এই শব্দগুলো রাতটাকে আরও বিরাট করে দেয়, যেন বাইরে একটা মহাবিশ্ব ছড়িয়ে আছে, বাইরে গেলেই হারিয়ে যাব।

'তোমার সঙ্গে সোনিয়া শারীরিক সম্পর্ক তৈরির চেষ্টা করেনি? তুমি নিজে যেচে যে তা করবে না, সেটা আমি বুঝি। কিন্তু তোমার প্রতি ওর মনোভাব কী? জানতে পেরেছ? জানতে চেয়েছ?'

আমি নিজেকে সামলে নিতে চাইলাম। আমার লজ্জা করছে না। কিন্তু উনি আমার সঙ্গে কী খেলা খেলছেন আজ? এতদিন আমার সঙ্গে কথা বলেননি, আজ সব কথা কি একসঙ্গেই বলবেন? কথার মধ্যে ন্যূনতম আড়াল রাখছেন না! কী করতে চাইছেন আমার সঙ্গে?

বললাম, 'একদিন মনে হয়েছিল ও দুর্বল হয়েছে। সেদিন আমার ঘরে এসেছিল। আমি এড়িয়ে গিয়েছিলাম।'

'দুর্বল! দুর্বল শব্দটা ব্যবহার করছ কেন বুঝলাম না। তা, কেন এড়িয়ে গিয়েছিলে? ভালো লাগে না ওকে?'

'খুব ভালো লাগে। কিন্তু নিজের শরীর নিয়ে আমার কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষা আছে কাকু।'

'মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীর মতো নাকি?'

এই কথাটাতেও বিদ্রুপ নেই। একটু অসহিষ্ণুতা আছে।

'বলা কঠিন। হয়তো আপনি বুঝবেন না।'

'বুঝব না? তুমি নিশ্চয়ই তলস্তয় পড়েছ? 'ফাদার সের্গেউস'? পড়েছ? একজন উলঙ্গ রমণীর সঙ্গে শোবেন না বলে ফাদার সের্গেয়ুস নিজের আঙুল কেটে ফেলেছিলেন, যাতে তাঁর যন্ত্রণা তাঁর কামপ্রবণতাকে মুছে দেয়। পড়েছ নিশ্চয়ই?'

'পড়েছি।'

'সুদীপা সান্যালের সঙ্গে তোমার কী? প্রেম? নাকি শুধুই বন্ধুত্ব?'

কাকু সুদীপাকে চেনেন! কেন চিনবেন না। এ শহরের প্রত্যেকটা গাছের প্রত্যেকটা পাতার খবর রাখেন উনি। তবু ওঁর প্রশ্নে কেমন যেন শিউরে উঠলাম। কোনো অমঙ্গল কি কোথাও ঘনিয়ে এসেছে? এই মানুষ এ শহরে যে-কোনো কিছু ঘটানোর ক্ষমতা রাখেন। এই পুরো রূপনগর লোকসভা এলাকাতেই ওঁর ইচ্ছেয় অনেক কিছু হয়।

বললাম, 'আমরা বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করি।'

'রাজনৈতিক বিষয়?'

'হ্যাঁ। রাজনীতি নিয়েও আলোচনা করি।'

'তুমিই তো সুদীপাকে বলেছ যে আলেফ রামাচলকে মেরেছে? কাজটা খুব ভুল করেছ। নিজেরও বিপদ বাড়িয়েছ।'

আমি কিছু বললাম না। কিন্তু কী বিপদ? আমি তো বিবেকানন্দ বসাকের বাড়িতে থাকি!

'আলেফ ওকে মারেনি। ও স্পটে ছিল। কিন্তু ও মারেনি। আলেফ ওভাবে কাজ করে না। শুধু শুধু তুমি ওর নামে একটা খবর ছড়িয়ে দিলে শহরে? এই যে তুমি ফেক নিউজের বিরোধী? নাকি বিশ্বাস করেছিলে সুদীপা কাউকে কথাটা বলবে না? আচ্ছা, তুমি কি কমিউনিস্ট? নাকি শুধুই তাদের প্রতি সহানুভূতিশীল? অবিশ্যি তাত্ত্বিক কমিউনিজম আর বাস্তবিক কমিউনিজমের মধ্যে যে বিস্তর ফারাক, সে তো কোনোকালে কোনো দেশেই মেটার নয়। তাই না?'

কী উত্তর দেব বুঝতে পারলাম না। কী উত্তর হয় এ কথার? তা ছাড়া এখন আমার ওঁর সঙ্গে তর্ক করতে ইচ্ছে করছে না।

'জানো কি সারা পৃথিবীতে সব মিলিয়ে ১০০ মিলিয়ন মানুষকে কমিউনিস্টরা খুন করেছে? তেমনই বলা হয়। কেউ বলে ১০ মিলিয়ন। আবার কেউ কেউ বলে ১৪৮ মিলিয়ন।'

আমি অস্ফুটে বললাম, 'প্রোপ্যাগান্ডার অনেক মুখ আর মুখোশ আছে। কোনটাকে বিশ্বাস করব, প্রায়ই বুঝতে পারি না।'

উনি বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে গেলেন। তারপর ধীরে ধীরে বললেন, 'তোমার বাবা চায় আমি তোমার ভার নিই। তোমাকে নিজের কাজের অংশ করে নিই। যাতে তুমি কাজ শিখতে পারো। জানি না, তোমার বাবা আমার কাজ সম্পর্কে কতটা জানে। জানাটাই স্বাভাবিক। মিডিয়ার দৌলতে আমার নাম তো এখন পশ্চিমবঙ্গে কুখ্যাত! শুনছি যে-কোনো মুহূর্তে ইডি আমাকে ডেকে পাঠাবে। সেটা সামলে নেওয়ার ক্ষমতা আছে আমার। কিন্তু, মুশকিল হল, তোমাকে কোন কাজে নেব আমি? তুমি তো এক আশ্চর্য ছেলে! যেন কোনো ক্ল্যাসিক উপন্যাসের পাতা থেকে নেমে এসেছ!'

কুকুরগুলো আর ডাকছে না। রাত আবার চুপ। হাওয়ায় জানলার পরদাগুলো দুলছে, খসখস শব্দ হচ্ছে। সাদা পরদাগুলো। লেসের কাজ আছে। পরদাগুলোকে

খুব সুন্দর লাগছে বাইরের অন্ধকার আর এই ঘরের আলোর মাঝখানে। যেন শিল্পের ধারণা। কোনো কারণ ছাড়াই আমার নিজের উপন্যাসটার কথা মনে পড়ল। কয়েকদিন কিছু লেখা হয়নি। এখন কি ওঁকে বলব সেটার কথা? বলব, আমি লেখক হতে চাই? একজনও যদি পাঠক না-ও জোটে আমার, তবুও আমি লেখক হতে চাই, বলব?

'আমার কিছু কারবার আছে এ শহরে। তোমাকে আমি নিতেই পারি সেগুলোয়। কিন্তু সেগুলো ঠিক আইনের আওতায় থেকে কাজ করার জায়গা নয়।'

'আমি আইন নিয়ে ভাবি না কাকু। আইন এ দেশের সাধারণ মানুষকে আদৌ আশ্রয় দেয় কি? কেবল তো ছলনা করে! যত দিন যাচ্ছে আইনের ওপর থেকে সাধারণ মানুষের আস্থা উঠে যাচ্ছে।'

'আমার একটা লজ আছে। প্যারাডাইস লজ। সেখানে তুমি কাজ করতেই পারো। ম্যানেজার বুড়ো হয়েছে। তোমাকে পেলে তারও সুবিধে হবে। কিছুদিন কাজটা বুঝে নিয়ে তুমিই চালাতে পারো লজটা। অবিশ্যি তোমাকে মোবাইল ব্যবহার করতে হবে। মোবাইল ছাড়া ও কাজ তুমি করতে পারবে না। ইন ফ্যাক্ট, কোনো কাজই করতে পারবে না। কিন্তু, একটা কথা, লজটায় শহরের ছেলেমেয়েরা সময় কাটাতে যায়। শহরের বাইরে থেকে মহিলা নিয়েও আসে কেউ কেউ। মধুচক্র বলতে পারো। আমি সেটার মধ্যে অনৈতিক কিছু দেখি না। কিন্তু তোমার হয়তো ওসবের মধ্যে নিজেকে অসুস্থ লাগবে।'

আমি মাথা নেড়ে বললাম, 'লাগবে না। আমি নৈতিকতা নিয়েও মাথা ঘামাই না। দুজন মানুষ যদি একটা ঘরে নিজেদের মধ্যে সময় কাটাতে যায়, সেখানে পুলিশের হাজির হওয়াটাই অস্বাভাবিক অত্যাচার। তাদের মধ্যে যদি টাকার ব্যাপার থাকে, তাহলেও সেটায় তৃতীয় কারও কিছু তো বলার থাকতে পারে না। বরং তাদের সুবিধা করে দেওয়া উচিত। মানুষ যদি বেশ্যালয়ে যেতে চায়, যাক! যদি জুয়া খেলতে চায় খেলুক! যদি নেশা করতে চায়, করুক! একজন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ সবরকম নেশা করুক, সবরকম পাপ চেখে দেখুক। পাপের বিরুদ্ধে আমার বলার কিছু নেই। কেউ তাকে বাধা দেবে কোন অধিকারে? যতক্ষণ না কোনোকিছু

সভ্যতার বিরুদ্ধে যাচ্ছে, অপরাধ হয়ে উঠছে, আমার মনে হয় না তা থেকে মানুষের কোনো ক্ষতি হতে পারে।'

'পাপ আর অপরাধ তোমার কাছে এক নয়?'

'পাপ ব্যক্তিগত। অপরাধ সামাজিক। অপরাধ সভ্যতার বিরুদ্ধে হয়।'

'সভ্যতা! সিভিলাইজেশন! যা কিনা নদীমাতৃকভাবে গড়ে উঠেছিল প্রাগৈতিহাসিক সময়ে। আজ সভ্যতার জন্য আর নদী লাগে না, তাই না?'

'না। দুজন মানুষের পারস্পরিক সম্মতিকে সম্মান করাই সভ্যতা। কেবল একজন মানুষ আরেকজন মানুষের বাঁচার ব্যাপারটায় হস্তক্ষেপ না করলেই হল। আমি হত্যার বিরুদ্ধে। পীড়নের বিরুদ্ধে। বঞ্চনার বিরুদ্ধে। যৌনতার বিরুদ্ধে নই। অন্যের প্রবৃত্তির সঙ্গে আমার কোনো যুদ্ধ নেই।'

'যেমন প্রকাশ্যে যৌনতা তুমি সমর্থন করো, তাই তো? বেশ। কী মানো না তাহলে?'

'যেমন শিক্ষকদের নিয়োগ কেলেঙ্কারি। আমি ওটাকে অপরাধ মনে করি। যোগ্যরা তাদের প্রাপ্য জীবিকা থেকে বঞ্চিত কেন হবে? যেমন ফুটপাত দখল। কেন মানুষকে রাস্তায় ঝুঁকি নিয়ে রাস্তায় হাঁটতে হবে? যেমন পাহাড় থেকে পাথর চুরি...'

উনি আমার চোখ থেকে চোখ সরিয়ে নিলেন। কিন্তু তারপরেই যেন ধুলো উড়িয়ে হেসে উঠলেন, 'অর্থাৎ বাঁচো, এবং বাঁচতে দাও? ঠিক। কেউ যদি কোকেন চালান দেয়, তোমার আপত্তি নেই। কিন্তু রাস্তার ধারের গাছ কাটা চলবে না। তাই তো? বেশ বেশ! অদ্ভুত খুবই। কিন্তু বেশ! তুমি তাহলে সোনিয়াকে ফিরিয়ে দিলে কেন? তোমার প্রতি তার আকর্ষণকে দুর্বলতা কেন বলছ?'

'কারণ, যেমন বললাম, নিজের শরীরের সঙ্গে আমার কিছু বোঝাপড়া আছে। হয়তো একদিন আমিও আমার শরীরকে স্বাধীনতা দেব। আর দুর্বলতা শব্দটা অভ্যেস থেকে বলে ফেলেছিলাম। হ্যাঁ, উচিত হয়নি।'

'বেশ। তুমি তাহলে লজটায় কিছু সময় দিয়ো। এখনই যেতে হবে এমন নয়। কিছুদিন ভেবে নিয়েই যাও। আমিও এরমধ্যে ম্যানেজারকে বলে রাখব।'

'আমি চেষ্টা করব মোবাইল ছাড়াই যাতে কাজটা করতে পারি।'

'বেশ। সেই চেষ্টাও করেই দ্যাখো। তুমিও একটা আইডিয়াকে আঁকড়ে ধরে আছ। একটা কথা বলি? শোনো, বাবা, জীবনের চেয়ে আইডিয়াকে বড়ো কোরো না। তাহলে ফিরে আসতে পারবে না কোথাও। ফেরার জায়গাটাই থাকবে না। তোমার বাপ চায় তুমি আমার সঙ্গেই থাকো। অনেকদিন থাকো। তেমনই একটা অলিখিত চুক্তি হয়েছে আমার সঙ্গে তার। কিন্তু এখন আমি চাই তুমি আমার সঙ্গেই থেকে যাও। কেমন যেন মনে হচ্ছে আমার নিয়তির একটা যোগ তৈরি হয়েছে তোমার সঙ্গে। প্রাচীন গ্রিকরা যেমন নিয়তিতে বিশ্বাস করত, আমিও করি। নিয়তি তো কোনো কুসংস্কার নয়। কারণ আমি কর্মে বিশ্বাস করি। কর্মফল কোনো দৈবী ধারণা নয়। আর... রাজু, বাবা... তুমি এ বাড়িতেই আজীবন থেকে যেতে পারো না? তুমি। আমি। সোনিয়া। আমি সোনিয়াকে বিয়ে করার প্রস্তাব দিচ্ছি না তোমাকে। সেটা এই মুহূর্তে আজগুবি শোনাবে। তুমি হয়তো অন্য কাউকে ভেবে রেখেছ। কিন্তু তোমাদের সঙ্গে আমি বাকি জীবনটা থাকতে চাই। তোমাদের দুজনের সঙ্গে।'

যেন চিনতে পারছি না ওঁকে! কী কোমল আকুল গলায় কথা বলছেন! গলার মধ্যে যেন অশ্রুত কান্না মিশে আছে! এই কি সেই মানুষ যিনি একজন লোককে গলা কেটে রাস্তায় ফেলে রাখতে পারেন! এ শহরের মাফিয়ারাজের ইনিই কি সেই সম্রাট! সারা শহরের ত্রাস!

আমার কাছে কী চাইছেন বিবেকানন্দ বসাক? আমার আর ওঁর মধ্যে কতগুলো মৃত নক্ষত্র তাদের ধুলো ছড়িয়ে রেখেছে?

সারারাত ঘুম এল না।

উপন্যাসিকাটা নিয়ে কাজ করলাম। শেষ হতেই যাচ্ছে এতদিনে। কিংবা, আমি শেষ করতে চাইছি এবার।

কিছু কি হচ্ছে আদৌ?

একজন আপাদমস্তক বিভ্রান্ত অপদার্থ মানুষের লেখা তো! যে কোকেন চালান দেওয়া লোকটাকে ক্ষমা করে দিতে পারে, কিন্তু ফুটপাত দখল করা প্রশাসককে নয়।

সুদীপার গলাটা যেন শুনতে পাচ্ছিলাম আমি, 'কী করে তুমি ওঁর অমন নোংরা একটা প্রস্তাবে রাজি হলে রাজুদা! তুমি কী? ছিঃ!'

বিবেকানন্দ বসাকের লজের দায়িত্ব নিলে জ্যোতির্ময় বারিকও কি আর আমার সঙ্গে কথা বলবেন! কিন্তু বাবা অবাক হয়ে যাবে— রাজুও তাহলে কোনোকিছুর দায়িত্ব নিতে পারে!

আলেফ আলি

১৩

একটা খুবসুরত খোয়াব দেখছিলাম। কিন্তু নিন্দ যখন ভাঙল, খোয়াবটা বিলকুল ভুলে মেরে দিলাম। কিছুতেই ইয়াদ করতে পারলাম না কী দেখছিলাম। এটা আমার বচপন থেকেই হয়। খোয়াব কিছুতেই ইয়াদ থাকে না। বুঢ়া খোয়াব যেমন ভুলে যাই, আচ্ছা খোয়াবও তাই। যখন খোয়াবগুলো দেখি, খেয়ালই থাকে না সেগুলোকে ইয়াদ রাখতে হবে, খেয়ালই থাকে না আমি নিন্দের মধ্যে আছি।

বিছানা থেকে উঠে আম্মির কাছে গেলাম। আম্মি উঠে পড়েছে অনেক আগেই। কাজের মেয়ে কুমকুম আপা মায়ের মুখ ধুইয়ে দিয়েছে। সকালের নাস্তাও হয়ে গেছে আম্মির। কুমকুম আপা আমার থেকে বয়সে একটু বড়ো হবে। ভোর থেকে রাত অবধি মায়ের কাছে থাকে। রাতে মা ঘুমের দাওয়াই খায়। সারারাত অঘোরে ঘুমোয়। রাতে আমি ফিরলে কুমকুম আপা বাড়ি চলে যায়। আম্মি এখন ছাদের দিকে চেয়ে আছে। ফ্যানটা ঘুরছে আওয়াজ করতে করতে। ক্যাঁচক্যাঁচ ক্যাঁচক্যাঁচ ক্যাঁচক্যাঁচ... শালা ওই ফ্যানটায় যেন কার জান আটকে আছে, এমনভাবে চেয়ে আছে আম্মি!

বললাম, 'আম্মি, তুমি এখনও খোয়াব দ্যাখো?'

আম্মি আমার দিকে তাকালই না। সেই একইভাবে ফ্যানটার দিকে চেয়ে আছে। আর ফ্যানটা ঘুরছে।

কুমকুম আপা বলল, 'কী গো, ছেলে যে কী জিজ্ঞেস করছে?'

আমি আম্মির পায়ে হাত রাখলাম। আম্মি কি আরও রোগা হয়ে গেছে এই কয়েকদিনে? যেন হাড়ের ছোঁয়া লাগল আমার হাতে! কী দেখছে আম্মি ফ্যানটার দিকে? যদি ওটায় কারও জান আটকেই থাকে, আম্মির ওভাবে চেয়ে থাকার কী আছে! এই ভূতুড়ে বাড়িটায় থাকতে থাকতে আম্মিও কেমন ভূতের মতো হয়ে

গেছে। এ বাড়িটাকে মহল্লার সবাই ভয় খায়। আব্বুর মুণ্ডুকাটা লাশ কি এ বাড়ির ছাদে ঘুরে বেড়ায় রাত হলে? আমি তো আজ অবধি দেখিনি।

সবাই তো আমাকেও ভয় খায়।

রামাচল যাদব কতল হওয়ার পর সবাই ধরে নিয়েছে আমিই মেরেছি ওকে। আগে যারা আমার সঙ্গে কথা বলত, আজকাল তাদেরও চোখে ডর লক্ষ্য করি আমি। ওরা জানে আমার হাতে ইনসানের খুন লেগে গেছে। আমি খুনের স্বাদ পাওয়া একটা শের। আমি আদমখোর বনে গেছি। আরও অনেকের জান নেব আমি এ শহরে, ওদের চিন্তা সেটাই। যতদিন না নিজেই কারও হাতে কতল হয়ে যাচ্ছি।

খোয়াবটা খুবসুরত ছিল। কেন যে ইয়াদ থাকে না!

সোনিয়া ছিল কি খোয়াবটায়? নাঙ্গা? কিছুই ইয়াদ নেই।

বিনোদ ঘোষাল আমাকেই বলেছিল, রামাচল যাদবের গলাটা কাটতে। সোনিয়াকে ছেড়ে আমি ফিরে না আসা অবধি ওরা অপেক্ষা করছিল। ততক্ষণে লোকটার জান প্রায় বেরিয়েই গেছে মারের চোটে। কিন্তু খতম করেনি ওরা। আমি আসতেই বিনোদ ঘোষাল হাসতে হাসতে আমার হাতে চাকুটা ধরিয়ে দিতে চাইল, 'নে হিরো। আজই বউনিটা সেরে ফ্যাল। তোর জীবনের পয়লা মার্ডারটা আমাদের সামনেই হোক। শুভকাজটায় সাক্ষী থাকি।'

কয়েকজন খিকখিক করে হাসল। হাসিটায় আমার মাথা গরম হতে পারত। সামলে নিলাম। একটু আগে সোনিয়ার সঙ্গে সেক্স করে আসছি। দিমাগ অন্যরকম হয়ে ছিল।

আমি চাকুটা সরিয়ে দিয়েছিলাম। বলেছিলাম, 'মালটাকে মারতে আমার চাকু লাগবে কেন? আমার পিস্তল আছে।'

'আওয়াজ হবে। এটা নে বাবা। গলাটা কুচ করে কেটে দে। মালটার হয়েই এসেছে। ও-ও রেহাই পাক।'

চাকুটা দারুণ! পুরো লকলক করছিল ফলাটা, কারও খুন মাখার জন্য! আমারও হাতটা চাইছিল ওটা নিতে। কিন্তু আমি মাথা নাড়লাম। জীবনের পহেলা মার্ডার অন্যের চাকুতে অন্যের কথায় করব কেন? যে কেউ-ই ওকে এখন মারতে পারে। বিনোদ আমার সঙ্গে দিল্লাগি করতে চাইছিল। আমাকে কি শালা বহেনচোদ বাচ্চা

পেয়েছিল নাকি! নাকি আমি কোনো পাতি মস্তান শালা! আমি আলেফ আলী। একদিন রূপনগরে একাই রাজ করব, ইনশাল্লা!

গলাটা শেষে বিনোদই কাটল। তার আগে নিজের পৈতেটা দেখিয়ে ইয়ার্কি মেরে বলছিল বামুনের হাতে মরছে যখন লোকটা সটান স্বর্গে যাবে। বিনোদ ছুরিটা চালানোর পরেই লোকটা আচমকা একটু 'আঁক' করেই থেমে গেল, তারপর কিছুক্ষণ যেন কাশার চেষ্টা করল, চোখ উলটে গেল, পা দুটো থরথর করে কাঁপল কিছুক্ষণ! এর আগে চোখের সামনে কাউকে ওভাবে মরতে দেখিনি। কিন্তু অবাক হয়ে দেখলাম, আমার ভালো বা খারাপ কিছুই লাগল না। যেন একটা মুরগিকে হালাল করা হল। তার বেশি কিছুই না। এই লোকটাই সোনিয়ার গায়ে হাত দিয়েছে, অথচ তখন আর গুস্সা হচ্ছিল না লোকটার ওপর। বরং কোনো কারণ ছাড়াই আব্বুর মুখটা মনে পড়ে গিয়েছিল। আব্বুর কাটা মুণ্ডুটার মুখ।

কিন্তু শহরে সবাই জেনেছে মালটাকে আমিই খালাস করেছি। আর এই খবরটা ছড়িয়েছে মাদারচোদ রাজু চৌধুরী। ও পার্কে বসে ওর পেয়ারের মালটাকে বলেছে আমি রামাচলকে মেরেছি। আর সে মাল খবরটা দিয়েছে নিজের লাল ঝান্ডা পার্টিকে। সেখান থেকে হিন্দুত্ববাদীরা... এখন খুল্লামখুল্লা আমার মুণ্ডু চাইছে। এ শহরে এমন বিপদ শালা আমার এর আগে হয়নি। রাতে বেরোতে হলে সাবধানে বেরোতে হচ্ছে শালা! যে কেউ মেরে দিতে পারে। সকলেই জানে এর পিছনে বিবেকানন্দ বসাক আছে। কিন্তু যত গুসসা আমার ওপর।

সোনিয়াও বলল, 'তুমিই সেদিন তাহলে ফিরে গিয়ে মার্ডারটা করলে?'

আমি ওর হাত ধরে বললাম, 'আল্লার কসম বলছি জান, আমি মারিনি। তুমি তোমার বাবাকে জিজ্ঞেস করো!'

সোনিয়া হাত ছাড়িয়ে নিল, 'বাপিকে জিজ্ঞেস করা যায় নাকি এটা!'

'বিশ্বাস করো জান, কাউকে যদি মারি, আমি ওভাবে মারব না। কোনো মরদ ওভাবে কোনো ইনসানকে কতল করে না।'

সোনিয়া শুধু বলেছিল, 'আবার সেই ওয়র্ডসগুলো বলছ! কতবার বলেছি আমার সঙ্গে বাংলায় কথা বলবে!'

বলেছিল। কিন্তু কথার মধ্যে কোনো জান ছিল না। সোনিয়া বিশ্বাস করেনি। আমি জানি ও বিশ্বাস করেনি। রামাচল যাদব সোনিয়ার গায়ে হাত দিয়েছিল। আমি তাকে হাতে পেয়েও নিজে মারব না, এটা ও মানতেই পারবে না। ও আমাকে এতটাই চেনে যে আমার সম্পর্কে ঝুটগুলোকেও ও সচ বলেই জানবে। আর শুধু সোনিয়া কেন, থানার বড়োবাবুও মজা করে বলল, 'কী আলেফবাবু, বউনিটা তাহলে করেই ফেললে? আমাদের ঝামেলাটা না বাড়ালেই চলছিল না তোমার! অবিশ্যি কত্তার ইচ্ছায় কম্মো, তুমিই আর কী করবে!' মানে মেরেছি আমিই, কিন্তু মারতে বলেছেন আংকল। খুব ভুল কি বলেছে বড়োবাবু? বিনোদ ঘোষাল তো আমার হাতেই চাকুটা দিচ্ছিল, আমি সেটা নিতেই পারতাম। খুনিদের সঙ্গেই ছিলাম, লোকটার মওতের দায় আমি কী করে এড়াব!

কিন্তু পুরো দায়টাই যেন আমার! কমিউনিস্টরা থানার সামনে ধরনায় বসতে গিয়েছিল— আমাকে কেন গিরেফতার করা হচ্ছে না! পুলিশ পাঁচ মিনিটের মধ্যে ওদের তুলে দিয়েছে। ওরা তখন আবার শহরে আমার নামে পোস্টারিং করেছে। আমি পাহাড় চোর! আমি মার্ডারার। আমারই তৈরি করা বাইক গ্রুপ আমাকে এড়িয়ে যাচ্ছে। আমাকে ছাড়াই তারা গত পরশু ওড়িশা ঘুরতে বেরিয়ে গেল। আমাকে খবরটাও দেয়নি।

এ শহরে আমি তো পুরো ইবলিশ বনে গেলাম!

বহেনচোদ রাজু! আমি পয়লা দিন থেকে জানি ও মালটা ডেঞ্জারাস।

তা ছাড়া ও সোনিয়ার সঙ্গে কী করছে, আমার হান্ড্রেড পার্সেন্ট সন্দেহ আছে। মালটাকে খালাস করে দিতে পারলে হয়। কিন্তু আংকল ওকে শেল্টার দিয়ে রেখেছেন। কী দেখেছেন ওর মধ্যে? একটা পাগলা! কিন্তু শালা সেয়ানা পাগলা! মালটাকে ভাগিয়ে কেন দিচ্ছেন না খোদাই জানে।

যাক গে! আজ না হোক কাল, কাউকে না কাউকে কতল তো আমাকে করতেই হবে। যে ধান্দায় আছি, অন্য কিছু হওয়ার নয়। লোকজন ভয় খেয়ে গেছে, সেটা আমার পক্ষে ভালোই। কিন্তু আমি নিজেও একটু ভয় খেয়ে আছি তা কোনো বেজন্মার বাচ্চা জানে না। এ শহর আমাকে ভয় খাচ্ছে, আর আমি ভয় খাচ্ছি এই মাদারচোদ শহরটাকে... কে কোথা থেকে একটা দানা ঝেড়ে দেবে পিঠে বা মাথায়,

আর শালা আলেফ আলী খতম! বিনোদ ঘোষালকে ঘিরে তার লোকজন থাকে, আর আমি তো শালা আকেলা!

আম্মি এখনও ফ্যানটা থেকে চোখ সরায়নি। পলকই পড়ছে না যেন। চোখের মধ্যে কোনো রোশনি নেই। মনে হয় কোনো মুর্দার চোখ। এমন করে আর কতদিন বাঁচবে আম্মি! কবে আর আম্মিকে হায়দরাবাদ নিয়ে যাব আমি? কেন নিয়ে যাচ্ছি না? অন্দর থেকে কি আম্মি মরে যাক চাইছি? মাঝেমধ্যে নিজেরই নিজেকে সন্দেহ হয়। লোকে আমাকে যতটা খারাপ ভাবে, আমি নিজে হয়তো তার চেয়েও বুড়া আদমি একজন। আমি আব্বুর ভয়ানক মওত দেখে কাঁদিনি। আমার আম্মি এখন মওতের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, মাথা খারাব হয়ে গেছে পুরোপুরি আম্মির, আমি কিছুই করছি না। কয়ামতের দিন আব্বু আর আম্মির মুখোমুখি কি আমি দাঁড়াতে পারব? আমি জানি না কয়ামত কোনোদিন আসবে কিনা। লেকিন আমি সেই দিনটার জন্য তৈয়ার নই।

গতকাল থেকে আলমের কোনো পাত্তা নেই। ফোন করলেও সুইচড অফ বলছে। শালা গেল কোথায়! এদিকে কাজকাম সব বন্ধ। দিনটা কাটাব কী করে খুঁজে পাই না। দিনেরবেলায় শরাব পান করার অভ্যাসটাও আমি আজও করিনি।

আংকলের কাছেই গেলাম। আংকলের কাছে এখন আমি ঘনঘনই যাই। আমার সঙ্গে ওঁর যে-কোনো দূরও নেই, এটা শহরের লোকগুলোকে ভালো করে সমঝে দেওয়ার দরকার আছে। কেউ কেউ ভাবতে পারে সেটা। সেটা একবার রটে গেলে জগন্নাথ গোস্বামীর লোকেদের বুকের পাটা চওড়া হয়ে যাবে। ওদের হিম্মত বাড়ানো যাবে না কিছুতেই।

তা ছাড়া, যদি সোনিয়াকে পাওয়ার একটা সুযোগ হয়...

আংকলের আড্ডায় লোক তেমন নেই। আংকলের কাছে আসতেও কি লোকেরা ভয় পাচ্ছে নাকি?

রাজু চুপচাপ বসে আছে। আমাকে দেখে হাসল। আমি দেখেও দেখলাম না। কিন্তু ওই দুটো চোখ... কী যেন আছে... যেন দুটো মাছ... এই ঘরের হাওয়ায় ভেসে বেড়াচ্ছে... পুচ্ছ... কানকো... আঁশ... কোনোদিন যদি রাজুকে কতল করতে হয়, আমি আগে ওর চোখদুটো ঢেকে দেব, নাহলে পারব না মারতে।

আমাকে দেখতে পেয়েই আংকল ইশারায় বসতে বললেন। বসলাম। একটু বসে তারপর সোনিয়ার খোঁজে যাব। একটু আগে মেসেজ করেছে। ও ঘরেই আছে।

সুভাষচন্দ্র মণ্ডল বলছিলেন, 'কেউ কেউ বলছে আমাদের সরকার এই যে ভাতার ওপর নির্ভর করে দেশ চালাচ্ছে সেটা নাকি অনৈতিক। সেটা নাকি ভিক্ষা। আরে বাবা, কমিউনিস্টদের আমলেও তো বেকার ভাতা ছিল, ফাউলাই ভাতা ছিল, বিধবা ভাতা ছিল, সেগুলো তাহলে ভিক্ষা ছিল?'

আংকল মাথা নেড়ে বললেন, 'যাদের বলার কিছু নেই, তাদেরও তো কিছু বলতে হবে তাই না? এসব উলটো-পালটা কথা জনগণ ভালোভাবে নেয় না, এটাই কমিউনিস্টরা বুঝতে পারছে না। তার ফলেই আজ ওরা বিধানসভা লোকসভা মিলিয়েও একটা আসনেও জিততে পারেনি। ওরা এখন শূন্য। এর বেশি ওদের নিয়ে কিছু বলার নেই। বললেই ওরা বরং গুরুত্ব পেয়ে যাবে।'

'সরকারি ভাতাকে ভিক্ষা বলে ওরা মানুষকে কতখানি অপমান করছে একবার ভাবুন!'

আংকল মাথা নেড়ে বললেন, 'অমর্ত্য সেন আমাদের সরকারের ভাতা দেওয়ার পলিসিকে স্বাগত জানিয়েছেন, সেটা জানেন তো? অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুয়োর ইকনমিক্স মনে রাখতে হবে। মনে রাখতে হবে রঘুরাম রাজনের কথাও। ভাতা উন্নত দেশগুলোও দেয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে আমেরিকায় একদল শ্রমিককে মাটি কাটার জন্য টাকা দেওয়া হত, আবার আরেকদল শ্রমিক সেই গর্ত ভরাট করত এবং সেটার জন্য টাকা পেত। ভাতা আর মানুষের রোজগারকে নিজেদের মধ্যে লড়িয়ে দেওয়ার কোনো দরকার নেই।'

রাজু হঠাৎ বলল, 'ভাতা দেওয়ার মধ্যে আমি খারাপ কিছু দেখি না কাকু।'

আমি মনে মনে বললাম— তাহলে তো আজ আংকলের কপাল ভালো।

রাজু আবার বলল, 'এ রাজ্যে মাসে হাজার টাকা ভাতা পেলে অনেক মানুষ বেঁচে যায়। যে লোকটার জঙ্গলে শুকনো পাতা কুড়িয়ে দিন চলে, সারাদিন সেটার জন্য তাকে অমানুষিক খাটতে হয়, হাতির ভয়, সাপের ভয়, ভাল্লুকের ভয়, তবু ছেলেমেয়ের মুখে খাবার তুলে দিতে পারে না, সে যদি মাসের শেষে হাজার টাকা পায়, আর রেশনে বিনেপয়সায় চাল-ডাল-তেল পায়, সে তো সরকারকে দু-হাত

তুলে আশীর্বাদ করবেই! সে আর কী চায়? দেশ রসাতলে গেলেও এই সরকার তার কাছে ভগবান। দেশ কোথায় যাচ্ছে সে নিয়ে নিম্নবর্গ মাথাই ঘামায় না। আর তারাই মেজরিটি এ দেশে। ভাতার বিরুদ্ধে বলার আগে, ভাতাকে ভিক্ষা বলার আগে, এই রাষ্ট্রে নাগরিকত্বের স্বরূপ বুঝতে হবে।'

কাকু খুশ হয়েছেন। হাসিমুখে মাথা নাড়ছেন।

'কিন্তু,' রাজু বলল, 'কাজের সুযোগও তো পাশাপাশি সৃষ্টি করতে হবে! জনসংখ্যার সঙ্গে তাল মেলাতে না পারা যাক, শিল্পায়ন ঘটাতেই হবে, কর্মসংস্থান করতেই হবে। সেদিকে কি আপনাদের সরকারের সদিচ্ছা আদৌ দেখা যাচ্ছে? মধ্যবিত্তের রুজির লড়াই কিন্তু কোথাও থেমে আছে। নিম্নবর্গের মানুষরা রাজনীতি নিয়ে কথা বলে না। তারা কেবল ভোট দেয়। মধ্যবিত্তরাই রাজনীতি নিয়ে কথা বলে এ দেশে। তাদের ক্ষোভের কী হবে? ভাতা একটা অন্তর্বর্তী পদক্ষেপ, কোনো স্থায়ী সমাধান তো নয়! ওই পাতা কুড়োনো লোকটা কোনো কাজ কেন পাবে না, বলুন তো কাকু? সে তো পরিশ্রমী মানুষ! সে শ্রম ছাড়া কিছু বোঝেই না। ইউরোপের দেশগুলোতেও ভাতা দেওয়া হয়, কিন্তু তার আগে প্রমাণ করতে হয় যে, ভাতা পাওয়ার জন্য লোকটা যোগ্য, কারণ সে কাজ করতে চায়, আর সেই দক্ষতাও তার আছে, কিন্তু সে কাজ পাচ্ছে না, তাই রাষ্ট্র সাময়িকভাবে হলেও তার ভার নিতে বাধ্য।'

কাকু চুপ করে গেছেন। মুখটা কালো দেখাচ্ছে। ঘরে লোক কম, কিন্তু যাঁরা আছেন তাঁদের সামনে রাজু আংকলকে অপমানই করছে, তাঁর ওপর এভাবে কথা বলার হিম্মত এ শহরে কারও নেই, এটা কি বোঝে না ও? নাকি বুঝেশুনেই করছে? শালা হারামিটা যে থালায় খায় সেই থালাতেই ছেদ করে। এজন্যই ওর বাপ ওকে তাড়িয়েছে।

আমি আর সইতে পারলাম না।

উঠে পড়লাম। ঘর থেকে বেরিয়ে এদিক-ওদিক দেখলাম। কেউ নেই। আস্তে আস্তে সোনিয়ার ঘরে গেলাম। ও জানত আমি আসব। দরজায় ছিটকানি দেয়নি।

আগে আমাকে দেখলে সোনিয়ার সারা মুখে রোশনি ফুটে উঠত। ছুটে এসে জড়িয়ে ধরত আমাকে। আজকাল সেটা করে না। রামাচল যাদবের মওতের দিন

সেই যে আমার সঙ্গে শুয়েছিল, তারপর থেকে কেমন যেন ঠান্ডা মেরে গেছে সোনিয়া। শুধু কি আমার সঙ্গেই সেটা? নাকি ও বদলে যাচ্ছে? ইনসান বদলে যেতেই পারে। বিশেষ করে আউরত জাতকে কেউ বুঝতে উঠতে পারে না। কিন্তু আমার কেমন সন্দেহ হয় ও আজকাল রাজুর সঙ্গে ভিড়েছে। আমি কি পুরোনো হয়ে গেলাম! আউরত জাতকে ভরসা নেই। মগর ওই পাগলাটাকে দিয়ে যদি চুত মারায়, আল্লা কসম, জান নিয়ে নেব। দুটোরই। নিজের জান দিয়েও দেব। বেঁচে থেকে আর লাভ নেই শালা!

আমিই জড়িয়ে ধরলাম। চুমু খেলাম। দু-হাত দিয়ে পাছাদুটোকে ডলতে ডলতে ওর চোখের দিকে তাকালাম।

বদলে গেছে। ঢের বদলে গেছে! আগে হলে এতক্ষণে ও আমাকে বিছানায় টেনে নিয়ে যেত।

দাঁতে দাঁত ঘসছিলাম। তবু যতটা পারি নরম আওয়াজে জিজ্ঞেস করলাম, 'কী হয়েছে জান?'

তখনই দরজায় কে যেন নক করল। তিনবার।

সোনিয়া আমার শরীর থেকে ছিটকে গেল। তারপর নিজেকে সামলে নিয়ে দরজা খুলল।

কেউ নেই।

আমার মাথায় আগুন চড়ে গেল। একটাই নাম আমার মাথায় এলো। সারা পৃথিবীর মধ্যে একটাই নাম। আর কেউ হতে পারে না। জিজ্ঞেস করলাম, 'রাজু করল এটা? মেরে দেব ওকে আমি আজ শালা!'

সোনিয়া অবাক হয়ে বলল, 'রাজু কেন করবে? ও তো বাপির ঘরে!'

'নাহলে? কোন শালার এত হিম্মত?'

'হয়তো ভূত।' কেমন অদ্ভুত গলায় সোনিয়া বলল, 'তোমরা তো মানুষ মেরেছ বেশ কিছু! তারা হয়তো মাঝেমধ্যে এসে দাঁড়ায়। এ বাড়িতে এমন হয়। আমি অনেক দেখেছি। নিজের থেকে দরজা বন্ধ হয়ে যায়। আলো নিভে যায়। বাসন পড়ে যায়। শুধু কি তোমার বাড়িই ভূতুড়ে নাকি আলেফ? এ বাড়িটাতেও অনেক কিছু হয়।'

'আগে বলোনি তো!'

আমার ফোন বেজে উঠল। রিং হয়ে হয়ে কেটে গেল। ধরলাম না। সোজা তাকিয়ে রইলাম ওর চোখের দিকে। আমি নিশ্চিত ওটা রাজু ছিল। সোনিয়া মালটাকে বাঁচাচ্ছে। সোনিয়া আমার চোখের দিকে তাকাচ্ছিল না। অন্যদিকে তাকিয়ে আছে। দেখে মনে হচ্ছে যে-কোনো সময় কেঁদে ফেলবে। মেয়েছেলের কান্না আমার সহ্য হয় না। যখন ওদের কিছু বলার থাকে না, করার থাকে না, ওরা কাঁদে। আখরি ওয়েপন।

আবার ফোন বাজল।

ইচ্ছে করছিল ফোনটা ভেঙে দিই। তবু ধরে বললাম, 'কী বে?'

'আলেফদা, জলদি এসো। রেলকলোনির কাছে আলমকে পাওয়া গেছে। ওকে মেরে দিয়েছে!'

আব্বুর লাশ দেখার পর থেকে আর কোনো লাশ দেখে আমার খারাপ লাগে না। আমার ভিতরে কিছুই হয় না কারও মওত হলে। মওত আমার কাছে এখন খুব সস্তা একটা ব্যাপার, যেটার জন্য খুব কিছু দাম দিতে হয় না। কিন্তু আলমের ল্যাংটো লাশ আমাকে কাঁপিয়ে দিল।

এত যন্ত্রণা দিয়ে মানুষকে মারতে হয়!

চেনাই যাচ্ছে না ওকে! সারা গায়ে মারের দাগ। মুখটা থেঁতলে দিয়েছে। ডান হাতের দুটো আঙুল কাটা। নাক কাটা। কান কাটা। চোখের মধ্যে কিছু ঢুকিয়ে গেলে দেওয়া হয়েছে। চুল দেখে শুধু বুঝতে পারলাম ওটা সচমুচ আলমের বডি। গলা কেটেই মেরেছে। কিন্তু গলার নলিটা কাটার আগে অবধি আলম কি জিন্দা ছিল? এত অত্যাচার সহ্য করতে পারে কোনো আদমি!

আমার পায়ের তলায় মনে হচ্ছিল অনেকটা মাটি নেই।

এ শহরে আজ আমি পুরো আকেলা হয়ে গেলাম।

১৪

'ভাইসব, আমাদের যদি ওরা মানুষ ভাবত, তাহলে আলমকে ওভাবে মারতে পারত না। কারণ হত্যার সময়েও মানুষকে তার প্রাপ্য মর্যাদা দিতে হয়। মৃতদেহকে

সম্মান করতে হয় ভাই। শত্রুরাও সেটা দেখায়। আলমকে কিন্তু সেই সম্মান দেওয়া হয়নি। এর জবাব আমরা দেব না? এ কোনো প্রতিশোধের প্রশ্ন নয় ভাইসব। আল্লা জানেন, রামাচল যাদবকে আমরা মুসলমানরা মারিনি। ওরাই তাকে মেরেছিল। একজন হিন্দুর মৃত্যুতে আমাদের অপরাধী করার জন্য। এই শান্তিপূর্ণ শহরে সাম্প্রদায়িক হিংসার আগুন জ্বালানোর জন্য। ওরা আলম ভাইকে আজ যেভাবে মারল, জানোয়ারকেও কি মানুষ ওভাবে মারে? একবার ভেবে দেখুন ভাইসব, কী দিচ্ছে আজ এই রাষ্ট্র আমাদের? এই অপমান? এই খুন? নেতাদের চোখে আমরা আজ শুধুই ভোটার। ভোট পাওয়ার জন্য আমাদের নাকি তোষণ করা হয়? আমরা নাকি সরকারের দুধেল গাই! সত্যিই কি তাই? তাহলে কেন সব জায়গায় বুঝিয়ে দেওয়া হয় আমরা সংখ্যালঘু? কেন বুঝিয়ে দেওয়া হয় আমাদের এ দেশে থাকার কথা নয়, পাকিস্তানে বা বাংলাদেশে চলে যাওয়ার কথা ছিল আমাদের? সরকার আমাদের বোকা বানাতে চায়। বিরোধীপক্ষও আমাদের বোকা বানাতে চায়। এ চায় ভাতা দিয়ে আমাদের হাতের মুঠোয় নিতে। সে বলে ভাত দেব। কোনো রাজনৈতিক দলকেই বিশ্বাস করা যাবে না ভাইসব। বিশ্বাস করলে কী হয়, চোখের সামনে ওই শুয়ে আছে আলম ভাইয়ের লাশ, নিজেরাই বুঝে নিন। মুসলিম পরিচয় দিলে আজও একজন এ দেশে বাড়ি ভাড়া পায় না। জানেন, আমার এক খালাতো ভাইকে কলকাতায় হিন্দু এলাকায় থাকার জন্য নিজের নাম বদলাতে হয়েছিল, দাড়ি কাটতে হয়েছিল। তারপরও একদিন বাড়িওলা তার আধার কার্ড দেখতে চাইল। কুকুরের মতো দূর দূর করে তাড়িয়ে দিল। ভাবুন ভাইসব, নিজেরই দেশে একজনকে ছদ্ম পরিচয় নিয়ে, নিজের ধর্ম লুকিয়ে, ইমানের সঙ্গে সমঝোতা করে কখন বেঁচে থাকতে হয়? ভাবতে পারেন ভাইসব? এই দেশ কি তারপরও সত্যিই আমাদের? কী বলবেন আপনারা?'

ভিড় চিৎকার করছে। তৌহিদুল ইসলাম একটু চুপ করল। হয়তো হাঁপিয়ে গেছে। এই আদমি লেখাপড়া করেছে। কোরান শরিফের যে-কোনো জায়গা থেকে মুখস্থ বলতে পারে। হাদিশও সব মুখস্থ। ইচ্ছে করলে ডিগ্রির জোরে নোকরিও করতে পারত। কিন্তু সেসবের দিকে না গিয়ে এই শহরেই থেকে গেছে। বিভিন্ন জলসায় একে এখন দেখা যায়। প্রচুর চিৎকার করে। হরওয়ক্ত যেন লড়াইয়ের জন্য তৈয়ার!

হুজুরদের সঙ্গে খুব খাতির। এ শহরের মুসলমানদের চোখের তারা হয়ে উঠছে এই তৌহিদুল। তার কথাতেই আজকাল দিন-রাত হয় অনেকের। তবে কিছুদিন আগে একটা জলসায় ওয়াজ করতে গিয়ে বলেছে, 'নিজের বউকে লেখাপড়া করানো মানে নিজের স্ত্রীকে আপনার চেয়ে যোগ্য ব্যক্তির সঙ্গে সম্পর্ক করার সুযোগ করে দেওয়া।' ওয়াজটা কেউ ইউটিউবে আপলোড করে দেয়। তারপর সারা পশ্চিমবঙ্গে ওকে নিয়ে হাসাহাসি হয়েছে।

আমার এই আদমিকে একটু সন্দেহ হয়। আমার সঙ্গে কথা বলার সময় আঁখ মেলায় না। যেন কিছু লুকোনোর আছে আমার থেকে ওর। আমাকে সহ্য করতে পারে না।

পোস্টমর্টেমের পরে আলমকে মসজিদের চত্বরে আনা হয়েছে। একটু পরেই গোর দেওয়া হবে। প্রায় পাঁচশো লোকের জমায়েত হয়েছে। আলমকে শোয়ানো হয়েছে মাঝখানে। আলমকে ঘিরে অনেকে বসেছে। কেউ কেউ উত্তেজনায় দাঁড়িয়ে আছে। আমিও একটু দূরে দাঁড়িয়েছিলাম। একটা সিগারেট টানতে খুব ইচ্ছা করছিল। সিগারেট আমি খাই খুব কম। এখন ইচ্ছে করছিল।

আলমের মাথার কাছে ইমামসাহেব একটা চেয়ারে বসে আছেন। তাঁকে ঘিরে আছে কিছু লোক। তিনি মাথা নীচু করে আছেন। হয়তো কাঁদছেন। কিংবা কান্না সামলাচ্ছেন। এই বয়সে এই সদমা ইমামসাহেব কি সামলাতে পারবেন?

আলমকে ঢেকে রাখা সাদা কাফনটায় রক্তের ছোপগুলো সাফ ফুটে উঠেছে। তাকাতে পারছি না। বুকের মধ্যে গলার ভিতরে কেমন অসুবিধা হচ্ছে দেখলেই। সাদা কাফন কেন দিয়েছে! কালা কাফন দেওয়া উচিত ছিল। কালা রং আলমের পসন্দিতা ছিল।

মঞ্জুরুল আজিম উঠে দাঁড়াল। এর উমর খুব জিয়াদা নয়। কিছুদিন আগেই রূপনগর কলেজ থেকে পাশ করেছে। এখন কীসব লেখালেখি করে। কলকাতার কাগজে সেসব লেখা বেরোয়। ফেসবুকেও লেখে। প্রচুর লাইক পায়। কিন্তু আমি কোনোদিন পড়ে দেখিনি। মঞ্জুরুল একটু কেশে নিয়ে বলল, 'আজ আমরা সবাই এখানে সমবেত। ভাইসকল, প্রথমেই বলতে চাই, বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের পরিস্থিতি আর এই পশ্চিমবঙ্গের মুসলিমদের পরিস্থিতি এক নয়। মুসলিম পদবি

নিয়ে জন্ম নিলেই এখানে সন্দেহের চোখে দেখা হয়। মুসলিম মানেই যেন বাংলা জানে না। আর যদি সে বাংলা ভালো বলতে পারে, তাহলে ধরে নেওয়া হয় সে বাংলাদেশ থেকে এসেছে। বাসের মধ্যে ট্রেনের মধ্যে পানি চাইতে পারি না আমরা, জল চাইতে হয়। একবার মুসলিম পরিচয় ফাঁস হয়ে গেলেই ভিড়ের মধ্যে আমরা অসহায় হয়ে পড়ি। আমাদের সব কিছুকেই তখন সন্দেহের চোখে দেখা হবে। যেন আমরা জন্ম-অপরাধী! আপনারা কি জানেন শুধুমাত্র মুসলিম পরিচয়ের কারণে খোদ কলকাতায় কাজের জায়গাগুলোতে হিন্দু সহকর্মীদের মধ্যে একজন মুসলিমকে কতখানি অপমানের সম্মুখীন হতে হয়? সেই হিন্দুরা সবাই ভদ্র, শিক্ষিত, সংস্কৃতিবান পরিবার থেকেই অথচ এসেছে। কিন্তু তাদের এই মানসিকতা! হয়তো আত্মহত্যা করতে ইচ্ছে করে তখন এক মুসলিম যুবকের। এই আমাদের অবস্থা দাঁড়িয়েছে আজ। আজ আমাদের ঠিক করতে হবে আমাদের সামনে কর্তব্য কী। আমরা এ শহরেও শান্তিতেই বাস করতে চাই। আগুন জ্বালাতে চাই না। কিন্তু আমাদের প্রতি তাদেরও কিছু দায়িত্ব আছে। তাদের তো ভুলে গেলে চলবে না আমরা তাদের প্রতিবেশী। না না, প্রতিবেশী কেন, আমরা তাদের ভাই। ভাই যখন ভাইয়ের রক্ত চায়...'

ভিড়ের মধ্যে থেকে চেঁচিয়ে উঠল একজন, 'কিছু ভাই-টাই নয়! খুন দিয়েই তাদের হিসেব বুঝিয়ে দিতে হবে!'

'হিন্দুরা কবে থেকে আমাদের ভাই হল? ঘেন্না করে তারা আমাদের!'

'তুমি বোসো। এসব ভারী ভারী কথা শুনতে চাই না। তৌহিদুল ভাইকে বলতে দাও!'

'ডরপোক কোথাকার! তত্ত্বকথা শোনাতে এসেছে এ সময়ে!'

'তৌহিদুল ভাই!'

'তৌহিদুল, বলো!'

অনেকগুলো হাতিয়ার হাওয়ায় নাচতে থাকল। যারা এসেছে প্রায় সবাই সঙ্গে কোনো না কোনো হাতিয়ার এনেছে। শাম হতে চলেছে। ডুবতে থাকা সূর্যের আলোয় হাতিয়ারগুলোকে এখনই লাল দেখাচ্ছে। ঘাবড়ে গিয়ে মঞ্জুরুল বসে পড়ল। ঠিকই আছে। কীসব বলে গেল বোঝাই গেল না। আমি নিজেও তো বাংলা জেনেও

বাংলা বলি না। এটা আমার একটা ফয়সালা। চাইলেই নিখুঁত বাংলা বলতে পারি। কিন্তু বলব না। এ শহরে বাকি সব মুসলিম বাংলাই বলে পুরোপুরি। আমি একা। ঠিক হ্যায়। একাই সই।

কিন্তু আজ কিছু হবেই। আমি বুঝলাম, রূপনগরে আজই কিছু হতে চলেছে। আমার দিকে যে চোখগুলো মাঝেমাঝে ফিরছে, সেগুলোয় প্রচুর গুসসা। গুসসাটা আমার ওপর, না হিন্দুদের ওপর, বুঝতে পারছি না। আমার সঙ্গেও হাতিয়ার আছে। কিন্তু এই ভিড় শেষ অবধি কোন চেহারা নেবে, সমঝে উঠতে পারছি না।

তৌহিদুল আবার উঠে দাঁড়িয়েছে, 'হ্যাঁ ভাইসব, ইমামসাহেবের ভাতিজার মৃত্যুর হিসেব অবশ্যই আমাদের নিতে হবে। এই মাটিতে দাঁড়িয়ে আজ শপথ করতে হবে শোধ আমরা নেব। এ কোনো সাধারণ মৃত্যু নয়। রূপনগর শহরে আরও যেসব হত্যা হয়, এ মৃত্যুকে সেগুলোর সঙ্গে গুলিয়ে ফেললে চলবে না। এ মৃত্যু এক সাম্প্রদায়িক হত্যাকাণ্ড। ওরা এই ঘটনা ঘটিয়েছে আমাদের উত্তেজিত করার জন্য...'

ভিড় থেকে চিৎকার এল, 'ওরা কারা? সেটা স্পষ্ট করে বলো তৌহিদুল ভাই!'

'স্পষ্ট করে কথা বলতে কীসের অসুবিধা তোমার? এখানে তো বাইরের কেউ নেই! বলো ওরা কারা! কারা আমাদের খুন চায়!'

'বলো কারা মেরেছে আলম ভাইকে!'

'বলো! বলো! তৌহিদুল!'

'নাম বলো তাদের!'

'আল্লা কসম! বাইরের কেউ নাক গলাতে এলে খুন হয়ে যাবে এখানেই।'

সমস্বরে শোনা গেল, 'হ্যাঁ হ্যাঁ... খুন হয়ে যাবে। কেটে লাশ ফেলে দেব এখানে...'

হাতিয়ারগুলো নাচছে। যেন এখনই খুন মাখতে চাইছে সেগুলো। একটা গাড়িতে অল্প কিছু পুলিশ এসেছিল। ফিরে যেতে বাধ্য হয়েছে। কী করবে পুলিশ? এই জমায়েতে কিছু করতে এলে জিন্দা ফিরে যেত না। ওপর থেকে নিশ্চয়ই চুপ থাকার অর্ডার এসেছে।

মিডিয়াকেও আসতে দেয়নি তৌহিদুল। মিডিয়া অনেক দূরে অপেক্ষা করছে।

হিন্দুদের মহল্লাতেও এতক্ষণে অস্ত্র তৈরি হয়ে গেছে। কমলা পতাকায় হিন্দু মহল্লাগুলো ছেয়ে গেছে আজ সকাল থেকে। কান পাতলেই 'জয় শ্রীরাম' শোনা যাচ্ছে। শুনছি হিন্দুত্ববাদীরাও বাইরে থেকে প্রচুর অস্ত্র এনেছে। আজ এই শহরে খুন নিয়ে হোলি খেলা হবে। আজ বেশ কিছু জান যাবে। আমি বুঝতে পারছি দু-পক্ষই অপেক্ষা করছে কখন অন্যপক্ষ হামলাটা করবে। একসময় সেই অপেক্ষাটা ফুরিয়ে যাবে। কোনো একজন ধৈর্য হারিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়বে। কাটাকাটি শুরু হয়ে যাবে। আমি সেই বচপন থেকে এ শহরে আছি, এ শহরের জলহাওয়া খেয়ে বড়ো হয়েছি, এমন দেখছি এই প্রথম।

এসবের মধ্যে ঢোকা আমার কি ভালো হবে? একটু আগে তৌহিদুলের সামনে পড়েছিলাম। আমি হাসলাম। ও মুখ ফিরিয়ে নিল। আমিও ঘাঁটাইনি। এই যে এখানে দাঁড়িয়ে আছি এতক্ষণ, কেউ এগিয়ে এসে আমার সঙ্গে একটাও কথা বলেনি। আমাকে এরা এখানে চায় না। আমি আগ বাড়িয়ে কেন যাব! আলমের মওতের শোধ আমারও নেওয়ার আছে। কিন্তু এসব আমার স্টাইল নয়। আমি দূর থেকেই দেখব। আমাকেও কেউ ঘাঁটাতে আসবে না, জানি।

আলমের মওতকে তৌহিদুল ইসলাম নিজের পলিটিকস চমকানোর জন্য ব্যবহার করছে। আমি সাফ বুঝতে পারছি। মঞ্জুরুলের মতো নওজোয়ানও আজ ক্ষীর খেতে চাইছে। তৌহিদুলের সঙ্গে মঞ্জুরুল পারবে না। বুঝতে পারছি আজকের পর থেকে এ শহরে তৌহিদুল একটা মস্ত ব্যাপার হয়ে যাবে। তার কথার দাম অনেক বেড়ে যাবে। তৌহিদুল এতদিন এমন একটা ঘটনার অপেক্ষাতেই ছিল। আজ সুযোগটা পেয়েছে। হাত থেকে যেতে দেবে না কিছুতেই। কিন্তু এই ভিড় মাদারচোদ কী বেওকুফ! একটা লোক বুদ্ধি খাটিয়ে পাঁচশো লোককে ব্যবহার করে নিচ্ছে, চোখের সামনে, শালা, কেউ বুঝতেও পারছে না!

আলম শুয়ে আছে। আজ যদি আলমটা আমার পাশে জিন্দা থাকত!

এসব রাজুর জন্য! শুয়ার কি আওলাদটা যদি না ওই রেন্ডিটাকে বলত... হয়তো আলম আজ জিন্দা থাকত। এরপরেও কি আংকল বুঝবেন না? ওকে তাড়াবেন না রূপনগর থেকে?

আংকলের মতলবটা কী?

একটু আগে সোনিয়ার মেসেজ এল— 'তুমি কোথায়?' কী জবাব দেব? সারা শহরে আলেফ আলী এখন একটা আকেলা জানবর। তার বাইকের পেছনে চড়ার কেউ নেই। তাকে সলাহদেওয়ার কেউ নেই। শহরে কী হচ্ছে তাকে আগে থেকে জানিয়ে দেওয়ার কেউ নেই। আলমকে মেরে কেউ যেন আমার ডান হাতটাই কেটে ফেলেছে! আগের তাকত আমি কি আর ফিরে পাবো, দেখাতে পারব? তবু, ইনশাল্লা, যতদিন বেঁচে আছি জিন্দা থাকার কোশিসটা জারি রাখব। বাঘের মতোই বাঁচব মাদারচোদ!

ইমামসাহেব উঠে দাঁড়াতে চেষ্টা করছেন। ওঁর বয়স আশির ওপরে। অনেকরকম অসুখ আছে। বিবির এন্তেকাল বহুকাল হয়েছে। বালবাচ্চা নেই। দেখাশোনার লোক বলতে আলমই ছিল। আমার হঠাৎ মনে হল এই বৃদ্ধের কী হবে? ওঁর ভার কে নেবে? আমার কি নেওয়া উচিত? আলমের রুহ্ সেটাই নিশ্চয়ই চাইবে। কিন্তু আমি নিজের আম্মির দেখাশোনাই ঠিকভাবে করি না। একটা বাজে লোক আমি। এই নেক ইনসানের ভার কোন অধিকারে নেব? না। আমার দূরে থাকাই ভালো।

আশপাশের লোকেরা ইমামসাহেবকে দাঁড়াতে সাহায্য করছে। ডুবতে চলা সূর্যের রোশনি ওঁর শরীরে পড়েছে। ওঁকেও লাল দেখাচ্ছে। ওঁর বুক অবধি সাদা দাড়ি সাদা পোশাক সাদা ফেজটুপি... যেন বেহেস্তের কোনো ফেরেশতা এসে দাঁড়িয়েছেন ভিড়টার মধ্যে। ওঁকে দেখলেই মাথা ঝুঁকে আসে। এই শহরে মুসলিম সমাজে ওঁর কথাই শেষ কথা। কী বলতে চাইছেন ইমামসাহেব? উনিও কি খুনের বদলে খুনই চাইবেন? আল্লার কি তাই ইচ্ছে? তাই হোক তাহলে।

'ইমামসাহেব কিছু বলতে চান।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, আমরা শুনতে চাই ওঁর কথা।'

'ওঁর কথা শুনব আমরা।'

'উনি যা চান তাই হবে।'

'হ্যাঁ। উনি আজ সর্বস্ব হারিয়েছেন। ওঁর কথাই আমাদের জন্য হুকুম হবে।'

ইমামসাহেব একজনের সাহায্য নিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াতে চেষ্টা করলেন। পারলেন না। ঝুঁকেই দাঁড়ালেন। ওঁর চোখ থেকে জল পড়ছে। এতদূর থেকেও

দেখতে পাচ্ছি উনি অঝোরে কাঁদছেন। কিন্তু শরীরে জোর আনার চেষ্টা করছেন। কিছু বলতে চান।

ভিড় চুপ করে গেছে।

ইমামসাহেবের দুর্বল গলা শোনা গেল, 'ওলা তুফসিদু ফিল আরদি বাআদা ইসলাহিহা ওয়াদউহু খাওফাও ওয়া তমাআ ইন্না রাহমাতাল্লাহি কারিবুম-মিনাল মুহসিনিন। ভাইসকল, এর অর্থ হল— দুনিয়ায় শান্তি স্থাপনের পর তোমরা তাতে বিপর্যয় ঘটিয়ো না, তাঁকে ভয় ও আশার সহিত ডাকবে। নিশ্চয় আল্লার অনুগ্রহ সৎকর্মপরায়ণদের নিকটবর্তী। সুরা আরাফ, আয়াত ৫৬।'

সবাই চুপ। কেউ ফিসফিস করেও কথা বলছে না। আমি দেখলাম তৌহিদুল কপাল কুঁচকে তাকিয়ে আছে ইমামসাহেবের দিকে। এখন তাঁর দিকেই সকলের নজর ও মন। তৌহিদুলের দিকে কেউ তাকাচ্ছে না। তৌহিদুলের আজকের খেল কি এখানেই খতম হয়ে গেল? ইমামসাহেবের মতলবটা কী?

'ভাইসকল, যে মৃত ব্যক্তির জন্য তোমরা সমবেত হয়েছ, সে ছিল আমার একমাত্র আপনজন। তার মৃত্যুতে আজ আমি শোক করছি। জীবনের যে কয়টা দিন বাকি আছে, আমি শোক করব তার জন্য। তার কবর জিয়ারত করব। তার আখিরাতের জন্য দোয়া মাগব। আমি ছাড়া এ পৃথিবীতে তার কেউ ছিল না। কিন্তু, আমার প্রশ্ন, সে কি সৎকর্মপরায়ণ ছিল?'

ভিড়ের খামোশির মধ্যেই ইমামসাহেবের উত্তর আছে। সব হাতিয়ার নেমে গেছে। সন্ধ্যা হয়েই গেছে প্রায়। আন্ধেরা লাগছে সব কিছু। আমি যেখানে দাঁড়িয়ে আছি, বড্ড মচ্ছর। এরমধ্যেই আমাকে কামড়াতে শুরু করেছে। কিন্তু আমার এখন নড়াচড়া করা চলবে না।

একটা সিগারেট খেতে সত্যিই খুব ইচ্ছে করছে।

'না। সে একজন গুনাহগার ছিল। অনেক দুষ্কর্ম সে করেছে। এই শহরের মানুষ তাকে ভয় পেত। তোমরা আজ যে ভিড় করে এসেছ, তোমরা কি ভয় পেতে না তাকে? তাকে রাস্তায় দেখলে লুকিয়ে পড়তে না তোমরা? কেউ তার সঙ্গে বন্ধুর মতো ভাইয়ের মতো কথা বলেছ? নিজের স্ত্রী কন্যা বা ভগ্নীর সঙ্গে তাকে কথা

বলতে দেখলে শিউরে ওঠোনি? মৃত্যুর পরে কি মানুষের পাপ ধুয়ে যায়, নাকি তার পাপের হিসেব করার সময়টা তখনই আসে?'

শালা, আলম এত খারাপ ছেলে ছিল নাকি? আমি তো কোনোদিন খেয়ালই করিনি! আমাকে জান দিয়ে ভালোবাসত। ইমামসাহেবের কোনো তকলিফ রাখেনি। আজ তার মৃত্যুর পরে এ কথাগুলো সবার সামনে কেন বলছেন উনি?

হাতিয়ারগুলো আগেই নেমে গিয়েছিল। এবার মাথাগুলোও নেমে গেল।

তৌহিদুল উঠে দাঁড়াল, 'ইমাম সাহেব, সসম্মানে আমি বলতে চাই আলম ভাই কিন্তু মারা গেছে হিন্দুদের হাতে। আমি নাম করেই বলছি। হিন্দুরা বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে তাকে মেরেছে। আমার মনে হয়...'

তাকে কথা শেষ করতেই দিলেন না ইমামসাহেব, 'কেন হিন্দুরা তাকে মারবে? হিন্দুরা তাকে মারেনি। আমি জানি সে হিন্দুদের হাতে মরেনি। এ শহরে আজ অবধি হিন্দু আর মুসলমান পাশাপাশি বাস করে আসছে। কোনোদিন রক্তপাত হয়নি। সেই শান্তি তুমি নষ্ট করার চেষ্টা কোরো না তৌহিদুল। মানুষকে খেপিয়ো না। আবার বলছি, আল্লা জানেন, আলম মোটেই হিন্দুদের হাতে মরেনি।'

মরিয়া হয়ে তৌহিদুল বলে উঠল, 'তাহলে কারা তাকে মেরেছে, আপনিই বলুন?'

'তাকে মেরেছে তার দুষ্কর্মের সাথিরা। তাকে মেরেছে তার কালো কারবারের শত্রুরা। সে নিজের দোষে মরেছে। আর যদি কাউকে সেই দোষের ভাগ নিতে হয়, তাহলে একজন এই ভিড়ের মধ্যেই দাঁড়িয়ে আছে। আলমকে সে-ই সর্বনাশের পথে টেনে নিয়ে গেছে। আমার কোনো কথা শুনতে দেয়নি। আজ তারই জন্য আলমের এই পরিণতি। সেই জালেম এখন আমাদের মধ্যেই দাঁড়িয়ে আছে।'

'কে?'

'কার কথা বলছেন উনি?'

কিছু প্রশ্ন ভেসে এল। কিন্তু বেশিরভাগ চোখ নিজের থেকেই আমার দিকে ঘুরে গেল। আমি দেওয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম। সোজা হলাম। বুঝতে পারছি এবার সত্যিই বিপদ আসতে পারে।

ইমামসাহেব তাঁর কাঁপা-কাঁপা আঙুল আমার দিকেই তুলেছেন, সোজা হয়ে তাকানোর চেষ্টা করছেন আমার দিকে।

'তাকে তোমরা চলে যেতে বলো। ওই দোজখের কীট... সে এখানে থাকলে আল্লা কিন্তু আলমের গুনাহ কিছুতেই মাফ করবেন না। সে যেন না থাকে এখানে। সে যেন না যায় আলমের কবরের সামনে। কিছুতেই। মৃতের আখিরাত তোমরা নষ্ট হতে দিয়ো না।'

আর দাঁড়াতে না পেরে ইমামসাহেব বসে পড়লেন।

বেশ কিছু লোক উঠে এগিয়ে এল আমার দিকে। তাদের চোখের নজর ভালো নয়।

'আলেফ আলী, তুমি চলে যাও এখান থেকে।'

'হ্যাঁ, এখনই চলে যাও। নাহলে ভালো হবে না।'

আমি কোনো তর্ক না করে, একটাও কথা না বলে বেরিয়ে এলাম। বাইকে স্টার্ট নিলাম। চললাম সোনিয়াদের মহল্লার দিকে। সন্ধ্যা হয়ে গেছে। আজ শহরের রাস্তাঘাট বিলকুল শুনশান। কেউ বেরোয়নি বাড়ি থেকে। কে বেরোবে? সারা শহর ভয়ে কাঁপছে।

হিন্দুত্ববাদীদের একটা ছোটো মিছিল গেল। আমাকে দেখে চিল্লিয়ে 'জয় শ্রীরাম' বলল কেউ কেউ। সবার হাতে হাতিয়ার দেখছি। এরকম ছোটো ছোটো দলে ভাগ হয়ে হিন্দুত্ববাদীরা সারা শহরে টহল দিচ্ছে। চাইলেই এই দলটা এখন আমাকে রাস্তায় ফেলে পেটাতে পারে। আমার সঙ্গে মেশিনটা আছে। কিন্তু কী হবে সেটা দিয়ে? একজন আমাকে দেখিয়ে থুতু ফেলল রাস্তার ওপর। তার পাশের লোকগুলো হাসল।

ওই থুতুটা রাস্তায় নয়, আমার মুখে পড়েছে।

হঠাৎ নিজের ওপর কেমন ঘেন্না হল। আমি মাদারচোদ পুরা বেওকুফ বনে গেলাম নাকি! এখন তো এ শহরে আমি হিন্দুদের দুশমন। ইমামসাহেবের কথায় আমি মুসলমানদেরও পুরা শত্রু বনে গেছি! শালা, আমি তাহলে দাঁড়াব কোথায়! আলম নেই। পাশে কেউ নেই। এতদিন ধরে রূপনগরে যে রোয়াব বানিয়েছিলাম, আজ মনে হচ্ছে সব খতম! জিন্দেগি কি ইনসানের সঙ্গে এমনই মজাক করে!

আংকল? আংকল কি এখন আমাকে আর শেল্টার দেবেন? কোমরের মেশিনটা ছাড়া তো আমার আজ কিছুই নেই! কী কাজে লাগব আমি আর ওঁর!

আংকল যদি আমার পাশ থেকে সরে যান, আমার আর উপায় থাকবে না।

শালা, এই মেশিনটা দিয়েই খুদখুশি করে নিতে হবে।

১৫

আংকলের বাড়িতে যখন পৌঁছোলাম তখন আন্ধেরা আরও গেহরা হয়েছে। জনার্দন মণ্ডল দরওয়াজা খুলল। খালি গা। রুদ্রাক্ষের মালাটা ভুঁড়ি অবধি ঝুলে আছে। এই তাগড়া লোকটাকে আংকল বীরভূম থেকে নিয়ে এসেছেন। সেখানকার এক নেতার ভরসার আদমি ছিল। সে নেতা এখন তিহাড়ে জেল খাটছে। জনার্দন তার দল নিয়ে চলে এসেছে এখানে। জনার্দন পারে না এমন কাজ নেই। আমাকে পছন্দ করে। দিল খুলে কথা বলে। একদিন বাতচিত করতে গিয়ে বলল, 'মরার আগে মানুষের চিৎকার আমার খুব ভালো লাগে আলেফ ভাই। খুব পবিত্র ওই চিৎকার। পবিত্র কাকে বলে জানো তো?' শালা কথাটা শুনে আমার মতো আদমিও ছিটকে গিয়েছিল। মালটা ক-জন আদমিকে কতল করেছে কে জানে যে, এমন একটা কথা একদম সাদাসিধা মুখ করে বলতে পারে! ইনসান ইনসানকে কতল করে, সে কোনো নতুন কথা নয়। কিন্তু সেটা এনজয় করে কোন মাদারচোদ? আমার তো ইয়াকিনই হয় না দুনিয়ায় জনার্দনের মতো আদমিও বানিয়েছেন খোদা। কী খেয়ালে বানিয়েছেন কে জানে!

জনার্দন কিছু বলল আমাকে। আমার কানে গেল না। দিমাগ একদম গরম ছিল আমার। ওকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে সোজা দোতলায় গেলাম।

সামনেই পড়ল রাজু। আমাকে দেখে হাসল। যেন কত খুশ হয়েছে আমাকে দেখে! ওর সেই হাসি যা সব গুসসাকে ঠান্ডা করে দেয়। সেই চোখ, যেন বাতাসে সাঁতার কাটছে ওর নজর, মছলির মতো। ওর মুখের দিকে, চোখের দিকে তাকালে ওর ওপর আর কোনো নালিশ থাকে না। মনে হয় ওর জন্যই আমার জীবনে আর কোনো পেরেশানি নেই। তকলিফ নেই। মনে হয় ও বেহেস্তের ফেরেশতা। কিন্তু আজ আমার মাথার মধ্যে সব কিছু কেমন গোলমাল হয়ে গেল, তালগোল পাকিয়ে গেল।

শালা ফরিস্তা!

কী করছি সেটার কিছু সমঝে ওঠার আগেই আমার ডানহাতটা ওর গালে গিয়ে পড়ল। পরে বুঝেছিলাম গায়ের সব জোর দিয়ে ওকে থাপ্পড়টা মেরেছিলাম আমি। ও বহেনচোদ মরে যেতেও পারত।

মুখ থেকে একটা আওয়াজ করে রাজু পড়ে গেল মেঝের ওপর। আওয়াজ পেয়ে আংকল বেরিয়ে এলেন তাঁর ঘর থেকে। সোনিয়া দৌড়ে এল। খুব জোর আওয়াজ হয়েছিল নিশ্চয়ই, পরে আমার মনে হয়েছিল। একতলা থেকে জনার্দনের লোকেরাও ছুটে এসেছিল। আংকল তাদের ইশারায় নীচে যেতে বললেন। বুঝলাম উনি চান না ওই লোকগুলো দোতলায় আসুক। কেন? হয়তো সোনিয়া আছে বলে। লোকগুলো পারে না এমন কোনো কাজ তো দুনিয়ায় নেই।

আমি দাঁড়িয়েই ছিলাম। আংকল নিজের ঘর থেকে জল আনলেন। সোনিয়া রাজুর মুখে ছিটিয়ে দিচ্ছিল। মাথাটা কোলে তুলে নিয়েছে। জল দিতে দিতে আমার দিকে তাকাল সোনিয়া। কী অদ্ভুত ওর চোখ! কোনো প্যার-মুহব্বতের ছায়াও নেই সেখানে! যেন আমি একটা শয়তান দাঁড়িয়ে আছি ওর সামনে! আমি যেন ওর বিরাট ক্ষতি করে দিয়েছি! আমি ওকে চিনতেই পারছিলাম না। কী হল ওর? আউরত জাতকে আমি চিনি না। সবাই বলে চেনা যায় না। সেটাই সত্যি দেখছি। কিন্তু... আমার মনে হচ্ছিল, এই একটা দিন আমার জিন্দেগি থেকে সব কিছু কেড়ে নিচ্ছে... আলম, এ শহরে আমার দাপট, আমার ইজ্জৎ, সোনিয়ার ওপর আমার হক, সোনিয়ার মুহব্বত, সোনিয়ার জিসম... নিজেকে খুব গরিব মনে হচ্ছিল আমার। শালা যেন ভিখারি বানিয়ে ছেড়ে দিয়েছে আমাকে জিন্দেগি। ভিখারি আর গাধা। শালা, মজা দেখছে ওপরওয়ালা।

থাপ্পড়টার জন্য কি সোনিয়া অমন করে চাইল?

রাজুকে থাপ্পড় মারলে ও অমন করে চাইবে কেন? ও কি জানে না রাজু আমার কতটা ক্ষতি করেছে এ শহরে? সোনিয়া আমাকে ছেড়ে দিয়েছে তাহলে? রাজুকে ধরেছে এখন? কী? রাজুকে দিয়েই চোদাচ্ছে তবে এখন... শালা রেন্ডি! রাজুর লন্ড কি আমারটার চেয়েও বড়ো? শালি!

সোনিয়া হঠাৎ খুব গরম গলায় জিজ্ঞেস করল, 'তুমি ওকে মারলে কেন? উড ইউ কিল হিম টু?'

কী জবাব দেব রেন্ডিটাকে! মেশিনটা বের করে এখানেই শুইয়ে দেব ওকে? হাতটা কোমরের মেশিনের দিকেই যাচ্ছিল। সোনিয়াকে গুলি করার জন্য হাতটা নিশপিশ করছিল আমার। যে অবস্থায় রাজুকে থাপ্পড়টা মেরেছিলাম, মাথাটা তার চেয়ে একটু ঠিক ছিল তখন। তা ছাড়া সামনেই আংকল দাঁড়িয়ে আছেন। না হলে হয়তো মেরেই দিতাম মালটাকে।

আংকলই সোনিয়াকে বললেন, 'রাগের মাথায় করে ফেলেছে। পুরুষমানুষদের ব্যাপার। বাদ দে। তুই বুঝবি না। ভাবিস না। এখুনি জ্ঞান ফিরে আসবে। আলেফ, তুই গিয়ে ঘরে বোস।'

আমি আর সত্যিই দাঁড়াতে পারছিলাম না। গিয়ে বসলাম আংকলের ঘরে।

সারা ঘরে প্রচুর কিতাব! এত কিতাব এই লোকটা পড়েছে! তারপর দু-নম্বরির ধান্দা করে! ইয়াকিন হয় না। অন্য সময় হলে এই ঘরে এতক্ষণে অনেক লোক থাকত। আড্ডা চলত। আজ শহর শুনসান। এই ঘরও ফাঁকা।

থাপ্পড় জায়গামতো লাগলে ইনসান মরেও যায়। রাজু যদি আজ মরে, আমার আপশোস নেই।

কিন্তু একটু পরেই আংকল ঘরে ঢুকলেন। বললেন, 'জ্ঞান ফিরেছে রাজুর। কী করলি বল তো রাগের মাথায়? যদি ওর কিছু হয়ে যেত? ওর বাপকে আমি মুখ দেখাতে পারতাম?'

আমি চেঁচিয়ে উঠলাম, 'ওই ছেলেটাকে আপনি এত মাথায় তুলেছেন কেন? এক নম্বরের হারামি ছেলে। ওর জন্য শহরে আজ আমার ধোবির কুত্তার মতো হাল হয়েছে। না ঘরকা না ঘাটকা।'

উনি শান্তভাবে বললেন, 'ও কী করল?'

'আরে আংকল ও-ই তো সুদীপা নামের মেয়েটাকে বলেছে রামাচল যাদবকে নাকি আমি মেরেছি!'

আংকল হাসতে হাসতে বললেন, 'ভুল কী বলেছে? তুই মারিসনি? তুই ছিলি না আমাদের সঙ্গে সেদিন?'

আমি হাঁ করে তাকিয়ে আছি দেখে আংকল আরও হাসতে শুরু করলেন। হাসি থামলে বললেন, 'রাজু না বললেও শহরের সবাই তোকেই খুনি ভাবত রে আলেফ।

রামাচল সোনিয়ার সঙ্গে কী করেছিল, সবাই জেনে গেছে।'

'কিন্তু এখন আমি যাই কোথায়? শালা, হিন্দু-মুসলমান দু-পক্ষের কাছেই তো আমি ভিলেন হয়ে গেছি!'

'তুই কবে হিরো ছিলি বল তো? তোর সম্পর্কে যে ধারণাটা ভিতরে ভিতরে সবার মনের মধ্যে ছিল, সেটাই আজ বেরিয়ে এসেছে।' তারপর আমার চোখের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আসল যেটা ক্ষতি হয়েছে, তোকে যে সবাই ভয় পেত, সেটা আর পাচ্ছে না।'

'সেটাই।' আমার মনে হল এতক্ষণে যেন আমার সমস্যার জায়গাটা আংকল ধরতে পেরেছেন। আমি পারিনি। জিজ্ঞেস করলাম, 'সেটা কেন?'

আমার মুখ থেকে চোখ সরিয়ে নিয়ে আংকল বললেন, 'সব কিছুই একদিন শেষ হয়ে যায় রে আলেফ! মানুষের ভয়। মানুষের সাহস। মানুষের ঘেন্না। মানুষের ভালোবাসা। কোনোকিছুই চিরকাল থাকে না। তুই কি ভেবেছিলি রূপনগরের মানুষ তোকে ভয় পায় বলে চিরকালই ভয় পাবে? চিরকাল মাথা নীচু করেই থাকবে? সেটা হয় না। একটা খুন একজন মানুষকে যেমন ভয়ানক করে তুলতে পারে, একটা খুন অনেক মানুষের ভয়কে নষ্টও করে দিতে পারে। যারা ভয় পাচ্ছিল, তারাই হয়তো তখন মরিয়া হয়ে উঠল। যেমন কেউ মারবে এই ভয়টা যতক্ষণ থাকে ততক্ষণই মানুষ মারকে ভয় পায়। একবার গায়ে মার যদি এসে পড়ে, তখন আর মার খাওয়ার ভয়টা থাকে না।'

আমি হতাশ গলায় বললাম, 'একবার যদি ডর শেষ হয়ে যায়, আমার খেলও তো খতম!'

আংকল আঙুল তুলে বললেন, 'একদম তাই। ঠিক ধরেছিস। সে জন্যই তোর কাজ কাউকে মারা নয়, মারার ভয়টা জাগিয়ে রাখা। তোকে যে মানুষ ভয় পায়, সেটাই হল আসল কথা। তোর মাসল তোর শক্তি নয়। তোর রিভলভারটাও তোর শক্তি নয়। ভয়ই তোর শক্তি। কাজেই সেই ভয়কে আবার ফিরিয়ে আনতে হবে। কাজটা কঠিন হবে।'

বাড়ির সামনে দিয়ে হিন্দুত্ববাদীদের মিছিল যাচ্ছে। মিছিলটায় লোকজন ভালোই হয়েছে মনে হয়। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে গেল মিছিলটা বাড়ির সামনে। জোরে জোরে 'জয়

শ্রীরাম' বলছে। আংকল চুপ করে শুনছেন। মাঝেমাঝে আমার দিকে তাকাচ্ছেন।

মিছিলটা চলে যেতে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'ওরা যে বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে স্লোগান দিচ্ছে, কিন্তু বাড়িতে ঢুকছে না, কেন বল তো?'

'ভয় খায় আপনাকে এখনও।'

আংকল মাথা নাড়লেন, 'হ্যাঁ ভয় পায়। কিন্তু আরেকটা ব্যাপার আছে। ওরা চায় আমাদের মনেও ওদের প্রতি একটা ভয় থাক। ওরা ভয়টাই জাগিয়ে রাখতে চায়। আমাদের গায়ে হাত তুলতে চায় না এখনই। হামলা করতে চায় না এখনই। তাই না?' তারপর কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, 'এটাই পলিটিকস। এই যে একে অন্যের প্রতি সমীহ, এটাই পলিটিকসের মজা। তুই দেখবি পলিটিকসে নীচের তলার কর্মীরা মারামারি করে, একে অন্যের ঘর জ্বালিয়ে দেয়, কিন্তু উপরতলায় নেতাদের মধ্যে সৌজন্য বজায় থাকে। এক দলের নেতা অসুস্থ হলে আরেক দলের নেতা তাকে দেখতে যায়, ফুল আর ফল নিয়ে যায়, পাশাপাশি হাসিমুখে ছবি তোলে। তখনই হয়তো কোথাও এক দলের কর্মীরা আরেক দলের কর্মীদের মাথা ফাটাচ্ছে, বা রেপ করছে। একজন নেতা আরেকজন নেতার গায়ে কখনও হাত তোলে না। এই দূরত্ব বজায় রেখে চলাটাই তোকে বুঝতে হবে। শিখতে হবে। তুই আজ আলমের বডি দেখতে কেন গিয়েছিলি?'

'যাব না? আমার ছোটা ভাইয়ের মাফিক ছিল আলম!'

জোরে মাথা নাড়লেন আংকল, 'না। যাবি না। কারণ ওখানে একলা গেলে তুই নিজেকে ওদের সামনে খুল্লামখুল্লা মেলে দিচ্ছিস। তুই তখন দুর্বল হয়ে যাচ্ছিস। ভেদ্য হয়ে যাচ্ছিস। ভেদনীয় হয়ে যাচ্ছিস। এসব শব্দ তুই বুঝবি না। বাদ দে। কিন্তু তুই কি জানতিস ওদের রিঅ্যাকশন কী হবে? ইমামসাহেবের মনে কী আছে, তুই জানতিস?'

'না।'

'তাহলে গেলি কেন? আমাকে একবার জিজ্ঞেস করতে পারতিস!'

আমার দুর্বল জায়গাটায় উনি আঙুল রেখেছেন। আমি যন্ত্রণায় চিল্লিয়ে উঠলাম, 'আপনি জানেন আংকল ওখানে আমার সঙ্গে কী হয়েছে? আমাকে ভাগিয়ে দিয়েছে ওখান থেকে...'

'সবটাই জানি। আমি সঙ্গে সঙ্গেই খবর পেয়েছি। তৌহিদুলের বক্তৃতার ভিডিয়ো আমার কাছে এসে গেছে। ইমামসাহেব যা বলেছেন, সেটাও। আজকের গেমটা তৌহিদুল প্রায় জিতেই গিয়েছিল। ইমামসাহেব জল ঢেলে দিলেন। আর সেটা হল তোর জন্য। তুই ওখানে না থাকলে এতক্ষণে শহরে অ্যাকশন শুরু হয়ে যেত। কিন্তু ইমামসাহেব তোকে চোখের সামনে পেয়ে গেলেন। আর তাঁর মধ্যে আবেগ জেগে উঠল। সেটাই সমস্যা হয়ে গেল। সমস্যাটা তোর জন্যই হল।'

'সমস্যা?' আমি সত্যিই হয়রান হয়ে গেলাম, 'আপনি কি চাইছিলেন শহরে দাঙ্গা হোক?'

'অবশ্যই চাইছিলাম! এখনও চাইছি। এতে অবাক হওয়ার কী আছে? এ শহরের মধ্যে বিষ জমেছে। রক্তপাত না হলে সে বিষ বেরোবে কী করে? সব তো পচিয়ে দেবে সেই বিষ! বদরক্ত বের করে দিতে হবে রে আলেফ! কিংবা বিষে বিষক্ষয় করতে হবে। জগন্নাথ গোস্বামীর মতো অপদার্থ লোকেরা রূপনগরে দাপিয়ে বেড়াক সেটাই কি তুই চাস আলেফ? তৌহিদুল তোর মাথায় পেচ্ছাপ করুক, তুই চাস? একটা দাঙ্গা হয়ে গেলে এ শহরে আর তৌহিদুল থাকবে না, জগন্নাথও থাকবে না। ওরা নিজেদের মধ্যে লড়েই মরে যাবে। না হলে অবান্তর হয়ে যাবে। অবান্তর বুঝিস? ফালতু! তখন কেবল আমরা থাকব। এ শহরের মানুষ ধর্ম শব্দটাকে ঘেন্না করবে তখন, দেখে নিস। তখন তুই যত ইচ্ছে পাথর কাট পাহাড় থেকে। কেউ কিচ্ছু বলবে না। কারও সাহসই হবে না কিছু বলার!'

'আমি বুঝতে পারছি না আপনার কথা! তার আগে কত লোক মরবে আপনি জানেন? আমরাই যে বাঁচব, তার ঠিক আছে? কত হাতিয়ার ঢুকেছে এ শহরে...'

'সে হিসেব আমি তোর চেয়ে ভালো রাখি। পলিটিকসে রিস্ক নিতে হয় আলেফ। নো রিস্ক, নো গেইন।'

কিছুক্ষণ আমরা দুজনেই চুপ। অনেক দূর থেকে হিন্দুত্ববাদীদের স্লোগান শোনা যাচ্ছে। আজকের শহর যেন ওদেরই দখলে। আংকল আমার মাথা ঘুরিয়ে দিয়েছেন। এতদিন ওঁর সঙ্গে থেকেও ওঁকে কিছুই চিনতে পারিনি আমি। অবশ্য আজ ওঁকে যে রূপে দেখছি, উনি সে রূপ আগে কোনোদিন দেখাননি। আজ যেন কী একটা খেলা

আছে ওঁর আমার সঙ্গে। না হলে এভাবে ধরা দিতেন না। কিন্তু আমি বুঝতে পারছিলাম না উনি কী চাইছিলেন।

'কিছু খাবি? খাবার দিতে বলি? তোর নিশ্চয়ই খিদে পেয়েছে।'

'না আংকল। আমার ভুখ পিয়াস সব মিটে গেছে।'

'সেটাই হওয়ার কথা।'

আংকল উঠে দাঁড়ালেন। ঘরে পায়চারি করছেন। যেন ঠিক করতে পারছেন না আমাকে কী বলবেন।

তারপর হঠাৎ থেমে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'সংস্কার শব্দটা জানিস?'

'জানি। আমি বাংলা মিডিয়ামেরই স্টুডেন্ট।'

'আমাদের সংস্কার আমাদের অনেককিছু করতে দেয় না। যেখানে আমরা জিতে যেতে পারি, সংস্কারের বশেই হেরে যাই। যে খেলা আমাদের হাতে মুঠোয়, শিকার যেখানে আমাদের হাতের নাগালে, সংস্কার সেখানেই আমাদের পিছিয়ে দেয়, সাইডলাইনের বাইরে বের করে দেয়। বুঝিস সেটা?'

আমার ঘোর লেগে গিয়েছিল ওঁর কথায়। কিন্তু কিছু বুঝতে পারছিলাম না। কী চাইছেন উনি? তাই বললাম, 'না। সহজ করে বলুন আংকল।'

'সহজ করে বলতে হবে! এটাই তো মুশকিল! সহজ কথা অনেকসময় সহজে বলা যায় না। পলিটিকসে কিছু কথা না বলতেই বুঝে নিতে হয়। তবু সোজা করে বলছি। তোকে বলা যায়। তুই আমার ছেলের মতো। দেখ আলেফ, আমরা রাজনীতি করি, তাই না? তুইও তো বেসিক্যালি রাজনীতিটাই করিস! একটা পাতি স্মাগলার তো তুই নোস! তুই এ শহরের একজন নেতা। আমিও তাই। দেখ, আমাদের মায়া মমতা স্নেহ ভালোবাসা এসবের অনেক উপরে উঠতে হতে পারে। মসনদের জন্য আউরঙ্গজেব তাঁর তিন ভাইকে হত্যা করেছিলেন, জানিস তো? তাঁর বাবা শাহজাহানও কিন্তু নিজের ভাইদের হত্যা করেই মসনদ পেয়েছিলেন। মসনদের সামনে কোনো সম্পর্কই কিছু না। জাত ধর্ম এসবও কিছু নয়। তাঁরা কি ভুল করেছিলেন, নাকি ঠিক করেছিলেন? সেটা বলার আগে ভেবে নে আউরঙ্গজেব যদি দারাশুকোকে না মারতেন, তাঁকেই মরতে হত দারার হাতে। ভুল করেছিলেন আউরঙ্গজেব?'

'আলবত ঠিক করেছিলেন।'

'সাবাশ! আমি জানি তোর মধ্যে মধ্যবিত্ত বাঙালির সংস্কারগুলো নেই। প্রাচীন ভারতেও উদাহরণ আছে। সম্রাট অজাতশত্রু তার পিতা বিম্বিসারকে খুন করে সিংহাসন পেয়েছিলেন। মহাভারতের গল্প তো আছেই! মহাভারত পড়তে পারিস আলেফ। ওটা কিছু ধর্মগ্রন্থ নয়। শুধু হিন্দুদেরও মোটেই নয়। রাজনীতি শিখতে হলে তোকে মহাভারত পড়তে হবে।'

'টিভিতে দেখেছি।'

'দেখেছিস? তাহলে তো কাজ কিছুটা এগিয়েই রেখেছিস।'

'আজ আপনি আমাকে এসব কেন বলছেন আংকল?'

'বলছি তার কারণ আছে। বলছি কারণ তোকেও হয়তো আজ-কালের মধ্যেই এমন কাজ করতে হতে পারে, যা তোর শক্তির পরীক্ষা নেবে। গায়ের জোরের কথা বলছি না। বলছি মনের শক্তির কথা। মনকে শক্ত করে রক্তপাত ঘটাতে হতে পারে আলেফ। স্পষ্ট কথা বলছি। এই রূপনগরও তো আমাদের সাম্রাজ্য, তাই না? আমাদের মসনদ, তাই না? সেটা কি আমরা তৌহিদুল বা জগন্নাথকে ছেড়ে দেব?'

'হরগিজ না।'

'ঠিক তাই। সেটা তুই ঠিকই করে ফেলেছিস। নিজের রাজত্ব কেন ছাড়বি তুই? আজ যারা তোকে আলমের ডেডবডির সামনে থেকে তাড়িয়ে দিল, কাল তারা তোকে এ শহর থেকেও তাড়াবে। অন্য কোথাও গিয়ে তুই বাঁচতে পারবি? এটা আমাদের আত্মরক্ষার লড়াই আলেফ। মনে রাখিস। এটা আমাদের বাঁচার লড়াই। ঠিক বলছি কিনা? বাঘ হয়ে বেঁচেছিস এতদিন, এখন শেয়াল হয়ে বাঁচতে পারবি? তৌহিদুল রাজত্ব করবে, আর তুই তার পা চাটবি? কী রে আলেফ?'

আমাকে যেন উনি খেয়ে নিয়েছেন, অজগর যেমন করে হরিণকে গিলে নেয়, আমার নড়াচড়াও বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, শ্বাসপ্রশ্বাস যেন থেমে গিয়েছিল, সারা দুনিয়ায় কেবল ওঁর কথাগুলো ছাড়া বাকি সব কিছু মুছে গিয়েছিল, মনে হচ্ছিল ওঁর কথায় আমাকে চলতে হবে, তা ছাড়া আমার আর কিছু করার নেই। আমি যেন একটা নাদান বাচ্চা। উনি আমার আব্বা। উনিই আমার জন্ম দিয়েছেন। আমার জিন্দা থাকা বা না থাকা ওঁর ওপরেই নির্ভর করছে। এমন আমার আগে কখনও হয়নি। আংকলকে আমি চিনতে পারছিলাম না। কিংবা, আংকলকে সেদিনই আমি পহেলিবার চিনতে পারলাম।

ঠিক হ্যায়। খেলা হবে।

১৬

একটা খামোশ রাত। মনে হচ্ছে পুরা শহরটাই মুর্দাঘর হয়ে গেছে। শুনশান রাস্তার ওপর দিয়ে গাড়িটা যাচ্ছে। আমাদের কেউ কোনো কথা বলছে না। আংকলের বাড়ি থেকে আমার মহল্লাটা মিনিট দশেকের রাস্তা। এর মধ্যে কে আর কী বলবে! আমার ভিতরটা যেন ঠান্ডা হয়ে গেছে। আংকল যা বলেছে, সেটা ছাড়া এখন আমার বাঁচার অন্য উপায় নেই। কিন্তু কিছুতেই ভিতর থেকে মানতে পারছিলাম না। আমি খারাপ আদমি। শয়তান। কিন্তু আজকের পরে দুনিয়ার সবচেয়ে খারাপ আদমি হয়ে যাব। আজকের পর থেকে শালা আয়নার সামনে দাঁড়াতে ডর লাগবে। নিজের সঙ্গে আঁখ মেলাতে পারব না। কিন্তু কিছু করার নেই। কিছু করার নেই আর আমার। পলিটিকস। শালা বড়ো চুতিয়া চিজ।

জনার্দন মণ্ডল আচমকা জড়ানো গলায় বলল, 'বুঝলে আলেফ ভাই, নেতার কথায় তুমি যদি কিছু করো, পাপ তোমাকে লাগে না। পাপের ভার তোমার নেতাই নেন। তোমার সব ভার তেনার।'

শালা, এত সব কিছুর মধ্যেও কথাটা শুনে হাসিই পেল। প্রচুর মদ খেয়েছি আজ। হাসলে মাতালের মতোই হাসতাম। কিন্তু হাসলাম না। বরং কড়া গলায় বললাম, 'সেটা ভেবেই তাহলে তুমি নিশ্চিন্ত আছ জনার্দনদাদা?'

'আলবত! প্রথম যেদিন মানুষ মেরেছিলাম সেদিন থেকে আজ অবধি, শালা কোনো কাজের পাপ আমার মাথায় নেই। সব করেছি নেতার কথায়। পাপ-পুণ্য

নেতা বুঝবে। নেতা বদলে গেছে। আমি বদলাইনি। আমি বাঁড়া আজও নিরপরাধ। একটা বাচ্চার মতো নিষ্পাপ। কী বলিস তোরা?'

জনার্দনের তিনজন সঙ্গীর একজন বলে উঠল, 'একদম ঠিক জনার্দনদা। আমাদের পাপ কেন হবে! আমরা নিমিত্ত মাত্র।'

ওদের একজন তারপর বলল, 'পাপ বলে কিছু হয় না জনার্দনদা। কাজটাই তো শুধু আমাদের হাতে আছে দাদা! কাজের ফল তো আমাদের হাতে নয়!'

মাতাল জনার্দন তার রুদ্রাক্ষের মালাটা ঘোরাতে ঘোরাতে জোরের সঙ্গে বলল, 'আরে ভাইপো, ধরে নিলাম পাপ হয়। কিন্তু পাপ বলে কিছু যদি থাকেও, আমার সঙ্গে তার কোনো লেনদেন নেই। আমি নেতার চরণে পাপ-পুণ্য সব সঁপে দিয়েছি। নেতা যা বলে আমি করি। মহাভারতে অর্জুন যেমন কৃষ্ণের কথা শুনে সব কিছু করত। কুরুক্ষেত্রে অর্জুনের কোনো পাপ হয়েছিল?'

জনার্দন মদ খেলেও হুঁশ ঠিক রাখতে পারে। গলা একটু জড়িয়ে যায়, কিন্তু পা টলে না। যে কাজে যেতে হচ্ছে আমাদের, মদ না খেয়ে সে কাজ ইনসান করতে পারে না। কিন্তু আবার সেই মহাভারত! জনার্দনও কি মহাভারত পড়েছে! কী আছে মহাভারতে? পড়লে মন এত হালকা হয়ে যায়, ভয়ানক কাজগুলোও বিন্দাস করে ফেলা যায়! মাদারচোদ, পড়ে দেখতেই হবে আমাকে একদিন। আংকল তো বলেছেন ওটা সির্ফ হিন্দুদের কিতাব নয়! উনি যখন ওই কিতাব পড়ে এতকিছু শিখেছেন, আমি বাদ থাকি কেন! মদের ঘোরে মনে হচ্ছিল শালা কালই একটা মহাভারত কিনে ফেলব। দেখা যাক, কী আছে।

মহল্লার রাস্তাতেও কেউ নেই। রাত এখন দেড়টা বাজে। শহরে আজ যে কোনো ঝামেলা হবে না, হিন্দু-মুসলমান সবাই যে যার ঘরে ঢুকে গেছে, সেটা জেনে সবাই নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছে। কেউ আশাই করেনি আজ রাতে কারও নিন্দ আসবে এ শহরে। সবাই শালা খুব আনন্দে ঘুমোচ্ছে। সবাই জানে আলেফের দিন শেষ। এ শহরে আলেফকে আর কেউ জায়গা দেবে না। সে এখন ধোবির কুত্তা হয়ে গেছে। ভাবতেই ভিতরের ঠান্ডা ভাবটা কেটে গিয়ে আগুন জ্বলে উঠল। আংকল বলেছেন পলিটিকস করতে গেলে অত ভাবলে চলে না। সে তো চলেই না। এখন যদি আমি আচ্ছা বুঢ়া নিয়ে ভাবতে বসি, আমার শালা হাতে আর কিছু থাকবে না। এমনিতেই

হাতে কিছু নেই। আজ সকাল অবধিও আমি এ শহরে একটা কিছু ছিলাম, আগামীকাল সুবাহ হলেই আমাকে আর কেউ পুঁছবে না। তারপর এ শহর ছেড়েই আমাকে চলে যেতে হবে। এ শহরে আমার জন্য আর কিছু বাকি নেই। যদি কিছু করতে হয় তাহলে আবার গোড়া থেকে শুরু করতে হবে। আমি আজই সেটা করছি। সেটা করব। যে কিম্মত সেটার জন্য চুকাতে হয়, মাদারচোদ, আমি চুকাবো।

মহল্লার বাইরে গাড়ি থেমেছে। কিছুক্ষণ ইন্তেজার করে আমরা নামলাম। আমাদের পায়ের তলায় রূপনগরের মুসলমান মহল্লার ইটবসানো রাস্তা। একসময় এই রাস্তায় কত খেলেছি! স্কুল থেকে ফিরেছি এই রাস্তায়। আজকের আলেফ আলীকে কি এই রাস্তা চিনতে পারছে? রাস্তা শালা একই রয়ে যায়। কেবল ইনসান বদলে যায়। না বদলে গিয়ে ইনসানের কিছু করার থাকে না। এই হারামি দুনিয়ায় নাহলে জিন্দা থাকা যাবে না।

সবার আগে নিজেকে জিন্দা রাখা। এটাই চ্যালেঞ্জ এই মাদারচোদ জিন্দেগির। জিন্দা আছ, তাই তোমার জিন্দেগি আছে। এটা ভালো করে সমঝে নাও। আর শুধু নিজে নয়, অন্যদেরও সমঝে দিতে হবে তুমি শালা মুর্দা নও, তুমি একটা জিন্দা আদমি, তোমার সঙ্গে লাগলে খবর আছে।

জনার্দনের হাতে একটা মোটা সবুজ বাঁশ আর একটা মস্ত সাইজের গেরুয়া পতাকা। অন্যদের সঙ্গে হাতিয়ার আছে। এখন যদি এ মহল্লার দরওয়াজা আর জানলাগুলো খুলে যায়, লোকজন যদি বেরিয়ে আসে, রক্তারক্তি হয়ে যাবে। সেটার জন্য জনার্দন তৈয়ার হয়েই এসেছে। আমি জানি ওদের সঙ্গে গান আছে। আমার কোমরেও মেশিন আছে বহেনচোদ। আয়! কে আসবি আয়!

খুব হালকা কদমে এগোচ্ছি আমরা। কোনো হুজ্জত চাই না এখন। আসল কাজটা ভেস্তে যাবে।

একটা কুকুর ঘুম ভেঙে ডেকে উঠল আমাদের দিকে মুখ তুলে। তারপর আমাকে দেখতে পেয়ে চুপ মেরে গেল। কুকুরটা জানে আলেফ যখন এদের সঙ্গে আছে, এদের থেকে মহল্লার কোনো বিপদ হবে না। শালা এখন মানুষের চেয়ে কুকুর আমাকে বেশি বিশ্বাস করে। আমার ইচ্ছে হল কুকুরটার মাথায় একটু হাত রাখি। কিন্তু সেটা হলে জনার্দনরা হয়তো আমাকে পাগল ভাববে। যে কাজে যাচ্ছি... কিন্তু

কুকুরটার চোখ কেমন যেন রাজুর মতো! শালা কুত্তার চোখের ভিতর রাজুকে দেখছি! আমার সচমুচ নেশা হয়ে গেছে। আমাকে সামলাও শালা কেউ! আমাকে ধরো... হো হো হো...

দরওয়াজায় কড়া নাড়লাম। আস্তে করে নাড়লাম। নাহলে সারা মহল্লায় শোনা যাবে আলেফ আলী বাড়ি ফিরল। আমাদের বাড়িতে কলিংবেল নেই। আমাদের বাড়িতে তো আসেই না কেউ যে কলিংবেল লাগবে।

কুমকুম আপা দরওয়াজা খুলল। সে বাড়ি যাওয়ার জন্য তৈরি। আমাকে দেখে মাথায় ঘোমটা দিতে দিতে তেমনই খুবসুরত হাসিটা হাসল। হাসিটার মধ্যে শালা কোনো ময়লা নেই। একদম সাফ হাসি। ভিতরটা একদম সাফ না হলে ইনসান এমন করে হাসতে পারে না।

'আজ অনেক দেরি করলে আলেফ ভাই! কাজ ছিল?'

আমি কোনো উত্তর দিতে পারলাম না। আমার মনে হল, আমি একটা দোজখের কীট। এই নেক আউরতের সামনে দাঁড়ানোর যোগ্যতাই শালা আমার নেই।

কিন্তু আমার কিছু করারও নেই।

আমি শালা মাতালের মতো টলতে টলতে ওপরে নীচে ঘাড় নাড়লাম।

আমাকে পাশ কাটিয়ে কুমকুম আপা বেরোল। বাড়ি যাবে।

জনার্দন আর তার আদমিরা দরওয়াজার দু-দিকে ছিল। ঝাঁপিয়ে পড়ল কুমকুম আপার ওপরে। কিছু বোঝার আগেই মুখে গামছা বেঁধে দিল যাতে সে চিল্লাতে না পারে। তারপর জনার্দন মনে হয় নিজের হাতেই আপার মাথায় একটা ঘা মারল।

সব চুপচাপ। তেমন কোনো আওয়াজই জনার্দন হতে দেয়নি। এসব তার বাঁ-হাতের খেল।

কেবল বাড়ির ভেতর মনে হল কেউ যেন কেঁদে উঠল।

কে? আম্মি? কিন্তু আম্মি তো ঘুমোচ্ছে!

জনার্দন হিসহিস করে বলল, 'চলো আলেফ ভাই!'

আমার হঠাৎ নিজেকে খুব কমজোর লাগল। অসহায়ভাবে বললাম, 'আমি গিয়ে কী করব?'

'বাহ তোমার কাজ! তুমি যাবে না!'

আমার কাজ! আংকলের কাজ নয়!

কুমকুম আপাকে ওদের একজন একটা বস্তার মতো কাঁধে ফেলে নিয়েছে। দ্রুত হেঁটে গিয়ে আমরা উঠলাম গাড়িতে। গাড়ি চলল আবার। পাহাড়ের রাস্তায় আছে। অন্ধকারে কালো পাহাড়টা মস্ত হয়ে আছে সামনে। সেটার দিকে তাকিয়ে কেমন যেন লাগল আমার। যেন আমার তবিয়ত খারাপ করছে।

জনার্দনের যে ষণ্ডা লোকটা কুমকুম আপাকে বয়ে এনেছে সে হঠাৎ কেমন পাগলার মতো হেসে উঠে বলল, 'মালটা কিন্তু সলিড আছে জনার্দনদাদা। কী বডি মাইরি। আর কী ওয়েট! শালা মেয়েছেলের এত ওজন!'

জনার্দন মাতাল গলায় বলল, 'মুছুরমান মাগিদের ওয়েট বেশি হয় রে তারক। গোরু খাওয়া বডি।'

'দারুণ মাল! পাছাটা একবার শুধু দ্যাখো দাদা!'

'আমাকে লোভ দেখাসনি। আজ তো তোদের দিন! মজা করে নে।'

গাড়ি থামল। শহর থেকে অনেকটা দূরে এই জায়গাটায় হালকা জঙ্গল আছে। কয়েক কিলোমিটারের মধ্যে কোনো ইনসান নেই। এত রাতে এখানে কেউ আসবে না। গলা ফাটিয়ে চিৎকার করলেও কেউ শুনতে পাবে না।

গাড়ি থামামাত্র জনার্দনের তিনটে লোক কুমকুম আপাকে তুলে নিয়ে রাস্তা থেকে জঙ্গলের মধ্যে নেমে গেল। গাড়ি থেকে নামানোর আগে কুমকুম আপার মনে হয় একটু জ্ঞান ফিরেছিল। গলার মধ্যে কেমন একটা শব্দ করছিল। আমি বোতল নিয়ে আরও কিছুটা মাল গলায় ঢাললাম।

জনার্দন নামেনি। আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'খারাপ লাগছে?'

'আমার আম্মির দেখাশোনা করত। ভালো মেয়ে।'

'ওসব ভাবলে চলে না ওস্তাদ। কাজ হাসিল করবে, দয়ামায়াও দেখাবে, দুটো একসঙ্গে হয় নাকি? কসাই যদি পাঁঠির সঙ্গে পিরিত করে, চলবে?'

আমি আরও কিছুটা মাল গলায় ঢেলে বললাম, 'ঠিক।'

'সব নেতার পায়ে সঁপে দাও।'

সঙ্গে সঙ্গে আমার গলা থেকে আমাকেই অবাক করে দিয়ে একটা গর্জন বেরোল, 'চোপ! আমিই তো নেতা! আমি কোন মাদারচোদের পায়ে সঁপতে যাব?'

জনার্দন কুতকুত করে আমার দিকে তাকিয়ে রইল। যেন আমাকে সমঝে নিতে চাইছে। শালা এত সোজা? আমার মাথা গরম হলে দুনিয়া জ্বালিয়ে দিতে পারি মাদারচোদ! ভাড়ার গুণ্ডারা আমাকে কী বুঝবে!

একটা করুণ চিৎকার শুরু হল। কুমকুম আপা কাঁদছে। কাকুতিমিনতি করছে। চিৎকারটা বাড়তেই থাকল।

মালগুলো কি সবাই মিলে ওকে ভোগ করছে, নাকি একে একে নিচ্ছে? জানোয়ারগুলোকে বিশ্বাস নেই। নিশ্চয়ই একসঙ্গেই ঝাঁপিয়ে পড়েছে। কিন্তু বেশিক্ষণ তো নয়! কিছুক্ষণের মধ্যেই কুমকুম আপা সব কিছু থেকে রেহাই পেয়ে যাবে। যাকে বলে মুক্তি। সোজা আল্লার কাছেই যাবে কি? নাকি রেপড হলে শালা দোজখে যেতে হয়?

ধীরে ধীরে চিৎকার থেমে এল। একটা আউরত আর কতক্ষণ চিল্লাতে পারে!

জনার্দন গাড়ি থেকে বাঁশটা নিয়ে নামল।

'কী রে হল তোদের? আর কত লাগাবি?'

একজন বলল, 'হয়ে গেছে দাদা। তুমি আসতে পারো।'

'আমি আসব না। ওসব দেখতে আমার ভালো লাগে না। এই বাঁশটা নিয়ে যা।'

একজন শুধু জাঙিয়া পরে উঠে এসে বাঁশটা নিল।

জনার্দন শান্ত গলায় বলল, 'এই বাঁশটা গাঁড়ে ঢোকাবি। পুরো যেন ঢোকে। তারপর দাঁড়িয়ে দু-হাতে ধরে ফেড়ে দিবি— মালটার বডির ভিতর অবধি যেন সব মালপত্তর দেখা যায়। তারপর মেরে মাথাটা ফাটাবি। পুরো ফাটাবি। ঘিলু যেন বেরিয়ে যায়। বাঁচিয়ে রাখার কোনো চান্স নেওয়া যাবে না। হেঁসোটা নিয়েছিস তো? একটা মাই পুরো কেটে নিয়ে ক্যারিব্যাগে ভরবি। পারবি তো? আমাকে কি আসতে হবে? আর কাজ শেষ হলে লাশের ওপর এই পতাকাটা পেতে দিবি। পুরো বডিটা যেন ঢেকে যায়।'

লোকটা ঘাড় নেড়ে বাঁশ আর গেরুয়া পতাকা নিয়ে নেমে গেল রাস্তা থেকে। জনার্দন হাত দিয়ে রুদ্রাক্ষের মালা ঘোরাতে ঘোরাতে গাড়িতে এসে বসল। আমার দিকে তাকিয়ে হাসল, বলল, 'আর একটুক্ষণ। কাজ হয়ে এসেছে আলেফ ভাই।'

একটু পরেই কুমকুম আপা আবার চিৎকার করে উঠল। এটা আগের চেয়েও জোরে। তারপর বাঁশ পেটানোর আওয়াজ এল কিছু।

সব চুপচাপ। কেবল হাওয়ার শব্দ। পাহাড়টা আন্ধেরা মেখে দাঁড়িয়ে আছে।

লোকগুলো হাঁফাতে হাঁফাতে ফিরে এল গাড়িতে। সারা গায়ে পসিনা আর খুন। গাড়ির মধ্যে ঢুকতে গাড়িটা ভরে গেল কাঁচা খুনের গন্ধে। এই গন্ধ আমার কাছে নতুন নয়। লেকিন আমার মনে হচ্ছিল এই গন্ধ আমার শ্বাস বন্ধ করে দিচ্ছে। আমি শ্বাস নিতে পারছি না। কলজেগুলো যেন ফেটে যাবে... বহেনচোদ... চোখের সামনে খালি ভেসে উঠছিল কুমকুম আপার মুখটা। হাসিমুখে বলছে, 'আলেফ ভাই...'

কাল সকালে আম্মির দেখাশোনা কে করবে?

গাড়ি স্টার্ট নিল। আমি হাওয়ার মধ্যে আবার শ্বাস নিতে পারছি।

কুমকুম আপা পড়ে রইল খোলা আশমানের নীচে। কাল সুবাহ হলেই যারা মর্নিং ওয়াক করতে আসে দেখতে পাবে। তারপর শহরে আগুন জ্বলবে। আগুন!

কী করার ছিল আমার! এটাই করার ছিল। এটাই।

গাড়ি আবার শহরে ঢুকল। একটা ইনসানও রাস্তায় নেই। শুধু কিছু কুত্তা ভুকভুক করছে গাড়িটা দেখে।

কুমকুম আপার কেটে নেওয়া মাইটা মসজিদের মধ্যে ছুড়ে দেওয়া হল। যদি কোনো বিল্লি বা কুত্তা তুলে না নিয়ে যায় ওটাই আগুন জ্বালবে।

আল্লা... জানি আজ থেকে আমি আর তোমার নই। তোমার সঙ্গে এ জিন্দেগির মতো আমার ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল। তোমার নেয়ামত আমি আর এ জিন্দেগিতে পাব না।

আজ থেকে আলেফ আলী শুধু তার নিজের। সে আজ থেকে খুদ এক দোজখ।

বাড়িতে যখন ঢুকলাম রাত প্রায় শেষ হয়ে আসছে। কিন্তু সুবাহর রোশনি তখনও ফোটেনি। আশমান লাল হয়নি। কোনো চিড়িয়া ডাকছে না। বাড়ির মধ্যে বাতাসটা কেমন যেন থম আর হিম হয়ে আছে। একটা আজিব ঝাঁঝালো গন্ধ ছড়িয়ে আছে। আমার হঠাৎ মনে হল সেটা কুমকুম আপার ল্যাংটো শরীরের গন্ধ। সেই জঙ্গল থেকে এখান অবধি এল কী করে! শালা আমার দিমাগ ঠিক নেই। একটা কালি বিল্লির মতো ঘুরে বেড়াতে লাগলাম বাড়িটার মধ্যে। আম্মির দরজার সামনেও

দাঁড়ালাম কিছুক্ষণ। ভিতর থেকে একটা শব্দ আসছে। কেউ যেন কাঁদছে। আম্মি কি কাঁদছে? আম্মি কি নিন্দের মধ্যে কাঁদে রোজ এমনই? নাকি ওটা আম্মির নিন্দের মধ্যে শ্বাস নেওয়ার আওয়াজ?

আমার কী হয়েছে বহেনচোদ! শালা আমি খুদ কি এবার আউরতের মতো কাঁদব?

একটা ইনসানকে মারার দরকার ছিল, মেরেছি। জিন্দেগিতে অমন আরও অনেক ইনসানকে মারতে হতে পারে। মারবও। যদি এই শহরে রাজ করতে হয়, যদি রূপনগরের বেতাজ বাদশা হতে হয়, অমন হাজারটা কুমকুমকে কুরবান করতে হতে পারে। করতে হলে করবও।

রাজু কি এখন সোনিয়ার পাশে শুয়ে খোয়াব দেখছে? সোনিয়ার চুত চাটতে চাটতে ঘুমিয়ে পড়েছে মাদারচোদ! সোনিয়া আজ নিশ্চয়ই ইস্পেশাল খাতিরদারি করেছে ওর, কারণ আজ আমার হাতে ও থাপ্পড়টা খেয়েছে। বহেনচোদ কি সত্যিই অজ্ঞান হয়েছিল, নাকি ভান করেছিল!

মালটা নাকি জন্নতের ফরিস্তা! শালা হারামখোর!

আজ যে কুমকুম আপাকে মরতে হল, এ জন্য ওই ছেলেটাই দায়ী। আমার চেয়ে অনেক বেশি দায় ওর। এ শহরে ও-ই আমাকে ভিলেন বানিয়েছে। এ শহরে আজ আমার কুত্তার হাল হয়েছে ওর জন্যই। ওর জন্যই আলম মরেছে। আজ সোনিয়া আমার দিকে চোখ তুলে তাকায় না। ওর জন্যই আজ আমি আল্লার কাছে মুখ দেখানোর লায়েক নই। চিরকালের জন্য জন্য দোজখই আমার ঠিকানা।

আর ও বিন্দাস আছে। এ শহরে আগুন লাগলেও ও নিরাপদে থাকবে। মেহফুজ থাকবে। আংকলের বাড়িতে আছে। ওর একটা বালও কেউ বাঁকা করতে পারবে না। আমি যতই ছটফট করি, ওর গায়ে হাত তোলা আমার বারণ। আংকল তাহলে আমাকেই খেদিয়ে দেবেন।

কী জাদু করেছে ছেলেটা ও বাড়ির লোকগুলোর ওপর!

ওহ আল্লা! সোনিয়াকে ছাড়া আমি বাঁচব না! বাঁচতে চাই না!

এত করেও কি ওকে পাব না আমি!

১৭

রূপনগর টাউনশিপ এখন জ্বলছে। বাইরে থেকে পুরোটা বোঝা না গেলেও লিটারালি অন ফায়ার। চারদিন আগে আলেফের বাড়ি থেকে ওর মায়ের আয়াকে তুলে নিয়ে গিয়ে রেপ করেছে হিন্দুত্ববাদীরা। কী নৃশংসভাবে যে মেরেছে মেয়েটাকে! তারপর তাকে নিজেদের পতাকায় ঢেকে ডিসপ্লে করে রেখে গিয়েছে পাহাড়ের রাস্তায়। একটা স্তন কেটে নিয়ে ফেলেছে মসজিদের ভিতরে। মুসলিমদের খেপে ওঠা ন্যাচারালই ছিল। পরের দিন বিকেলের মধ্যেই রূপনগরের বেশ কিছু মন্দির ভাঙা হয়েছে। কয়েকজন হিন্দুর প্রাণ গেছে। মুসলিমও মরেছে কয়েকজন। এখনও অবধি ব্যাপকভাবে কিছু হচ্ছে না। কিন্তু প্রতি মুহূর্তেই বিক্ষিপ্ত ভায়োলেন্স ঘটছে। ডাইরেক্ট অ্যাকশন শুরু হয়ে গেলে এ শহরে কেউ-ই নিরাপদ থাকবে না। হয়তো আমরাও না। পুলিশ কিছু করেনি। থানা থেকে বেরিয়েই আসেনি পুলিশ। সরকার কেবল একটা কাজ করেছে, শহরের ইন্টারনেট আর কেবল কানেকশন বন্ধ করে দিয়েছে। বলা যায় রূপনগর শহর এখন রাষ্ট্রের মানচিত্রে বিলং করছে না।

আমি ঘটনাটা শোনার পরেই আলেফকে ফোন করে বলেছিলাম, 'তোমার বাড়ি থেকে মেয়েটাকে কী করে তুলে নিয়ে গেল ওরা?'

আলেফ চুপ করে রইল বেশ কিছুক্ষণ। তারপর ভাঙা গলায় বলল, 'আমি বাড়ি ছিলাম না।'

'তাহলেও... সাহসটা পেল কী করে? এটা এ শহরে পসিবল?'

আলেফ চুপ। কিন্তু ফোনের উলটোদিকে আমি ওকে ইমাজিন করতে পারছিলাম। মনে হচ্ছিল ভিতরে ভিতরে ও কেঁপে উঠেছে। হয়তো আমার প্রশ্নটা এত সরাসরি ও আশা করেনি। এমন একটা জায়গায় গিয়ে প্রশ্নটা লেগেছে যেটাকে ও আড়াল করবে ভেবেছিল। অ্যাট লিস্ট, আমার কাছে। হয়তো নিজেকে এই কোয়েশ্চনটা ও বারবার করছে।

অনেক হেজিটেট করে শুধু একবার জিজ্ঞেস করল, 'রাজু কী করছে?'

পুয়োর ম্যান!

এটা সত্যিই আনথিংকেবল! আলেফ আলীর বাড়ি থেকে একটা মেয়েকে তুলে নিয়ে যাওয়া হল! তাকে রেপ করে, খুন করে, তার একটা ব্রেস্ট নিয়ে এসে মসজিদে ফেলে দেওয়া হল! এ শহরে আলেফের প্রতি মানুষের যে ভয় আমি দেখেছি, নিজের চোখে দেখেছি, কী করে হয়! সবচেয়ে বড়ো কথা, এ আমরা কোন সময়ে বেঁচে আছি! এ তো মধ্যযুগীয় ব্যাপার মনে হচ্ছে! রেপ করার চেয়ে বড়ো অপমান একটা মেয়ের আর কী হতে পারে! তারপর তার ডেডবডিটাকেও মিনিমাম সম্মান দিল না! সেটা নিয়েও কুকুরের মতো... উফ!

বাপিও বেশ চিন্তিত। বাড়ি থেকে প্রতিদিনই কয়েকবার বেরিয়েছে। দু-পক্ষের সঙ্গেই কথা বলছে। দু-পক্ষকেই থামিয়ে রেখেছে অনেকটা। পুলিশের কোনো ভূমিকা নেই। একমাত্র বাপি আছে বলেই এখনও এ শহরের আশা আছে। বাপির উদ্যোগে শান্তি চেয়ে একটা সভাও হয়েছে। এই কয়েকদিনে বাপির পপুলারিটি অনেক বেড়ে গেছে শহরে। প্রায় সব নেতাই যখন লুকিয়ে পড়েছে, এমএলএ সাধন বকশি আর বিনোদ ঘোষালও গা ঢাকা দিয়েছেন, জগন্নাথ গোস্বামী আন্ডারগ্রাউন্ডে, শুধু বাপিকেই দেখা যাচ্ছে মানুষের মধ্যে। কোনো পক্ষই বাপিকে কিছু করবে না। স্টিল সঙ্গে জগন্নাথ আর তার কয়েকজন লোক থেকেছে। ওদের কয়েকজন দিন-রাত দরজার বাইরে পাহারাও দিচ্ছে। আমার বাইরে বেরোনো একরকম বারণ। আমাদের বাড়ি এখনও অবধি সেফ। কিন্তু টাউনশিপে যখন দাঙ্গা বেঁধে গেছে, বাপি মনে হয় প্রতি মুহূর্তে বুঝতে চাইছে ঘটনাগুলো কোনদিকে যাচ্ছে। এখন আমাদের বাড়িতে লোকজন বেশি আসেন না। বিশেষ করে এ শহরে যাঁরা পলিটিকস করেন, বাপি আর সুভাষ মণ্ডল ছাড়া তাঁরা বাড়ির বাইরে খুব একটা বেরোচ্ছেন না। মুসলিমরা প্রকাশ্যে স্লোগান দিয়েছে জগন্নাথ গোস্বামীর মুণ্ডু চেয়ে। জগন্নাথের সাড়াশব্দ নেই। বাপি আর তাঁর দলের বিরুদ্ধেও হয়তো মুসলিমদের কিছু ক্ষোভ আছে। যদিও সেটা এখনও উগ্র নয়, ওরা হয়তো বলতে চাইছে বাপির পার্টি ওদের সঙ্গে সুবিচার করেনি, ওদের সেসব সুযোগ-সুবিধা দেয়নি, যেগুলো আশা করে ওরা ভোট দিয়েছিল। কিন্তু আলাদা করে কী সুবিধা ওদের দেওয়া যেত? বাপি তো রাজ্য সরকার নয়! সেটা সম্ভবত ওরা নিজেরাও জানে না।

কিন্তু আলেফ ওদের মধ্যে আছে। পুরোদমে আছে। কারণ মুসলিমরা নিজেদের মধ্যে কোনোরকম বিভেদকে এখন জায়গা দেবে না। আলেফ আবার নিজের জায়গা ফিরে পেয়েছে ওর কমিউনিটির মধ্যে। আয়ার ঘটনাটার পরে আলেফ আবার ওদের একজন প্রায় লিডার হয়ে উঠেছে। বিশেষ করে খোলাখুলি অ্যাকশন শুরু হয়ে গেলে আলেফের অভিজ্ঞতা আর মাসল ওদের লাগবে। আলেফ তো জানে লড়াইটা কী করে করতে হয়। সেটার দম ওর এ শহরে যে কারও চেয়ে বেশি। অবিশ্যি তৌহিদুল ইসলামের কথা এখনও ওদের শেষ কথা। তৌহিদুল কিছু বললে ওরা আর আলেফের কথাকে ইম্পর্ট্যান্ট দেবে না। তৌহিদুল ভার্সাস জগন্নাথ, ব্যাপারটা এখন এমনই দাঁড়িয়েছে।

রাজু বলল, 'তোর কি মনে হয় না রূপনগরের এই অবস্থার জন্য কিছুটা আমিও দায়ী?'

'হোয়াই?'

'আমি যদি সুদীপাকে ওসব না বলতাম...'

হঠাৎ আমার সন্দেহ হল, ও কি এই অবস্থাতেও সুদীপার সঙ্গে দেখা করতে পারছে? বাপি ওকে বাড়ির বাইরে বেরোতে বারণ করেনি। কেবল সতর্ক থাকতে বলেছে। আর জনার্দনকে বলে ওকে একটা ছোটো সেমি-অটোমেটিক পিস্তল দিয়েছে। সেটা কী করে কাজে লাগাতে হয় জনার্দনই শিখিয়ে দিয়েছে ওকে। পিস্তল রাখতে বেশ সহজেই রাজিও হয়ে গেছে ও। আমি সারপ্রাইজডই হয়েছি তাতে। সম্ভবত ওয়েপনের প্রতি পুরুষদের একটা টান থাকেই। ফোন তো ইউজ করে না। সুদীপার সঙ্গে কনট্যাক্ট রাখছে কী করে? পার্কে এখনও দেখা করছে? ওরা তো লাভার্স, সে ওরা স্বীকার করুক আর না করুক, নাহলে রাজু আমাকে ফিরিয়ে দিতে পারত না। আমি রাজুকে দেখছিলাম। ও মনে হয় একটু ভেঙে পড়েছে। আলেফ সেদিন ওকে শুধু বিরাট চড়টা মারেনি, ওর মধ্যে অপরাধবোধ ঢুকিয়ে দিয়ে গেছে। সেটা কিছুতেই ওর ভিতর থেকে বেরোচ্ছে না। একেকটা বীভৎস ঘটনা শুনতে পাচ্ছে, আর ভাবছে সেটায় ওরও রেসপন্সিবিলিটি আছে। ওর বাড়ি থেকেও খুব চিন্তা করছে। ওর মা বারবার বলছেন, কলকাতায় ফিরে যেতে। ও শুনবে না। ও

কেন এ শহরে পড়ে আছে? কী চায়? সুদীপার জন্য? সুদীপার কাছে ও কী চায় যা আমার মধ্যে নেই?

অদ্ভুত ছেলেটা! সঙ্গে মোবাইল নেই! এদিকে একটা পিস্তল আছে!

বাইরে বিপদের ব্যাপারগুলো যত শুনি আমি প্রচুর হর্নি ফিল করি। গাঁজা খেলে যেমন হর্নি লাগে, আমার বিপদের মধ্যে সেটা হয়। বাট আলেফকে ডাকতে আর ইচ্ছে করে না। ওকে আর আমি নিজের শরীরটা দিতে পারব না। কেমন যেন আলেফের ব্যাপারে আমার সব ফিলিংস মরে গেছে বলে মনে হয়। কিছুদিন আগেই আলেফের শরীরটার জন্য অপেক্ষা করে থাকতাম। আজকাল ওকে টাচ করার কথা ভাবলেই কেমন বিশ্রী লাগে! যদি নতুন একটা পুরুষ বা নারীর শরীর পেতাম, সেটা নিয়ে খেলা করে এই টেনশনের দিনগুলো কাটিয়ে দিতাম। লাইফে খেলাটাই তো আসল। এভাবে থাকা যায় না।

প্রায় পুরো দিনটাই কাটাই রাজুর সঙ্গে। রাতও অনেকটা। কিন্তু রাজুর চোখ যেন আমাকে দেখেও দ্যাখে না। একটা নভেলেট নাকি লিখেছে। ও অবিশ্যি সেটাকে নভেল বলে। বাট হার্ডলি বারো-তেরো হাজার শব্দ হবে লেখাটায়, আমার যা মনে হল দেখে। আমি পড়িনি এখনও। বাট পড়তে চাইলে আপত্তি করবে না বলেই মনে হয়। বিশেষ করে নিজেই যখন আমাকে জানিয়েছে লেখাটা সম্পর্কে।

রাজু রাইটার হতে চায়। ফেমাস নভেলিস্ট রাজকুমার চৌধুরী। ভাবলেই হাসি পায়! বাট ও খুব সিরিয়াস লেখাটার ব্যাপারে।

গতকাল স্টেশনে একটা মারাত্মক ঘটনা ঘটে যেতে পারত। বাপিই ঘটতে দেয়নি। ঘটনাটার উইটনেস সুভাষ মণ্ডল আজ সকালে এসেছিলেন। ওঁর সঙ্গে বাপির দেওয়া দুটো ছেলে এখন সবসময় থাকে। করিম আর তার কাজিন। তাদের সঙ্গে সম্ভবত এখন আর্মসও আছে। তাই সুভাষবাবুর সাহস একটু বেশি। বাপির দেখাদেখি উনিও শহরের মধ্যে ঘোরাঘুরি করছেন। পাবলিকের সঙ্গে কথা-টথা বলার চেষ্টা করছেন। সাহস দিচ্ছেন। অস্থির হতে বারণ করছেন। এর ফলে ওঁর-ও একটা ব্রেভ ইমেজ তৈরি হয়ে যাচ্ছে। ইলেকশনে সেটা কাজে দেবে। হয়তো তার চেয়েও বড়ো কোনো অ্যাম্বিশন ওঁর থাকতে পারে। বাট আজ দেখে মনে হল ভিতর থেকে নড়ে গেছেন।

সাহস অনেক কমে গেছে এবার ওঁরও। বাপির কাছে এসেছিলেন কৃতজ্ঞতা জানাতে।

উনি বাড়ির মেয়েদের গতকাল সকালে শ্বশুরবাড়িতে রাখতে গিয়েছিলেন। বিকেলের ট্রেনে যখন রূপনগর ফিরছেন, স্টেশনের কাছেই ট্রেনটা আটকে যায়। ইন ফ্যাক্ট ট্রেনটাকে আটকে দেওয়া হয়। প্রায় শ-দেড়েক মুসলিম যুবক ট্রেনটাকে ঘিরে ফেলে। সকলের হাতেই আর্মস ছিল। বোঝাই যাচ্ছিল ওদের লক্ষ্য ট্রেনের সবাইকে কচুকাটা করা। এত যুবক শুধু রূপনগরের হয়তো নয়। সম্ভবত বাইরে থেকেও লোক ঢুকছে শহরে। কিন্তু গতকাল ট্রেনটাকে নিয়ে ওরা যা করতে চেয়েছিল, করে উঠতে পারলে ভয়ানক ব্যাপার হয়ে যেত।

সুভাষবাবু বলছিলেন, 'আমি ধরে নিয়েছিলাম আমার জীবনের শেষদিন এসে গেছে। ওদের এগিয়ে আসতে দেখেই দ্রুত আমরা কামরার সব জানলা আর দরজা বন্ধ করে দিলাম। কিন্তু ওরা তো এসেই বন্ধ দরজা আর জানলার ওপর আঘাত করতে শুরু করল। মনে হচ্ছিল ট্রেনটাকে লাইন থেকে ফেলে দেবে। চিৎকার করে ধর্মীয় স্লোগান দিচ্ছিল। যেন ওরা ধরেই নিয়েছে ট্রেনের মধ্যে যারা আছে সবাই হিন্দু, যেন মুসলিম কেউ নেই। কিংবা ঢুকতে পারলে হয়তো হিন্দুদের আলাদা করে বেছে নিয়ে কাটত। ওদের উদ্দেশ্য স্পষ্ট ছিল বিবেকানন্দবাবু— রক্তগঙ্গা বইয়ে দেবে, যাতে সারা দেশ কেঁপে ওঠে। কামরার একটা জানলা বন্ধ করে যায়নি। সেটার ভিতর দিয়ে হাত বাড়িয়ে ওরা তলোয়ার আর টাঙিগুলো দেখাচ্ছিল। কী ভয়ংকর! আমার ভিতরটা যেন হিম হয়ে গিয়েছিল বিবেকানন্দবাবু! মৃত্যুকে এত কাছ থেকে তো কখনও দেখিনি। এর মধ্যে কামরার মধ্যে এক কমবয়সি মেয়ের শ্বাসকষ্ট শুরু হল। তার নাকি উৎকণ্ঠায় ওটা হয়। তার সঙ্গে কেউ নেই, ইনহেলারও নেই। দেখে মনে হচ্ছিল যে-কোনো মুহূর্তে মেয়েটা বুক ফেটেই মরে যাবে। অবস্থাটা ভাবুন! বাইরে মৃত্যু নাচছে! ভিতরে মৃত্যুর দৃশ্য! শেষ অবধি অবিশ্যি মেয়েটা মরেনি। যাইহোক, এভাবে সময় যেতে থাকল। ওরা ট্রেন ঘিরে থাকল। মনে হচ্ছিল যতক্ষণ ট্রেনের কেউ বেঁচে আছে, ওরা নড়বে না। এভাবেই সন্ধ্যা হল। রাত আটটা বাজল। জলতেষ্টায় আমার ছাতি ফেটে যাচ্ছিল। তবু আমিই সাহস দিচ্ছিলাম। নেতার ভূমিকা যে কী, গতকাল হাড়ে হাড়ে বুঝলাম বিবেকানন্দবাবু। আপনাকে যা

মানায়, আমাকে মানায় না। অত মানসিক শক্তি আমার নেই। আপনি যদি এমএলএ-কে নিয়ে না পৌঁছোতেন...'

বাপি একটু কেশে নিয়ে বলল, 'আমি আরও আগেই পৌঁছে যেতাম। কিন্তু এমএলএ বললেন তিনি সঙ্গে যাবেন। তাই একটু দেরি হল। আমি জানতাম ওরা আমার কথা শুনবে। যদিও বেশিরভাগই রূপনগরের ছেলে নয়। বাইরে থেকে এসেছে। তবু ওদের নেতা তৌহিদুল আমার কথা ফেলবে না। তা ছাড়া আলেফ তো ছিলই ওদের মধ্যে। হয়তো ওরা সত্যিই খুনজখমের দিকে যেত না, সেটাও হতে পারে। কারণ একটা ট্রেনের সবাইকে কাটলে ওরাও তো আর বাঁচত না। দিল্লি অবধি কেঁপে উঠত।'

'আমার তো মনে হয় ওরা সেটাই চাইছিল। কিন্তু আপনি কী বললেন ওদের? আপনার কথা শুনেই তো ওরা চলে গেল। আমরা বাঁচলাম!'

'শুধু আমার কথায় নয় হয়তো। এমএলএ-ও তো আমার সঙ্গে ছিলেন। ওরা কী করে জানতে পেরেছে উপর থেকে বড়ো একটা ফোর্স এ শহরে ঢুকবে আজ-কালের মধ্যে। আমরা জানি সেটা আপাতত গুজব। কিন্তু ওদের দাবি ছিল শহরে যদি বাইরে থেকে ফোর্স আসে, এবং অস্ত্রের সন্ধানের তল্লাশি শুরু হয়, তাহলে সেটা হিন্দু মহল্লায় আগে করতে হবে, ওদের মহল্লায় প্রথমেই ঢোকা চলবে না। অর্থাৎ সোজা কথা হল ওরা আগে অস্ত্র সমর্পণ করবে না। হিন্দুদেরই আগে করতে হবে সেটা। কথাটা সাধন বকশি মেনে নিয়েছেন। যদিও এর ফলে হিন্দুদের মধ্যে অসন্তোষ দেখা দিয়েছে, আজই খবর পেলাম। হিন্দুরা আবার কী স্টেপ নেয় কে জানে! জগন্নাথ এর মধ্যে কোথায় লুকিয়ে পড়েছে, কোথা থেকে খেলছে বোঝা যাচ্ছে না। ও একটা ভয়ানক ফ্যাক্টর হয়ে উঠতে পারে। ওর মুখোশ অবিশ্যি খুলে গেছে পুরোপুরি। ও যে কট্টর হিন্দুত্ববাদ ছাড়া কিছু বোঝে না, সেটা আজ স্পষ্ট হয়ে গেছে সবার সামনে। ভবিষ্যতে ও একটাও মুসলিম ভোট পাবে না। কিন্তু আজ হিন্দুদের সঙ্গে কথা বলতে হবে। আমাকে একাই যেতে হবে।'

'আপনি একাই যথেষ্ট। আপনি ঠিক সামলে নেবেন।'

'আমার হাতে তো এমপি বা এমএলএ-র পাওয়ারটা নেই।'

'সবাই জানে আপনি ওদের অনেক ওপরে। আপনিই তো কিং মেকার! আপনি ম্যাজিক জানেন।'

'কী আর ম্যাজিক দেখাতে পারছি বলুন! পুজো আসছে। পুজোর আগে শহরে শান্তি ফেরা দরকার। বস্ত্র ব্যবসায়ীদের ক্ষতি হচ্ছে। এ বছর টুরিজমও মার খাবে। এই অবস্থায় আমার সামনেই ওরা এমএলএ-কে হুমকি দিল মসজিদে তুলে নিয়ে গিয়ে কোপাবে। শুনেই তো সাধনবাবুর অবস্থা খারাপ হয়ে গেল! আমিই ওঁকে ভরসা দিলাম— বিবেকানন্দ বসাক সঙ্গে থাকতে ওঁর কিছু হবে না। যাক, শেষ অবধি মানুষগুলোকে বাঁচানো গেছে। তবে এমএলএ যা ঘাবড়ে গেছেন, ওঁকে কোনো ব্যাপারে বাড়ি থেকে বের করা এরপর মুশকিল হয়ে যাবে।'

'এমএলএ-কে তৈরি করেছে কে? আপনি। আপনার সামনে ওর কোনো অস্তিত্ব আছে! দেখুন, গতকাল থেকে আমি ভাবছি, আপনার জন্যই আমি আজ বেঁচে আছি। এ শহরে আপনিই পরিত্রাতা বিবেকানন্দবাবু। সকলেই বলছে আপনি আছেন বলে এ শহরে মানুষ এখনও বাঁচার স্বপ্ন দেখতে পারছে।'

বাপি হাত নেড়ে কথাটা উড়িয়ে দিল। কিন্তু ভিতর থেকে বোঝা যাচ্ছিল খুশি হয়েছে। আমারও ভালো লাগছিল। বাপির জন্যই এতগুলো হিউম্যান লাইফ বেঁচে গেল। একটা ম্যাসাকার হয়ে যেতে পারত।

রাজু চুপচাপ শুনছিল। হঠাৎ বলল, 'অস্ত্র সমর্পণ করতে হলে দু-পক্ষের একসঙ্গে করা উচিত। হিন্দুরা আগে করলে তাদের বাঁচাবে কে? মুসলিমদের একতার সামনে তারা দাঁড়াতে পারবে তখন? পুলিশ তো দর্শক! সরকার নিষ্ক্রিয়!'

বাপি ওর দিকে তাকিয়ে বলল, 'মুসলিমরা আগে ওয়েপনস সারেন্ডার করলে তাদেরও বাঁচানো মুশকিল হতে পারে রাজু। হিন্দুদের হাতে প্রচুর আগ্নেয়াস্ত্র আছে। সেটা মুসলিমদের হাতে কম আছে। অবিশ্যি মুসলিমদের হাতে বোমা আছে অজস্র। ওদের মহল্লায় রোজ বোমা বাঁধা হচ্ছে। হিন্দুরাও শুনলাম সেটা শুরু করেছে। বাড়ির মেয়েরাও বোম বাঁধছে শুনলাম। তাদেরও ওটা শিখিয়ে দেওয়া হয়েছে। শহর এখন যুদ্ধক্ষেত্র। সবাই যোদ্ধা। মেয়েরা পিছিয়ে থাকবে কেন!'

আমি বললাম, 'মেয়েদের পিছিয়ে থাকার কোনো কারণও নেই।'

রাজু অস্ফুটে বলল, 'মেয়েরাই সবচেয়ে বিপদে আছে কাকু। মেয়েদের নিয়েই আগে টানাটানি হবে যদি ওপেন লড়াই শুরু হয়ে যায়। আপনি মেয়েদের জন্য কিছু করুন। কোনো নিরাপদ ক্যাম্প যদি তৈরি করা যায়...'

সুভাষবাবু আরও কিছু ধন্যবাদ জানিয়ে চলে গেলেন। মনে হয় না আর ওঁর শহরের মধ্যে ঘুরে বেড়ানোর খুব একটা সাহস হবে। উনি বুঝতে পেরেছেন সবাই বিবেকানন্দ বসাক হয় না। অবিশ্যি উনি বেড়েছিলেন বাপির ইচ্ছেতেই।

আমি ভাবছিলাম মেয়েদের বিপদের কথাটা কি সুদীপা সান্যাল রাজুকে বলেছে? নাকি ও সুদীপার কথা ভেবেই এ কথা বলছে? রাজুর কাছেই শুনেছি সুদীপার বাড়িটা মুসলিম মহল্লার একদম গা ঘেঁসে। ওদের পাশের দু-একটা বাড়ির পর নাকি একটা বড়ো রাস্তা। সেই রাস্তার ওপার থেকেই মুসলিম মহল্লা শুরু হয়ে যায়। মসজিদটা ওখানেই কাছাকাছি। সুদীপা কি এখনও সেফ আছে?

বাপি বেশ কিছুক্ষণ চেয়ে রইল রাজুর দিকে। তারপর হঠাৎ বলল, 'তুমি চাইলে তোমার বান্ধবীকে এ বাড়িতে এনে কিছুদিন রাখতে পারো রাজু। এখানে ওর কোনো সমস্যা হবে না। বাড়িতে অনেক ঘর আছে। ও থাকলে আমাদেরও কোনো অসুবিধে হবে না।'

ইট ওয়াজ অলমোস্ট এ শক, এ কেবল বাপির পক্ষেই সম্ভব। আমার তীব্র প্রোটেস্ট করতে ইচ্ছে হল। বাট সামলে নিলাম। রাজুও দেখলাম চমকে উঠেছে। বাট ও-ও নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, 'আপনি বলছেন যখন কথা বলে দেখি। ওর বাবাও চাইছেন ওকে শহর থেকে সরিয়ে দিতে। যদি এ বাড়িতে এসে থাকে...'

'সেফ থাকবে। এ বাড়িতে থেকে ও ওর পলিটিকাল কাজও করতে পারে। আমার আপত্তি নেই। কোনো অসুবিধেও নেই।'

রাজু আবার বলল, 'আমি আজই ওকে বলব।'

আমার মতামতের কোনো প্রয়োজন নেই এখানে! একতলায় যারা এসে আছে, তারা বাপির পলিটিকাল লোকজন। আমার কিছু বলার নেই। বাট রাজুর কমিউনিস্ট বান্ধবী এসে তো একতলায় থাকবে না! আমাদের মধ্যেই থাকবে! আমাদের সঙ্গেই ওঠাবসা করবে! আমাকে একবারও জিজ্ঞেস করল না একবার বাপি! আমার ইচ্ছে করছিল ঘর থেকে উঠে চলে আসার। বাট বসে থাকলাম। রাজুকে আমার দুর্বলতাটা

বুঝতে দেব না। ও যখন কিছুই বোঝে না, এটাও না বুঝলে চলবে ওর। মুখটা পুরোপুরি নির্বিকার রাখলাম। এটা বাপির কাছেই শেখা। তোমার মুখ দেখে যেন কেউ বুঝতে না পারে তোমার হার্ট পুড়ে যাচ্ছে। কাছের লোক বা দূরের লোক, নিজের ভিতরে কী হচ্ছে সেটা বুঝতে দেব কেন? আমার আগুন আমিই সামলাব, পুড়তে হলে পুড়ব, পোড়াতে হলে পোড়াব।

বাপি এতক্ষণে আমার দিকে তাকাল। হেসে বলল, 'বাড়ি থেকে বেরোতে পারছিস না। মেয়েটা এলে তোরও কথা বলার একটা লোক হবে। তোরা তো সমবয়সিই হবি মনে হয়! ভালোই হবে। তুমি বলে দ্যাখো রাজু।'

বাপি কি আমার সঙ্গেও একটু খেলা করছে?

কী খেলা সেটা?

১৮

'বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলনে যেটা ঘটে, আমাদের এখানে ঘটতে পারে না কেন! শহিদ আবু সাঈদের যে ছবিটা দেখতে পাচ্ছিলাম, পুলিশের গুলির সামনে দু-হাত ছড়িয়ে বুক চিতিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, গুলি খাওয়ার আগে অমন বাঘের মতো দাঁড়িয়ে থাকা... অমন যুবক-যুবতি কি আজকের পশ্চিমবঙ্গে নেই? ওরা তো শেখ হাসিনাকে তাড়িয়েই ছাড়ল! আমরা পারি না কেন? ক্ষুদিরাম, প্রফুল্ল চাকিরা তাহলে কোথা থেকে এসেছিল? বাঘা যতীন? আমাদের এখানে শাসকের বিরুদ্ধে অমন রুখে দাঁড়ানো দেখতে পাই না কেন বল তো তুই?'

এসব কথা সুদীপা বলছিল। এসব শুনলে বাপির অস্বস্তি হবে। শাসকের বিরুদ্ধে যে-কোনো কথাই বাপির বিরুদ্ধে বলা কথা এ বাড়িতে। আজ সুদীপা আমাদের বাড়িতে উঠে এসেছে। রাজু বলল, ও নাকি এ বাড়িতে কিছুদিন থাকতে রাজি হয়েছে বিকজ ও দেখতে চায় বিবেকানন্দ বসাকের বাড়ির ভিতরটা কেমন, আমরা কীরকমভাবে বেঁচে আছি। নাউ দ্যাট মিনস— ও দাঙ্গায় রেপড হয়ে যাওয়ার ভয়ে আসেনি, বরং আমাদের প্রতি কিউরিয়োসিটি থেকে এসেছে। কৌতূহল। সেটা কি জাস্ট ওর নিজের কৌতূহল, নাকি ওর পার্টির? স্পাই হয়ে এসেছে বুঝি? বাপি কী যে করতে চাইছে মেয়েটাকে এ বাড়িতে না-চাইতেই শেল্টার দিয়ে! যাইহোক, আমার কৌতূহল ছিল রাজুর গার্লফ্রেন্ড কেমন মেয়ে সেটা একবার দেখার। দেখছি

মেয়েটার মধ্যে আগুন তো আছেই, বরফও আছে। এই দুটোই ওর মধ্যে সমান কাজ করে। এখন ওদের সঙ্গে বসে আড্ডা দিচ্ছি। বেশ লাগছে। তিনজন বসে আছি। যেন তিনটে আলাদা পরমাণু একটা কেমিক্যাল সহাবস্থানের চেষ্টা করছে।

রাজু বলল, 'বাংলাদেশের সংস্কৃতি আর আমাদের এখানকার মধ্যে পার্থক্য আছে। সেই পার্থক্যটা দেশভাগের পরে ক্রমেই বেড়েছে। বিশেষ করে গত পঁচিশ-ত্রিশ বছরে। পশ্চিমবঙ্গের বাঙালিরা তো নিজেদের রাষ্ট্রের সঙ্গে তেমন কোনো সংলাপে আজ আসতেই পারে না! বাঙালিদের নিয়ে কে ভাবে আজ ভারতে? দেখ, একসময় কলকাতা ছিল ভারতের রাজধানী। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ শহর। লন্ডনের পরেই। সেটা একটা বিপুল ব্যাপার ছিল। সারা পৃথিবীর অন্যতম শহর ছিল তখন কলকাতা। সারা পৃথিবীর সঙ্গে যোগ ছিল তখন কলকাতার। সেটার সুবিধাও পেয়েছে সে সময়ের বাঙালি। একের পর এক মনীষীর জন্ম হয়েছে তার ফলে। আজ কলকাতা একটা লস্ট সিটি। আজকের ভারতে বাঙালিরা প্রান্তিক হয়ে আছে। বাঙালির গুরুত্ব দিনে দিনে কমতে কমতে আজ প্রায় কিছুই নেই বললে চলে। বাঙালি আজ ভারতকে শাসন করা তো দূরের কথা, ভারতের মূলকেন্দ্রটাকেই অনেক দূর থেকে দ্যাখে, আর টিপ্পনি কাটে। কিন্তু বাংলাদেশের বাঙালি জানে তারাই রাষ্ট্র, যতই ছোটো হোক, বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্র তাদের রক্ত দিয়েই গড়া। এটা একটা বিরাট মনস্তাত্ত্বিক সুবিধা। সেখানে পশ্চিমবঙ্গের বাঙালি হীনম্মন্যতাতে শেষ হয়ে যাচ্ছে। ওদের লোহু আমাদের চেয়ে অনেক লাল।'

লোহু মানে কী? মনে হয় রক্ত। সেটা ধরেই নিয়েই আমি বললাম, 'বাট সেটার ফলে ওদের পক্ষে নিজেদেরই সামলানো মুশকিল হয়ে যায়। ওটা কি সত্যিই ছাত্র আন্দোলন ছিল? শেখ হাসিনাকে তাড়ানো অবধি মেনে নিলাম। বাট তারপর সারা বাংলাদেশ জুড়ে যা চলল, সে তো ভাবা যায় না! বঙ্গবন্ধুর মূর্তি ভাঙা মেনে নেওয়া যায়? বঙ্গবন্ধুর মূর্তির মাথায় হিসি করা? গণভবনে ঢুকে লুটপাট? তারপর হিন্দুদের ওপর একতরফা আক্রমণ! এ কীরকম বিপ্লব ছিল! ফেসবুকে আমি বাংলাদেশের কারও ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট নেওয়া বন্ধ করে দিয়েছি। ওরা কখন কীভাবে বিহেভ করবে তার কোনো ঠিক নেই। একটা ক্রিকেট ম্যাচ নিয়েও বাড়াবাড়ি করে ফ্যালে। আর ওদের মধ্যে অন্ধ ভারত বিরোধিতার কী হবে? স্টুডেন্ট মুভমেন্টেও স্লোগান

শোনা যায়— ভারতে যাদের মামারবাড়ি/ বাংলা ছাড়ো তাড়াতাড়ি। যেটাকে ওরা ছাত্র আন্দোলন বলে চালাতে চায়, সেখানেই এত মৌলবাদী মানুষের ভিড় কেন থাকে? যে-কোনো মুভমেন্ট ওদের ওখানে দ্রুত কেন ভারত বিরোধী আর ধর্মীয় হয়ে ওঠে। পাকিস্তানের মতো ওরাও হিন্দুশূন্য বাংলাদেশের পথেই হাঁটতে চাইছে। আচ্ছা, বাংলাদেশ ভারতের প্রতি এত অকৃতজ্ঞ হয় কী করে! ওদের জন্মই তো ভারতের হাত ধরে! ১৯৭১-এর কথা এভাবে ভুলে গেল!'

রাজু একটু যেন এক্সাইটেড হয়ে বলল, '১৯৭১-এর পাশাপাশি এটাও একটা ঘটনা যে, একটা স্বৈরাচারী সরকার ওখানে জোর করে ক্ষমতায় ছিল, আর তাকে মদত দিচ্ছিল ভারতেরই হিন্দুত্ববাদী সরকার। ফলে ভারত সরকারের বিরুদ্ধে ওখানকার সাধারণ মানুষের ক্ষোভ তো থাকবেই!'

'বাট স্বৈরাচারের বদলে কী বেছে নিচ্ছে বাংলাদেশীরা? ধর্মীয় মৌলবাদ? ওই দুটোই তো অপশন ও দেশে! যারা নিজেদের কান্ট্রিটাকেই সামলাতে পারছে না, সবজায়গায় তারা ভারতবিরোধী স্লোগান কেন দেয়? ওদের দেশে বন্যা হলেও ওরা ভাবে ভারত জল পাঠিয়েছে বলে সেটা হয়েছে। ওদের যুক্তি দিয়ে বোঝানোই সম্ভব নয়। আমার তো মনে হয় ওদের মধ্যে অধিকাংশ লোক আবার পাকিস্তানেই ফিরে যেতে চায়। নো বাংলাদেশ। জাস্ট পূর্ব পাকিস্তান।'

'আর মাদ্রাসার ছেলেদের মন্দির পাহারা দেওয়াটা দেখলি না?'

'মন্দির পাহারা দিতে হচ্ছিল কেন? হাজারটা লোক মন্দির ভাঙতে চাইছিল, হয়তো একটা লোক চাইছিল পাহারা দিতে। কী হবে সেটায়?'

'দেখ সোনিয়া, সবার রাজনৈতিক ম্যাচিউরিটি তো সমান নয়! অপরিণতমনস্ক কিছু মানুষ আর ধান্দাবাজ লোকেরা সব জায়গাতেই থাকে, তারা সুযোগ পেলে লুটপাট করে, মন্দির ভাঙে, তারা স্লোগানও দেয়। ভারতকেও কিন্তু ভাবতে হবে তার বিরুদ্ধে এই ক্ষোভ কেন বাংলাদেশে দেখা দিয়েছে। ওদের ওখানে যে-কোনো মুহূর্তে যেমন একটা গৃহযুদ্ধ ঘটে যেতে পারে, আমাদের এখানেও তার আঁচ এসে পড়বেই।'

আমি আর কিছু বললাম না। অলরেডি যা বলেছি হয়তো বাপি শুনলে পছন্দ করবে না। তা ছাড়া এখানে ডিবেট করে কোনো লাভ নেই। সুদীপা রাজুর দিকে

তাকিয়ে আছে। এমন কিছু নতুন কথা রাজু বলছে না, তবু সুদীপার চোখে কত মুগ্ধতা! আর আমি তাকিয়ে রইলাম সুদীপার দিকে। একটা নন-গ্ল্যামারাস মেয়ে। সব দিক থেকেই অর্ডিনারি। আমি পাশে থাকলে কেউ ওর দিকে তাকাবেও না। তবু ওর মধ্যে কিছু আছে। আগুন? কীসের আগুন? সেক্স অ্যাপিল? বাট সেটার সোর্স কোথায়? এমন কিছু ফিগার নয়। বেশ রোগা। টি-সার্টের তলায় বুবস তো নেই বললেই হয়। নাকটা চ্যাপWzy। হাসলে মাড়ি বেরিয়ে পড়ে। যে জিনসটা পরে আছে, বেশ সস্তা, ব্র্যান্ডেড নয়। একটা মধ্যবিত্ত ব্যাক ডেটেড টাইপের মেয়ে তবু মনে হচ্ছে ওর গায়ে হাত দিলে আঙুলের ডগা থেকে ব্লিডিং হবে!

সুদীপা আমার দিকে তাকাল। দেখল আমি ওর দিকেই চেয়ে আছি। একটু অবাক হল মনে হয়। চোখ সরিয়েও নিল। আমার চোখে চোখ রাখতে ওর সময় লাগবে। অলরাইট। সে সময়টা আমি ওকে দেব।

জিজ্ঞেস করলাম, 'টাউনের ঝামেলাগুলো নিজের চোখে দেখেছ? তোমার বাড়ি তো মুসলিম মহল্লার বর্ডারে শুনলাম!'

'যেদিন কুমকুম নামে মেয়েটার লাশ পাওয়া গেল, সেদিনই আমরা মরে যেতাম। সেদিন দুপুরে একটা গোলমাল শুনে ছাতে উঠলাম। দেখলাম ওদের দিক থেকে একটা বড়ো দল আসছে। সবার হাতে মারাত্মক সব অস্ত্র। জোরে জোরে ধর্মীয় আর হিন্দু বিরোধী স্লোগান দিচ্ছে। আমাদের দিকেই দ্রুত আসছে। বাবা দৌড়ে গেল নীচে। সঙ্গে আমিও। বাবা সদর দরজা বন্ধ করে সেটার সামনে একটা ভারী টেবিল রেখে দিল। কিন্তু সেটা কি রক্ষা করতে পারবে! বাড়িতে মানুষ বলতে কেবল আমরা দুজন। আমরা কাঁপছিলাম। ধরেই নিয়েছিলাম বাপ-মেয়ের আজই শেষদিন। আবার ছাদে উঠলাম। দেখলাম ওরা প্রায় এসে পড়েছে। রাস্তাটা পেরোলেই আমাদের পাড়া। তখনই আমাদের পাড়ার বেশিরভাগ বাড়ি থেকে লোকজন বেরিয়ে এল। তাদের হাতে অস্ত্র নেই। কিন্তু যা পেয়েছে হাতে নিয়ে বেরিয়ে এসেছে— শাবল, কাটারি, দরজার খিল, বঁটি এমনকি ঝাঁটাও। মেয়েরাও আছে। মেয়েরাই আগে আগে যাচ্ছে। আমরা বুঝলাম আমাদেরও যোগ দিতে হবে। আমরাও দরজা খুলে বেরোলাম। আমাদের দল আর ওদের দল মুখোমুখি হল, মাঝখানে রাস্তা, রাস্তার দু-দিকে আমাদের দুটো দল। ওরা মারমুখী হয়ে আছে, কিন্তু এগোচ্ছে না।

হয়তো আমাদের সামনে মেয়েরা আছে বলেই। ওদের মধ্যকার চ্যাংড়া ছেলেগুলো এগিয়ে আসতে চাইলেও বয়স্করা বাধা দিচ্ছিল। এভাবে বেশ কিছু সময় কাটল। আমরা আশা করছিলাম পুলিশ আসবে। পুলিশ এল না। পরে বুঝেছি, যাই ঘটে যাক পুলিশ আসবে না। ওপর থেকে তেমনই অর্ডার আছে। শেষ অবধি ওরা ফিরে চলে গেল। কিন্তু যাওয়ার আগে রাস্তার ওপারে একটা খুব পুরোনো মন্দির ছিল, ওদের মহল্লার গা ঘেঁসে। সেটা তছনছ করে দিয়ে গেল। ওটার ওপর হয়তো ওদের অনেকদিন থেকেই রাগ ছিল।'

আমরা তিনজনই চুপ। কিছুক্ষণ পরে সুদীপাই বলল, 'সেদিন যদি সবাই মিলে প্রতিরোধ না করা হত, সবাই যদি যে যার বাড়িতে বসে থাকত, ওরা সব কিছু শেষ করে দিয়েই যেত। আমাদের পাড়ার কেউ বাঁচত না।'

রাজু অস্ফুটে বলল, 'হ্যাঁ রে, প্রতিরোধটাই আসল কথা। রুখে দাঁড়াতে হবে। কাকু যেমন একা লড়ে যাচ্ছেন এ শহরটাকে বাঁচাতে।'

সুদীপা চকিতে আমার দিকে তাকাল। কিছু বলল না। বাট আমি সিয়োর, আমি যদি না থাকতাম ও বাপির নামে কিছু বলতই। তার বদলে বলল, 'সেদিনের পর আমাদের পাড়াতেও অস্ত্র ঢুকল। বড়ো বন্দুক। পিস্তল। সোর্ডস। যারা নিয়ে এল তারা শিখিয়েও দিয়ে গেল কী করে চালাতে হয়। কত সহজ মানুষ মারা! একজন এল বোমা বাঁধা শেখাতে। মেয়েরাই সেটা শিখতে শুরু করল। ছেলেরা তো পাহারা দিচ্ছিল। আমিও শিখে নিয়েছি বোমা বাঁধা। ভালোই বাঁধতে পারি।'

সুদীপা সান্যাল হাসছে। ব্যাপারটা মজার নয়, তবুও হাসছে। আমরাও হাসছি।

তারপর বলল, 'ও হ্যাঁ, রাজু, বলাই হয়নি, তোদের বাড়িতে আসার পথে মুসলিমদের একটা দলের মুখোমুখি হয়েছিলাম। একজনের হাতে একটা রাইফেল ছিল। সে-ই জিজ্ঞেস করল ব্যাগ-ট্যাগ নিয়ে কোথায় যাচ্ছি। বললাম খালার বাড়ি। জিজ্ঞেস করল আমার নাম কী। আমি বললাম আমিনা খাতুন। কিছু আর করল না। কেবল একজন বলল একা বেরিয়েছি কেন। কিছুই হয়তো ওরা করত না। তবু নিজের পরিচয় দিতে ভয় হল। অবস্থাটা চিন্তা কর!'

আমি বললাম, 'কিছু করতেও পারত। নাহলে অত কথা জিজ্ঞেস করছিল কেন!'

'হ্যাঁ। সেটাই। যে-কোনো মুহূর্তে এখন কিছু হয়ে যেতে পারে একজন মানুষের এ শহরে। কে কেটে ফেলে দেবে তার ঠিক নেই।'

হঠাৎ কী খেয়াল হল, হাত বাড়িয়ে ওর হাতের ওপর রাখলাম। যেন আশ্বাস দিতে চাইলাম। ওর চোখের দিকে চেয়ে বললাম, 'তোমার বাবা এখন কোথায়?'

ও চোখ সরিয়ে নিয়ে বলল, 'বাবা পাড়াতেই আছে। একটু আগেই কথা বললাম। জানালাম পৌঁছে গেছি। আসলে মা মারা যাওয়ার পর থেকে বাবার মনের জোরটা আর আগের মতো নেই। আমাকে নিয়ে খুব ভয় পাচ্ছিল। আজকাল মানসিক চাপে বাবার শরীর খারাপ হয়। তাই রাজু যখন আসতে বলল, আমি চলেই এলাম। পাড়ায় সবাই আছে। আশাকরি বিপদের কিছু নেই। যদি আমাদের পাড়ায় বিপদ হয়, সারা শহরেই হবে।'

বাবার জন্য চলে এসেছে! এটা কি আমাকে বলল! অথচ রাজুকে বলেছে ও নাকি আমরা কেমনভাবে আছি সেটা দেখার জন্য এসেছে। কোনটা ঠিক? জানতে চাই না।

আমি ওর হাত থেকে হাতটা সরাইনি। আমার হাতের তলায় ওর আঙুলগুলো স্থির হয়ে আছে। সেগুলোয় চাপ দিয়ে বললাম, 'ডোন্ট ওরি। এত সহজ নয় কিছু হওয়া। বাপি খুব ট্রাই করছে। হয়তো আজকালের মধ্যেই সব নর্ম্যাল হয়ে যাবে।'

ও যেন হাতটা টেনে নিতে চাইছে। আনইজি লাগছে ওর নিশ্চয়ই। কিন্তু আমি ছাড়িনি। ও বলল, 'হ্যাঁ, আশাকরি সব ঠিক হয়ে যাবে।'

আগুন আর বরফ আমার হাতের তলায় খেলা করছে। ও মনে হয় বুঝতে পারছে না আমি ওর হাত ধরে আছি কেন। রাজুও খেয়াল করেছে। একবার আমাদের জুড়ে থাকা হাতের দিকে তাকাল, তারপর আমার চোখের দিকে। রাজুর চোখে প্রশ্ন। ও হয়তো ভাবছে এটা আমার একটা খেয়াল। ভাবছে আমি এটা করছি মেয়েটাকে অস্বস্তিতে ফেলার জন্য।

হাতটাকে আমার হাতের মধ্যেই থাকতে দিয়ে সুদীপা জিজ্ঞেস করল, 'ইন্টারনেট বন্ধ করে দিয়ে কি সরকারের সত্যিই কোনো সুবিধা হচ্ছে?'

দ্যাট মিনস এবার ও সরাসরি সরকার বিরোধী কথা বলতে শুরু করল। এটাই হওয়ার ছিল। যেন কমিউনিস্ট সরকার ক্ষমতায় থাকলে ইন্টারনেট বন্ধ হত না এই

সিচুয়েশনে! সেটা বললে সুদীপা হয়তো বলবে কমিউনিস্ট শাসন থাকলে রূপনগরে দাঙ্গাটাই হত না।

তার বদলে আমি শান্ত গলায় বললাম, 'রূপনগরে কী হচ্ছে সেটা যদি বাকি পশ্চিমবঙ্গ জানতে পারে, তাহলে তো আগুনটা ছড়াবে! সেটা কি ভালো হত?'

সুদীপা ঘাড় নেড়ে বলল, 'হ্যাঁ, সেজন্যই বন্ধ করেছে। কিন্তু সত্যকে চাপা দিয়ে কি বেশিদূর যাওয়া যায়? মানুষের নিরাপত্তার নামে মানুষের জানার অধিকারটা অস্বীকার করা হচ্ছে। ওরা কি ভাবছে সেটা করে হিংসা থামাবে?'

'সত্যের পাশাপাশি তো মিথ্যেগুলোও ছড়াতে পারত! অনেক গুজব ছড়িয়ে পড়ত সারা রাজ্যে। আরও বহু মানুষ খেপে উঠত। সেটা আটকানো গেল।'

'আমার মনে হয় সেটা ঠিক নয়। এভাবে নেট শাটডাউন করে দিয়ে এই শহরের মানুষের মধ্যে যে আতঙ্ক আর বিভ্রান্তি তৈরি করা হল, সেটার কী হবে? যেদিন দেখলাম সরকার নেট বন্ধ করে দিয়েছে, আমার বুকের ভিতরটা হিম হয়ে গিয়েছিল। ভেবেছিলাম এই শেষ। পুলিশ নিষ্ক্রিয়। এবার সরকারও হাত তুলে নিল। আর আমরা বাঁচব না। তা ছাড়া এতে কি বিভেদকে আরও প্রশ্রয় দেওয়াই হচ্ছে না? এতে তো মেনেই নেওয়া হচ্ছে দুই সম্প্রদায়ের মধ্যকার সত্যটাকে বাইরে আনতে সরকার ভয় পাচ্ছে। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার মধ্যে এমনিতেই মানুষ আতঙ্কের মধ্যে আছে। তার ওপর সে তার প্রিয়জনের সঙ্গে যোগাযোগটাও করতে পারছে না।'

'ফোন তো আছে!'

'কত মানুষের অর্থনৈতিক ক্ষতি হচ্ছে! এ শহরে যাঁদের বিজনেস বা শেয়ার মার্কেটের ব্যাপারগুলো ইন্টারনেটের ওপরেই নির্ভর করে, তাঁদের কী হচ্ছে? প্রচুর ক্ষতি হয়ে গেল। তাঁরা তো এই দাঙ্গার মধ্যেও নিজেদের কাজটা চালিয়ে যেতে পারতেন! আর পারলেন না। সরকারের কি আদৌ অধিকার আছে এটা করার?'

'উন্নত দেশগুলোতেও হয়। যখনই আর্মড কনফ্লিক্ট বা ম্যাস ডেমনস্ট্রেশনের ব্যাপারগুলো দেখা দেয়, সরকার নেট বন্ধ করে না দিক, স্পিড অনেক কমিয়ে দেয়। হয়তো মোবাইলের স্পিড 2G করে দেয়, যাতে তখনই কেউ ভিডিয়ো ইত্যাদি পোস্ট করতে না পারে, বা দেখতে না পারে।'

'সেটাও অসভ্যতা।'

ঠিক করেছি ওর কোনো কথায় রাগ করব না। অন্তত রাগ শো করব না। তাই আমি শুধু হাসলাম, 'অ্যাবসোলিউটলি সো। কিন্তু মানুষ যে সিভিলাইজড হয়েছে, এমন কোনো প্রমাণ তো নেই সুদীপা!'

এতক্ষণে আমি হাতটা ছেড়ে দিলাম। ওর হাতের সঙ্গে কনট্যাক্টের ফলে আমার হাতের চেটোয় বেশ ঘাম দিয়েছে। সেই ঘাম ওর হাতে লেগে আছে। ভেজা লাগছে হাতের ওপরটা। বাট ও মুছল না।

রাজু আস্তে আস্তে বলল, 'সিভিলাইজেশন! সত্যিই সভ্যতা এখনও অনেক দূরে। আজ থেকে পাঁচশো বছর পরে, জানি না তখন বাঙালি বলে কোনো জাত আদৌ থাকবে কিনা, থাকলেও তখনকার মানুষরা আমাদের একটা অসভ্য বর্বর জাত বলেই মনে করবে। পূর্বপুরুষ হিসেবে আমাদের কথা ভেবে তারা লজ্জাই হয়তো পাবে। নিউজ মিডিয়া, রাজনৈতিক নেতা, অভিনেতা, লেখক, সোশ্যাল নেটওয়ার্ক, ইউটিউব— আমাদের ঘিলু নিয়ে যে পেরেছে পিংপং খেলে নিয়েছে। আমরা শুধু পেরেছি রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে স্বাধীনভাবে পেচ্ছাপ করতে।'

সুদীপা খিলখিল করে হেসে উঠে বলল, 'আমরা মেয়েরা তো সেটাও পারিনি। ইউরিন চেপে রাখতে রাখতে আমাদের ব্লাডার ফেটে যায়।'

বলে আমার দিকে তাকাল। আমিও হাসলাম। আমি জাস্ট ওর হাতে লেগে থাকা আমার ঘামটা দেখছিলাম। ও মুছে নিচ্ছে না। ও কি ঘামটা যে লেগেছে, খেয়াল করেনি! এত ইনসেনসিটিভ ও! রাজু কোনোদিন ওর কানের ওপর ঠোঁট রেখে বা ঘাড়ের চুলগুলোয় আঙুল বুলিয়ে ওকে এক্সাইটেড করেনি? নিশ্চয়ই করেনি। ও চাইলেও রাজু করবে না হয়তো। ওদের প্রেমটা হয়তো আজ থেকে চল্লিশ বছর আগে যেমন প্রেম হত, সেরকম। বস্তাপচা। প্লেটোনিক। কিন্তু যৌন অভিজ্ঞতা নেই এমন দুজন মানুষের মধ্যে বসে কথা বলাটা আজ বেশ অন্যরকম লাগছে। কিংবা মে বি সুদীপার সেক্সুয়াল এক্সিপিরিয়েন্স আছে। রাজুকে সেসব বলেনি। কিংবা, মে বি, বলেওছে। সেক্ষেত্রে আমি একটা স্টুপিড।

কিন্তু এখনও আমি বুঝতে পারলাম না ওর মধ্যে কী আছে, যেটার জন্য রাজু পারল সোনিয়া বসাককে ফিরিয়ে দিতে। কী আছে? নাকি কিছু নেই বলেই ওর

প্রতি রাজুর এত টান? দয়া? করুণা? রিয়েলি... ডাজ হি পিটি হার?

রাজু যেন নিজের সঙ্গেই কথা বলছিল, 'কিন্তু কেওস কখনও শেষ কথা বলে না। কেওসের ভিতর থেকেই ধীরে ধীরে গড়ে ওঠে স্ব-সংগঠিত ব্যবস্থা। একটা নতুন শৃঙ্খলার জন্ম হয়। নতুন যুক্তিবোধের জন্ম হয়। তখন হিংস্র মানুষগুলোকে আর খুঁজে পাওয়া যায় না। পৃথিবী আবার শান্ত হয়। রূপনগরে সেটাই হবে। দেখে নিস। কাকু তো আছেন!'

১৯

বাড়ির বাইরে বেরোতে না পেরে নিজেকে আজকাল কেমন সিক লাগে। মনে হয় মাথাটা হিজিবিজি হয়ে যাচ্ছে। এমনিতে হয়তো আমি বাড়িতেই থাকতাম, খুব একটা বেরোতাম না। আমার তো কোনো ফ্রেন্ডস নেই এ শহরে। আড্ডা-ফাড্ডা দিতেও আমার ভালো লাগে না। বাট ওপেন এয়ারটাকে মিস করছি খুব। এই যে জোর করে বাড়িতে থাকা, এটা সহ্য করা মুশকিল। অথচ বুঝতে পারছি আমার পক্ষে রাস্তায় বেরোনো এখন সত্যিই বিপজ্জনক। জগন্নাথ গোস্বামীর লোকেরা আমাকে পেয়ে গেলে কী হবে কেউ বলতে পারে না।

কবে যে সিচুয়েশন পুরোপুরি ঠিক হবে!

আজ বাপিকে দেখে বুঝতে পারলাম তার মিশন পুরোপুরি সাকসেসফুল হয়নি। আজ বাপি দু-পক্ষকে একসঙ্গে বসানোর একটা ব্যবস্থা করেছিল। ভেবেছিল একবার যদি ওদের একসঙ্গে বসানো যায়, কন্ট্রোল করা হয়তো কঠিন হবে না। কোনো পক্ষই প্রথমে আলোচনায় রাজি হয়নি। শেষ অবধি বাপির চাপেই দুটো কমিউনিটির নেতারা মিটিংয়ে আসতে বাধ্য হয়েছে। জগন্নাথ গোস্বামী আসেনি। বাট নিজের বদলে ভাইপো সুগত গোস্বামীকে পাঠিয়েছিল। সুগত সারা মিটিংয়ের মধ্যে নাকি একটা কথাও বলতে চায়নি। বাপির কাজটা ভেস্তে দেওয়াই ওদের টার্গেট, বোঝাই যাচ্ছে। বাট তৌহিদুল এসেছিল। গত কয়েকদিনে তৌহিদুলের সঙ্গে বাপি নিয়মিত যোগাযোগ রেখেছে। প্রথমে তৌহিদুল ফোনে বাপির কোনো কথাই শুনতে চায়নি। কিন্তু বাপি পেশেন্স হারায়নি। আজ তৌহিদুল বেশ শান্ত ছিল। সবচেয়ে বড়ো কথা ইমামসাহেবকে বাপি আনতে পেরেছিল আজকের মিটিংয়ে। উনি প্রথম থেকেই শান্তি চেয়ে এসেছেন। আজও সে কথাই বলেছেন। সেটায় কাজও হয়েছে।

একটা প্রাইমারি স্কুলে মিটিংটা হয়েছে। হিন্দু আর মুসলিম দু-পক্ষই স্কুলটাকে ঘিরে রেখেছিল। মারাত্মক সব ওয়েপনস ছিল দু-পক্ষেরই হাতে। মিটিং-এ কোনোরকম গোলমাল হলে বাপি হয়তো বেঁচে ফিরত না। আজ বাপি সঙ্গে বডিগার্ডও নিয়ে যায়নি। নিজেই গাড়ি ড্রাইভ করে একা গিয়েছিল। সাধন বকশি যাবেন বলেও শেষ অবধি পিছিয়ে যান। প্রায় দু-ঘণ্টা মিটিং চলে। শেষ অবধি ঠিক হয়েছে কোনো পক্ষই নিজের থেকে অন্য পক্ষকে আক্রমণ করবে না। বাট কোনোরকম হামলা হলে ছেড়ে কথাও বলবে না। এটা তবু ভালো। এখান থেকে ধীরে ধীরে সিচুয়েশনটা শুধরে যাবে, হোপফুলি। যে ব্লাডশেড হতে পারত, সেটা হবে না। যদি না এর মধ্যে নতুন কিছু ঘটে।

জগন্নাথ নিশ্চয়ই খুব হতাশ হয়ে পড়েছে। বাপি এখন পাহাড়টার চেয়েও উঁচু হয়ে উঠছে এ শহরে। যারা বাপিকে পছন্দ করত না, বদনাম করত, তারাও এখন বাপির প্রতি কৃতজ্ঞ। সেটাই হওয়া উচিত। এ শহরটা বাপির জন্যই এখন বেঁচে আছে। বাপি না থাকলে কী হত ভাবতে আমিই শিউরে উঠছি।

চিফ মিনিস্টার আজ ফোন করেছিলেন বাপিকে। বেশ কিছুক্ষণ কথা বললেন। উনিও আশা করছেন বিবেকানন্দ বসাক ব্যাপারটা সামলে নিতে পারবে। হুররা! হুররা!

রাজু এখন বাপির নম্বর ওয়ান ফ্যান হয়ে গেছে। সুদীপাকে বলল, 'পলিটিকস ব্যাপারটার প্রতি মানুষের নতুন করে শ্রদ্ধা ফিরে আসবে যদি তারা বিবেকানন্দ বসাককে দ্যাখে। সবাই জানে উনি যে পার্টিটা করেন সেটা অশিক্ষিতদের। কিন্তু তারা এসে ওঁকে দেখুক! ওঁর মতো লেখাপড়া অনেক লেখকেরও নেই। আর সেটা উনি কাজে লাগিয়েছেন। রাজনীতি করতে হলে এভাবেই করা উচিত।'

সুদীপা কথাটা কীভাবে নিল ওর ফেস দেখে বোঝা গেল না। জাস্ট বলল, 'রাজনীতি করতে হলে মানুষের প্রতি নিজের দায়িত্ব তো পালন করতেই হবে! সে তিনি যে দলেরই হোন। আগে মানুষের স্বার্থ দেখতে হবে।'

'উনি সেটাই করছেন। করছেন না?'

সুদীপা ঘাড় নেড়ে বলল, 'অবশ্যই।'

তারপরেই চুপ করে গেল। একবার কেবল আড়চোখে আমার দিকে তাকাল।

সুদীপার সঙ্গে বাপির সেভাবে কথা হয়নি। যেটুকু হয়েছে দুজনেই খুব ভালোভাবে কথা বলেছে। বাপি ওর ফ্যামিলি সম্পর্কেই জানতে চেয়েছে। রাজনীতি নিয়ে কেউ কিছু বলেনি। বোঝা যাচ্ছে কোনোরকম অস্বস্তি এসে পড়ুক, বাপি চায় না। সুদীপা এ বাড়িতে একজন মেম্বারের মতোই আছে।

বিকেলে আলেফ এল। ওকে অনেকদিন পরে দেখলাম। গত কয়েকদিন আমাকে কোনো মেসেজও করেনি। হয়তো আমি কিছু মেসেজের রিপ্লাই দিইনি সেই অভিমানে। আলেফ আলীরও অভিমান হয়! আজ দেখলাম অ্যাপিয়ারেন্স যেন বদলে গেছে। কেমন একটা অস্বস্তি নিয়ে যেন এসেছে। অ্যাজ ইফ এ বাড়িতে ওর আসার কথা নয়, জোর করে এসেছে। রোগা হয়নি। বাট চেহারা থেকে জেল্লাটা চলে গেছে। নিভে যাওয়া চেহারা। একটু একটু টলছে। হি ইজ ড্রাংক অলরেডি! ও আগে তো দিনেরবেলায় ড্রিংক করত না! এখন কি সেটা শুরু করেছে! চোখ দেখে মনে হচ্ছিল আমাকে দেখেও দেখতে পাচ্ছে না, আমার মধ্যে যেন আমাকেই খুঁজছে। একবার হাত বাড়িয়ে দিল আমাকে ধরবে বলে। আমি সরে গেলাম। বুঝতে পারছিলাম ওর টাচ শরীরে নিতে আমার ভালো লাগবে না। কী হয়েছে জানি না, কিন্তু মনে হচ্ছিল ও চলে গেলেই ভালো হয়। আমি সরে যেতে ওর ভিতর থেকে একটা লম্বা নিঃশ্বাস বেরিয়ে এল। মনে হচ্ছিল ওর ভিতরের অনেককিছু পুড়িয়ে দিয়ে সেটা বেরোল।

পুয়োর ম্যান! হিজ ইনসাইড ইজ বার্নিং। ফর মি? কিন্তু আমি কী করব? আমার কিছু করার নেই।

সুদীপাকে দেখেছে। ক্যাজুয়ালি জিজ্ঞেস করল, 'মেয়েটা কে?'

আমি অভ্যাস মতো ওর চোখের দিকে তাকিয়েই বললাম, 'শি ইজ সুদীপা। রাজুর গার্লফ্রেন্ড। চেনো না?'

সঙ্গে সঙ্গে ওর মরা চোখ ঝলসে উঠল। এটা ওর কাছে নিশ্চয়ই একটা সেরা খবর। বুঝতে পারছিলাম ও কী ভাবছে। ও ভাবছে রাজুর গার্লফ্রেন্ড যখন এ বাড়িতে এসে আছে, নিশ্চয়ই আমার সঙ্গে রাজুর কিছু নেই। রাজু আর আমাকে জড়িয়ে ও কতকিছু ইমাজিন করেছে অনলি গড নোজ। ওকে তো আমি চিনি!

তখনই রাজু এল। একটু বেরিয়েছিল মনে হয়। আলেফকে দেখে থমকে গেল। হয়তো একটু ঘাবড়েও গেল। বাট সামলে নিয়ে ওর সেই আশ্চর্য হাসিটা দিয়ে বলল, 'আলেফ ভাই...'

আলেফ চোখ সরিয়ে নিল রাজুর মুখ থেকে। সেদিনের থাপ্পড়ের ঘটনাটার পর আর কী করবে! রাজু ভুলে যেতে পারে, আলেফ আলী ভোলেনি, ভুলবেও না। রাজুর সামনেই আমার দিকে একটু এগিয়ে এসে গলা নামিয়ে বলল, 'একটা কথা ইয়াদ রেখো সোনিয়া, তুমি আমার জান। তুমি আছ বলেই আমি জিন্দা আছি। নাহলে শালা কবে মরে যেতাম! তুমি আছ বলেই এ শহরটাও আছে। নাহলে আমিই এটাকে জ্বালিয়ে দিতাম। আমার কেউ নেই তুমি ছাড়া। ইয়াদ রেখো কথাগুলো। তোমার জন্য শালা কাউকে মারতে পারি, নিজেও মরতে পারি। তোমার সামনে কেউ কিছু না আমার জিন্দেগিতে। তোমার আমার মাঝখানে কেউ এলে সির্ফ মেরে ফেলে দেব।'

আমি শ্বাস বন্ধ করে শুনলাম। ওর চোখের দিকে আর তাকালাম না। কথাগুলো বড্ড নাটুকে। বাট ওর ভিতর থেকেই আসছে। বানিয়ে বলছে না। রাজু সামনে আছে বলেই হয়তো আরও জোশের সঙ্গে কথাগুলো বলল। শুনিয়ে রাখল রাজুকে? শেষ কথাগুলো তো রাজুর দিকে তাকিয়েই বলল মনে হল। অবিশ্যি ওর মুখের দিকে আমি তাকাইনি।

আলেফ বাপির স্টাডিতে ঢুকে গেল। নোটিশ করলাম আর ওর পা টলছে না। নেশা কেটে গেছে?

আমি তাকালাম রাজুর দিকে। রাজু আমার দিকেই চেয়ে আছে। চোখে চোখ পড়তে ফ্যাকাসে হেসে বলল, 'ও তোকে সত্যিই ভালোবাসে সোনিয়া। পাগলের মতো। তোকে ছাড়া বাঁচবে না। তোর জন্যেই বেঁচে আছে। এমন ভালোবাসা পাওয়া খুব ভাগ্যের কথা।'

আমার মুখ থেকে বেরোল, 'সো? আমি কী করব? ভাগ্য ধুয়ে জল খাব? ফাক...'

নিজের ঘরে চলে এলাম। মাথাটা গরম লাগছিল। এটা কেন হয় যে একজন মানুষের মনের অবস্থা সামনের লোক একটুও বুঝতে পারে না, অথচ কিছু না বুঝেই কমেন্ট করে দেয়। তখন নিজেকে কেমন হেল্পলেস লাগে। একটা স্ট্রেঞ্জ অনুভূতি

উঠে আসে বুকের ভিতরে। সেটার কিছুটা রাগ, কিছুটা দুঃখ, কিছুটা হয়তো আপশোস। মনে হয়, পৃথিবীতে আমি একা, আমার কোনো আত্মীয় নেই, বন্ধু নেই, কেউ নেই। হয়তো যে লোকটা কমেন্ট করেছে তার অত কিছু মনেই হয়নি। কিংবা সেই কমেন্টটার পিছনে হয়তো তার চিন্তাভাবনাও আছে, সে হঠাৎ বলেনি কথাটা। তবু মনে হয়, সেই লোকটা অপরাধী, সেই লোকটা আমাকে ভালোবাসতে পারেনি, সেটার তার অক্ষমতা। কেন পৃথিবীর সব মানুষ আমাকে বুঝবে না? আমাকে ভালোবাসবে না? কেন খুব কাছের মানুষকেও মাঝেমধ্যে মনে হয় অনেক দূরের! এত দূরের যে হাত বাড়ালে তাদের ধরতেও পারব না!

রাজুর কথায় আমার এত ইম্পর্ট্যান্স দেওয়ার কি কিছু আছে? কে রাজু? দেখতে গেলে একটা অস্বাভাবিক ছেলে ছাড়া তো ও কিছুই নয়! দেখতে গেলে ওর সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্কই নেই। ওকে যদি আজই এই বাড়ি থেকে আমি চলে যেতে বলি, বাপিও কি ওকে রাখতে পারবে? তবু ওকে নিয়ে কেন ভাবি! যে ছেলে আমার মতো মেয়ের শরীর ফিরিয়ে দিতে পারে, তাকে নিয়ে ভাবার কী আছে! আমাকে ফেলে যে সুদীপাকে গার্লফ্রেন্ড বানাতে পারে, তাকে নিয়ে ভাবার কী আছে? তবু আমি রাজুকে নিয়ে ভাবি কেন? দিনের মধ্যে বেশিরভাগ সময়টা যেন ওর আর সুদীপার ইকুয়েশন নিয়ে ভেবেই কাটিয়ে দিই! কী পাব সেটা থেকে! কী পাওয়ার আছে আমার!

আমি বিবেকানন্দ বসাকের মেয়ে। আলেফ আলীর মতো লোক তার পায়ের তলায় লুটিয়ে থাকে। আমি যদি আলেফকে পয়জন খেয়ে নিতে বলি, জানি ও হাসতে হাসতে খেয়ে নেবে। আজই তো বলল, আমার জন্য ও যে-কোনো মানুষকে মারতে পারে, নিজেও মরে যেতে পারে। আমি জানি, আমার চেয়ে ভালো ও কাউকে বাসে না। আলেফের মতো ভালোবাসতে কেউ আমাকে কোনোদিন পারবে না। জানি। বাট আলেফকে আমার আর ভালো লাগে না। কোনোদিন কি ভালো লাগত?

নিজের মনকেই আমি বুঝতে পারছি না কেন!

হঠাৎ কেউ দরজায় নক করল। নিশ্চয়ই আলেফ। আমি খুলব না। ও ঢুকলেই হয়তো শরীর চাইবে। আমার ওকে নিতে ইচ্ছে করছে না। আমার পক্ষে হয়তো

কোনোদিনই পসিবলই নয় আর। কোনো ফিলিংস নেই। কোনো ফিলিংস আর বাকি নেই আমার মধ্যে ওর জন্য।

আবার নক করল।

এটা তো আলেফের স্টাইল নয়!

'কে?'

'আমি। সুদীপা।'

একটু অবাক হলাম। ঠিক দেখছি তো! সুদীপা এই প্রথম আমার ঘরে এসেছে। আমার সঙ্গে কথা বলতেই তো ও আনইজি ফিল করে! চোখে চোখ রাখে না! হঠাৎ কী মতলব!

দরজা খুললাম। ও কিন্তু ফ্র্যাংকলি হেসে বলল, 'একটু এলাম তোমার কাছে। আসতে পারি তো?'

বেশ ছিমছাম দেখাচ্ছে ওকে। এই প্রথম আমার মনে হল রাজুর যে ওর প্রতি টান, সেটার কিছু রিজনস থাকতেই পারে। হয়তো এরকম ছিমছাম বিউটিই রাজুর পছন্দ। আমার মধ্যে তো একরকম তীব্রতা আছে। সেটা হয়তো ছেলেটা নিতে পারে না। কিন্তু সেটার জন্য কি আমি দায়ী? আমার মধ্যে যে অ্যাগ্রেসিভ ভাবটা আছে, সেটা আমি বাপির থেকে ইনহেরিট করেছি। এটা আমার পারিবারিক ব্যাপার। সেক্ষেত্রে আমি কী করব? আমি তো কোনো মধ্যবিত্ত ছাপোষা লোকের মেয়ে নই! বাংলা মিডিয়ামে পড়েও বড়ো হইনি! আমি সুদীপার ক্লাসে বিলং করি না। আর সুদীপা তো নিশ্চয়ই ভীষণভাবে ক্লাসে বিশ্বাস করে। তবু ও নিজের থেকেই আমার রুমে এসেছে। স্ট্রেঞ্জ!

কিন্তু আমি জানি ওর ড্রামা কীকরে হ্যান্ডল করতে হবে। হাত ধরেই ওকে ঘরে নিয়ে এলাম। বেডে বসিয়ে নিজে পাশে বসলাম। ঘরটা দেখে প্রথমেই ও বলল, 'অ্যাতো বই! এ তো লাইব্রেরি হয়ে যাবে!'

'বই পড়েই তো টাইম কিল করি! আমার তো কোনো ফ্রেন্ডস নেই! বই-ই একমাত্র বন্ধু।'

সুদীপা স্মার্টলি হেসে বলল, 'কেন এখন তো রাজুদা আছে! রাজুদা তোমার বন্ধু নয়?'

আমি হাসলাম না। একটু শক্ত গলাতেই বললাম, 'রাজু সকলের বন্ধু। কারও একার মনে হয় নয়।'

ওর হাসিটা নিভে গেল। কিন্তু তারপর আবার হেসে উঠে বলল, 'তুমি মনে হয় জানো না, একটা কথা আছে— হরি হে, তুমি আমারও বন্ধু, বাবারও বন্ধু। কিছু মনে কোরো না, তোমার কথা শুনে সেটা মনে পড়ে গেল।'

'অ্যাকচুয়েলি তাই। রাজু আমার বাপিরও বন্ধু। ওর মনে হয়, কোনো বয়স নেই, লিঙ্গ নেই...'

খিলখিল করে হেসে উঠল সুদীপা, 'এ মা! লিঙ্গ নেই কীরকম!'

এবার আমিও হাসলাম, 'আমি তো বাংলা খুব ভালো জানি না। জেন্ডারের কথা বলেছি। ও মনে হয় একইসঙ্গে মেয়ে আবার পুরুষও।'

'রামকৃষ্ণের মতো?'

'রামকৃষ্ণ!'

'হ্যাঁ। কিংবা শ্রীচৈতন্য। বাবা ওঁদের নিয়ে অনেক লেখাপড়া করেছে। পার্টির বইয়ের পাশাপাশি ধর্ম নিয়েও বাবার অনেক ঘাঁটা আছে। আসলে বাবা বিশ্বাস করে কোনোকিছু সম্পর্কে না জেনে সেটাকে খারিজ করে দেওয়া ঠিক নয়। তা, বাবাই বলেছিল রামকৃষ্ণ বা শ্রীচৈতন্যের মতো মানুষদের পথে পুরুষ এবং নারীর মিলন ঘটেছে, তাই ওঁরা মানুষকে অত আকৃষ্ট করতে পেরেছেন। যিশুর মধ্যেও সেটা ছিল। এটা ঘটলে একজন মানুষ বহু লোকের প্রিয়পাত্র হয়ে ওঠে। তার নেতৃত্ব দিতে সুবিধা হয়।'

'হয়তো রাজুও পরে একজন ধর্মগুরু হবে। ও মনে করে ধর্ম খুব জরুরি। এমনকি সেটার জন্য সায়েন্সকে আক্রমণ করতেও হেজিটেট করে না। ও ধর্ম নিয়ে বিস্তর লেখাপড়া করেছে। জানো নিশ্চয়ই। যদিও মন্দির-টন্দিরে যায় না। গীতা বাইবেল কোরান উপনিষদ সব পড়েছে। বাপির আড্ডায় বসে নাকি সেসব নিয়ে জ্ঞানও দেয় শুনেছি।'

'হ্যাঁ, ও তো জ্ঞান দিতে ভালোবাসে।'

'হ্যাঁ।'

''তবে একটা কথা ঠিক। তোমাদের বাড়িটা খুব নির্জন। লোকের আসা-যাওয়া আছে। একতলায় তো অনেকে এসে আছে দেখছি। তাহলেও আমার কেমন যেন মৃণাল সেনের 'অন্তরীণ' সিনেমার সেই সংলাপটা মনে পড়ে যায়— পাহাড় দেখেছি, সমুদ্র দেখেছি, তেপান্তর দেখেছি, কিন্তু এই অদ্ভুত নির্জনতা আগে কোথাও দেখিনি। এক অন্তহীন শূন্যতা।''

ঠিকই বলেছে সুদীপা। আমি আস্তে আস্তে বললাম, 'ও সিনেমাটা দেখিনি। হ্যাঁ, আমাদের বাড়িটা খুব চুপচাপ। মাঝেমধ্যে মনে হয়, আমাদের বাড়িটা এখনও মায়ের শোক পালন করছে। শোক আজও কাটিয়ে উঠতে পারেনি।'

'তোমার মা কি খুব কম বয়সে... মারা গেছেন?'

'হ্যাঁ। আমি তখন খুব ছোটো।'

ও আমার হাতে হাত রাখল, খুব গাঢ় গলায় বলল, 'মা যাওয়ার দুঃখ আমি বুঝি। এ যে কী কষ্ট! বিশেষ করে একজন মেয়ের যদি মা না থাকে...'

আমরা দুজনেই কিছুক্ষণ চুপ করে থাকলাম। আমার ব্রেন খুব ফাস্ট কাজ করছিল। আমার মনে পড়ছিল রাজুর লিঙ্গের কথাটা শুনে সুদীপা কেমন হেসে উঠল। ও নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছিল লিঙ্গ বলতে আমি কী মিন করেছি। তবু হাসল! ওদের মধ্যে ফিজিকাল কিছু থাকলে এভাবে কি হেসে উঠতে পারত?

সুদীপা কি সত্যিই ভার্জিন তাহলে?

তারপর হঠাৎ-ই সিদ্ধান্তটা নিলাম। আরও সরে গেলাম ওর দিকে। গা ঘেঁসে বসলাম। সুদীপা আমার হাত থেকে ওর হাতটা সরায়নি। আমি জড়িয়ে ধরলাম ওকে। শক্ত করে। ও চুপ করে আছে। স্টিফ হয়ে আছে একটু। প্রব্যাবলি বুঝতে চাইছে আমি কী করছি।

আমি ওর গলায় মুখ ডুবিয়ে দিলাম। বেশ সুন্দর গন্ধ ওর গায়ে। এটা কোন ডিয়ো? আমার অচেনা। হয়তো সস্তা। বাট আমার ভালোই লাগছে। সময় নষ্ট না করে চুমু খেতে শুরু করলাম ওর গলায়।

সুদীপা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছে আমি কোনদিকে যাচ্ছি। বাট যেন নিজের থেকেই ও-ও আমাকে জড়িয়ে ধরল। একটু আনাড়িভাবে। জোরে জোরে নিশ্বাস পড়ছে ওর। ঘাবড়ে গেছে। বাট আমাকে ছাড়িয়েও দিচ্ছে না।

কৌতূহল? শুধুই কৌতূহল? বিবেকানন্দ বসাকের মেয়ে কী করতে পারে সেই কৌতূহল?

আমি হাত রাখলাম ওর গালে। মুখটা নিজের দিকে ফেরালাম। ওর ঠোঁটে ঠোঁট ডুবিয়ে দিলাম। একটু আগে চুইংগাম চিবোচ্ছিল। সেই গন্ধ ওর মুখে। ও ঠোঁট সরাল না। শুধু আমাকে জড়িয়ে না রেখে ছেড়ে দিল এবার। অস্ফুটে জিজ্ঞেস করল, 'কী করছ এসব?'

'বুঝতে পারছ না?'

আমার হাত ওর স্তনে গেল। আমি সময় নিয়ে আদর করতে শুরু করলাম ওর স্তনে। না। খুব ছোটো তো নয়! রাজুর নিশ্চয়ই এতে চলে যাবে। বাট ওর আগুনটা কোথায়? কোত্থেকে আসছে আগুনটা? আর বরফ! সেটা কোথায় রেখেছে ও?

সুদীপা আমার হাতটা আস্তে আস্তে বুক থেকে সরিয়ে দিল। কিন্তু হাতটা ছাড়ল না। ধরে থাকল। নোটিশ করলাম ওর হাত একটু একটু কাঁপছে।

'না। থাক।'

'কেন? আমাকে ভালো লাগছে না?'

'আমি এসব কোনোদিন করিনি। তা ছাড়া কেউ এসে পড়বে।'

'কে?'

'রাজুদা... কিংবা আলেফ আলী... কিংবা... কাকু...'

আমি আর কিছু বলতে না দিয়ে ওর ঠোঁটে জোরে কিস করলাম। চুষলাম কিছুক্ষণ। তারপর ছেড়ে দিলাম।

সুদীপা এখনও অলমোস্ট হাঁফাচ্ছে। আমার দিকে তাকাচ্ছে না। কিন্তু হাতটা ছাড়েনি।

আমি বললাম, 'যদি তোমার খারাপ লাগে, সরি। আর করব না।'

সুদীপা আমার দিকে তাকাল। চোখগুলো একটু পাগলাটে হয়ে গেছে। হাঁফাতে হাঁফাতেই বলল, 'না। সরি কেন! আমার খারাপ লাগেনি। কিন্তু এসবে আমার কোনো অভিজ্ঞতা নেই। তুমি কি... লেসবো? আমি তো জানতাম...'

'আমি ছেলেদের মাথা চিবিয়ে খাই? তোমার রাজুদার খাচ্ছি?'

'না। কিন্তু...'

'টেল দা ট্রুথ... তোমার খারাপ লেগেছে?'

ও একটু সামলে নিয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই হাসল। বলল, 'না। খারাপ লাগবে কেন! খারাপ লাগেনি। শরীরের ভিতরটা কেমন যেন করছিল! মনে হচ্ছিল অজ্ঞান হয়ে যাব। এখনও করছে। না, আমি ঠিক আছি। কিন্তু মেয়েদের সঙ্গে এসব করার পর তো আর ছেলেদের সঙ্গে করা যায় না জানতাম!'

'ভুল জানতে। মানুষ কি বাইসেক্সুয়াল হয় না? মানুষেরই শরীর তো! হিউম্যান বডি।'

'না। আমার এসবে কোনো এক্সপিরিয়েন্স নেই। আমি কোনো ছেলের সঙ্গেও কোনোদিন কিছু করিনি। সত্যি বলতে কী, এই প্রথম কেউ আমাকে এভাবে স্পর্শ করল।'

'শুধুই খারাপ লাগেনি সেটা? আমার টাচ?'

'তার চেয়ে অনেক বেশি কিছু। অদ্ভুত লাগছিল। ভালোই লাগছিল হয়তো। আমার মধ্যে যে এ ব্যাপারটা আছে নিজেই জানতাম না। আমি তোমাকে থামাতাম না হয়তো। কিন্তু কেউ যদি এসে পড়ে?'

'তাতে তোমার কিছু যেতে আসতে পারে। আমি কেয়ার করি না।'

ও উঠে দাঁড়াল। দরজার কাছে গিয়ে আবার আমার দিকে তাকিয়ে হাসল। বাঃ! হাসিটা তো বেশ! এই প্রথম আমার মনে হল মেয়েটা সুন্দর। এই প্রথম আমার মনে হল, ও কি আমার চেয়েও কোনোদিক থেকে সুন্দর?

আমি চাপা গলায় বললাম, 'রাতে আমি তোমার রুমে যাব, না তুমি আসবে?'

ও কী যেন ভাবতে ভাবতে বলল, 'একটু আগে যখন তোমার রুমে আসব ঠিক করলাম, তখনই মনে হচ্ছিল এখানে এলে কিছু ঘটে যেতে পারে। আসাটা ঠিক হবে কিনা ভাবছিলাম। সিক্সথ সেন্স বোধহয়, তাই না? তবু আমাকে কী যেন টেনে আনল!'

অর্থাৎ আমিই ওর রুমে যাব আজ রাতে।

বোধহয় সেক্স পারে এভাবে মানুষের ক্লাস কনশাসনেস চুরমার করে দিতে।

আর, বাপি কী যেন বলে— সংস্কারকেও।

কিন্তু এখন রাজু কী করবে? পুয়োর রাজু!

২০

সুদীপা দরজা খুলতেই আমি ঢুকে ওকে দেওয়ালে চেপে ধরলাম। দরজা বন্ধ করারও সময় দিইনি। বাট ও বাধা দিল না। বাঁ-হাতটা আলো নেভানোর জন্য সুইচের দিকে যাচ্ছিল। আমি আটকালাম। ওর হাত আর গেল না। চোখ বন্ধ করে নিল তার বদলে। আমার সিদ্ধান্তের ওপর ছেড়ে দিয়েছে ব্যাপারটা। বেচারা! আমি জানতাম ওর গলায় চুমু খেতে হবে। ওটা ওর খুব সেনসিটিভ জায়গা, তখনই বুঝতে পেরেছিলাম। আমি মুখ ডুবিয়ে দিলাম ওর গলায়। জিভ ব্যবহার করলাম। জিভে কিছুটা থুতু নিলাম। ওর গলা থেকে কান অবধি থুতুটা বুলিয়ে দিলাম জিভের ডগা দিয়ে। ও থরথর করে কাঁপছিল। মনে হচ্ছিল মরে-টরে যাবে। এই কি সেই কমিউনিস্ট মেয়েটা! কীসব যেন মুভমেন্ট করে বেড়ায়! বোমা বাঁধাও নাকি শিখে নিয়েছে! কিন্তু এখন তো আমার হাতে একটা মিউজিকাল ইনস্ট্রুমেন্টের মতোই বাজছে! ওর ভিতরের আগুন আমার উইশ অনুসারেই লকলক করে উঠছে। চাইলে এখন ওর আগুনকেও আমি গিলে নিতে পারি।

রাজু নাকি এর জন্যই লাইফ দিতে পারে! আমাকে ছেড়ে একেই নাকি বেছে নিয়েছে রাজু! আমার শুধুই রাজুর মুখটা মনে পড়ছিল। যদি রাজু এখন দেখত ওর গার্লফ্রেন্ডকে আমি কেমন বাজাচ্ছি! একটা বাচ্চা যেমন আরেকটা বাচ্চার ফেভারিট খেলনা নিয়ে নেয়। বাচ্চাই তো!

আমার জিভটা ওর কানের মধ্যে যেতেই সুদীপা কাতরে উঠল। উফ! রাজু যদি এটা শুনতে পেত! আমি ওর কানের মধ্যে আমার গরম নিঃশ্বাসটা ভরে দিলাম। সুদীপার অস্ফুট আওয়াজ শুনে মনে হল ওর কান্না পাচ্ছে। কাঁদবে নাকি?

ও আর দেওয়ালে ঠেস দিয়েও দাঁড়াতে পারছে না। বসে পড়তে চাইছে মেঝেতে। আমি একজন পুরুষের মতোই একটানে খুলে নিলাম ওর নাইটি। ছুড়ে দিলাম মেঝেতে। নিজেরটাও খুললাম। ছুড়ে দিলাম। রাজু পারবে এভাবে সুদীপাকে নিতে? আমার নিজেকে আলেফ মনে হচ্ছিল। সেক্সের মধ্যে ভায়োলেন্স থাকতে হয়। নাহলে জমে না। আমাদের নেকেড বডিদুটো এখন মিশে যাচ্ছে একে অন্যের মধ্যে। বাট ও আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারছে না। আমি আমার একটা পা ওর দুটো পায়ের মধ্যে ঢুকিয়ে দিলাম, যাতে ও আরও কিছুক্ষণ দাঁড়াতে পারে। তখনই হাঁটু

দিয়ে ওর ভ্যাজাইনা ঘসতে শুরু করলাম। প্রচুর পিউবিক হেয়ার ওর। মনে হচ্ছিল হাঁটুটা কোনো জন্তুর গায়ে ঘসছি। বাট শি লাইকড ইট লাইক হেল! চিৎকার করে উঠতে যাচ্ছিল, আমি মুখ দিয়ে ওর মুখ চেপে ধরলাম। যেমন ডুবে যাওয়া মানুষকে তুলে আনার পরে মাউথ টু মাউথ ব্রিদিং দিতে হয়। ও নিজেই ভ্যাজাইনাটা ঘসছে এখন আমার হাঁটুতে।

বেচারা! ওর চোখে জল এসে গেছে।

আমার হাত কোমর থেকে ওর নিতম্বের খাঁজে গেল। ওর অ্যানাসে আঙুল ঢুকিয়ে দিলাম। কে এখন হাইজিন নিয়ে ভাবে। আমি এখন শুধু রাজুকে ভাবতে চাই। সুদীপা আর পারছে না। বুঝতে পারছি ও কতটা ভঙ্গুর এখন। মজা লাগছে আমার। ও এখন একজন শ্রেণিশত্রুর মেয়ের সঙ্গে কী করছে, যদি দেখতে পেত! যদি দেখতে পেত নিজের অবস্থাটা! ও আর চিৎকার করছে না। তাই আমি ওর ঠোঁটের বদলে শক্ত হয়ে ওটা নিপলসে কনসেনট্রেট করলাম। সেইসঙ্গেই আমার হাঁটু তার কাজ করে যাচ্ছে।

নিজেকে নিয়ে প্রাউড ফিল করছিলাম আমি। মনে হচ্ছিল থুতু দিচ্ছি রাজুর আকাঙ্ক্ষার ওপর। রাজুর সো কলড পৌরুষের ওপর।

ম্যাসকুলিনিটি! হু!

একটা মেয়ের শরীরের যে-কোনো অংশই আরেকটা মেয়ের জন্য পেনিস হতে পারে।

এবার আমি সুদীপাকে অ্যালাউ করব শুতে। এবার আমি ওকে বিছানায় নিয়ে যাব। আই'ল মেক হার লিক মাই কান্ট অ্যান্ড মাই অ্যাসহোল... শি উইল বি মাই বিচ টুডে। যতদূর নোংরা করা যায়, আজ সুদীপাকে করব। আগামীকাল রাজু ওকে দেখেই বুঝতে পারবে সোনিয়া বসাক ওর সুইট হার্টকে শেষ করে দিয়েছে। কী করবে তখন রাজু? পুয়োর রাজু?

ব্যাপারটা শেষ হয়ে যাওয়ার পরে আমরা বিছানায় বেশ কিছুক্ষণ শুয়ে থাকলাম। আমার পায়ের কাছে সুদীপার মাথা, আমি ওর বন্ধ চোখগুলো দেখছিলাম। ও ঘুমিয়ে পড়েনি। চোখ বন্ধ করে আছে। ক্লান্তিতে? লজ্জায়? ওর মধ্যে যে এই ব্যাপারটা আছে, সেটা যে এমন সাডেনলি আজ বেরিয়ে আসবে, ও রেজিস্ট করতে পারবে

না, নিজেই এগোতে বাধ্য হবে, ও হয়তো ভাবতে পারেনি। এখন আমার দিকে তাকাতে পারছে না। আগামীকাল সকালে রাজুর দিকে তাকাবে কী করে? আমার নিজেকে বিজয়ী মনে হচ্ছিল। বাট যেন একটা ফাঁকা মাঠের বিজয়ী। কেউ কোত্থাও নেই। চড়া আলো জ্বলে আছে। দেখা যাচ্ছে গ্যালারি ফাঁকা। হাততালি দেওয়ার কেউ নেই।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'তোমার কি খারাপ লাগছে?'

সুদীপা কিছুক্ষণ সময় নিল। তারপর আস্তে আস্তে চোখ খুলে বলল, 'না।' বলেই নিজের দিকে তাকাল। খেয়াল করল ও উলঙ্গ শুয়ে আছে। সঙ্গে সঙ্গে একটা পাশবালিশ টেনে নিয়ে সেটা জড়িয়ে নিজেকে আড়াল করল, বিছানায় উঠে বসল, দেওয়ালে ঠেস দিল। কী আড়াল করছে? কেন আড়াল করছে। ওর নিভে যাওয়া আগুন? আমি হাসলাম। আমিও উঠে বসলাম। বাট হাঁটুতে হাত জড়িয়ে পা ফাঁক করেই বসলাম ওর মুখোমুখি। চোখ তুললেই ও আমার বুবস আর ভ্যাজাইনা দেখতে পাবে। সেটাই চাই। কেন ওর সামনে নিজের লজ্জাকে পাত্তা দেব! আমি তো বিজয়ী! আর ও এখন একটা ফাঁকা মাঠ। হাততালি যদি না থাকে, কী আর করা যাবে!

বললাম, 'বাট... তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে খারাপ লাগছে। ঘেন্না করছে কি, একটু আগে আমাকে নিয়ে কীসব করেছ ভেবে?'

'না। আসলে এটা হয়ে যাবে ভাবিনি।'

'যখন আমার ঘরে এসেছিলে, জানতে না এটা হতেও পারে।'

'না। তোমাকে আমার আগে থেকেই ভালো লাগে। যখনই তোমাকে শহরের রাস্তায় দেখেছি, খুব ভালো লেগেছে। তোমাদের রাজনৈতিক বিরোধিতা হয়তো আমার আছে, কিন্তু তোমাকে আমার খুব ভালো লাগে। সেটা যে আমার মধ্যে এই জিনিস হয়ে আছে, আমি ভাবিনি।'

'কোন জিনিস?'

'যেটা ঘটল। আমি যেটা ঘটতে দিলাম। আমার মধ্যে সমকামী প্রবণতা আছে নিজেই জানতাম না।'

অথচ বলেছিল আমার ঘরে এলে যে বিপদ আছে, ও জানত। কী বিপদ তাহলে সেটা? আমি ওকে ছুরি মারতাম?

'ওটা হয়তো সবার মধ্যেই আছে। জেগে বা ঘুমিয়ে।' বলেই জিজ্ঞেস করলাম, 'সেটা কি খারাপ?'

'খারাপ ভালোর কথা নয়। হয়তো কাউকে ঠকালাম। আমি একটা মধ্যবিত্ত মেয়ে। আমাদের মূল্যবোধ অন্যরকম। আমরা নিজেদের শরীরটা একজনের জন্য বাঁচিয়ে রাখি। বিয়ের পর তার হাতে তুলে দেব বলে।'

কী বোকা বোকা কথা! এই মেয়ে নাকি কমিউনিস্ট! এই মেয়ে নাকি এ দেশের পরিস্থিতি বদলে দিতে চায়! পাহাড় বাঁচানোর বিপ্লব করে!

মজা করে বললাম, 'আমি তো ছেলে নই! কোনো ছেলের হাতে তুলে না দিলেই হল! বাট তুমি কি কুমারীত্ব নিয়ে ভাবছ? তোমার অক্ষত হাইমেন বরের হাতে তুলে দেবে ফুলশয্যায় ফাটানোর জন্য? বিছানার সাদা চাদরে রক্ত লেগে থাকবে? প্লিজ! ডোন্ট বি সিলি!'

'ব্যাপারটা হয়তো অত সোজা নয় সোনিয়া। আমি নিজেকে চিনতে পারছি না।'

আমি ওর দিকে সোজা চেয়ে বললাম, 'প্লিজ সুদীপা! ব্যাপারটা অত কিছু ঘোরালোও নয়। সেক্স হয়ে যাওয়ার পরে এরকম একটা ডিপ্রেসড ভাব আসে অনেকের। বিশেষ করে প্যাসিভ মেয়েদের। তখন তাদের অকারণে মন খারাপ করে। যত আপশোস যেন তাদের ঘিরে ধরে তখন। তুমি প্লিজ ওটা কোরো না। যেটা হয়েছে, দুজনেই এনজয় করেছি। যদি তুমি চাও, আবার হবে। যদি তুমি না চাও, আর হবে না। বাট মূল্যবোধ-টোধের কথা প্লিজ বোলো না। সেক্সের সঙ্গে মূল্যবোধের কোনো রিলেশন নেই। খুব বোরিং লাগে ওসব। এখন এলাম। ঘুম পাচ্ছে।'

ও বসেই রইল সেভাবে। আমি নিজের নাইটিটা গলিয়ে নিয়ে ওর নাইটিটা ওর দিকে ছুড়ে দিলাম। ও সেটা নিল না। কী যেন ভাবছে আকাশ-পাতাল! আমি নিজের ঘরে চলে এলাম। সোজা ঘুমিয়েও পড়লাম। ঘুমটা খুব ভালো হল না। অনেকগুলো স্বপ্ন দেখলাম মনে হয়। সেগুলো মনে নেই। কিন্তু বেশিরভাগ স্বপ্নেই রাজু ছিল। কীসব বলছিল আর করছিল রাজু! খাপছাড়া সব ব্যাপার। আমার দিকে

আঙুল তুলছিল কি? বেচারা! স্বপ্নের মধ্যেও বেচারাই হয়ে আছে! কী করবে ও যদি জানতে পারে ওর সুদীপাকে আমি খেয়ে নিয়েছি? অ্যান্ড... আরও খাব। যে স্বাদ সুদীপা পেয়েছে গতরাতে, ও নিজেকে রেজিস্ট করতেই পারবে না। আবার ছুটে আসবে আমার কাছে। আসবেই। শি মাস্ট। শি উইল বি মাই বিচ... মাই হোর...

বাট... কীসব ভাষা আসছে আমার মনে! নিজেকে মেয়ে বলেই মনে হচ্ছে না!

বায়োলজি এক তাজ্জব জিনিস! সাইকোলজি আরও তাজ্জব!

লাইফ জিনিসটা হয়তো সবচেয়ে তাজ্জব!

ব্রেকফাস্ট টেবিলে রাজু শুধুই সুদীপার দিকে তাকাচ্ছিল। সুদীপা খুব নরমাল থাকার চেষ্টা করছে। অনেকটা পারছেও। বাট রাজু যেন বুঝে ফেলেছে ওর কিছু একটা হয়েছে। সম্ভবত রাজুর চোখে ও চোখ রাখছিল না। আমি দুজনকেই দেখছিলাম। সো মাচ ফান!

হঠাৎ রাজু সুদীপাকে জিজ্ঞেস করল, 'গলায় ওটা কীসের দাগ?'

আমি এতক্ষণে খেয়াল করলাম ওর গলায় আমার দাঁতের দাগ। রাজু লাভ বাইটস চেনে?

সুদীপা অগোছালোভাবে বলল, 'কিছু কামড়েছে হয়তো। পোকা-টোকা...'

বাপি টেবিলে নেই। ভোরেই ব্রেকফাস্ট সেরে বেরিয়ে গেছে। গাড়ি নিয়ে গেছে। সঙ্গে জনার্দন আর দু-একজন লোক। বাপি কোথায় গেছে আমি কোনোদিন জিজ্ঞেস করিনি। আজও ধরে নিলাম শহরের সিচুয়েশনটা শোধরাতেই বেরিয়েছে এত ভোরে। নিশ্চয়ই কিছু লোকের সঙ্গে মিট করার আছে। কথা বলার আছে। সেটার জন্য দেরি করলে চলত না।

সুদীপাই হঠাৎ বলে উঠল, 'আজ থেকে একশো বছর আগে যদি জন্মাত, রাজুদা হয়তো একজন মনীষী হয়ে উঠত। তোমার মনে হয় না সোনিয়া?'

এ কথা কেন! রাজুকে ব্যঙ্গ করছে কেন সুদীপা। নাকি সিরিয়াসলি বলছে? নাকি আমাকেই বিদ্রুপ করছে?

আমি বললাম, 'নাইন্টিন টুয়েন্টি নাগাদ হলে হয়তো রাজু একজন প্রফেট হয়ে উঠত। এখন তো সেটা সম্ভব নয়! সোশ্যাল মিডিয়া এসে পড়ার পরে এখন

সকলেই ছোটো বা বড়ো এক-একজন প্রফেট। রাজুর এখন সেটা হওয়ার চান্সেস কম। বাট তোমার মনে আছে রেস্টরান্টে প্রথম দিনই রাজু তোমাকে বা তোমাদের কেমন জ্ঞান দিয়েছিল? যেন যেশাসের সঙ্গে তার বারোজন শিষ্যের দেখা হয়েছে। তারপর কী হল? ঘোড়ার ডিম। তুমি ছাড়া কেউ-ই ওকে বুঝল না।'

সুদীপা বলল, 'যিশুর শিষ্যরাও কি তাঁকে বুঝেছিল? বিশেষ করে বেঁচে থাকতে?'

আমি আঙুল তুলে বললাম, 'তাহলে আমরা মেনে নিচ্ছি, ও যেশাস হতে চায়?'

রাজু হঠাৎ আমার দিকে তাকাল। ওর চোখ যেমন দেখলাম, মনে হল আহত হয়েছে, একটু হিংস্র হয়ে উঠেছে। সেটা ভালো। বেশ পুরুষ-পুরুষ দেখাচ্ছে ওকে। বলল, 'তাহলে তুই-ই বল তো, সবাই যখন প্রফেট, এ দেশে মুসলিমদের রিয়ালিটিটা তোর মতে কী?'

আমি সময় না নিয়েই বললাম, 'আমি প্রফেট নই। রিয়ালিটি বলে কিছু হয় কি আদৌ? বাট জিজ্ঞেস করছিস যখন বলি, নিজেদের মৌলবাদকে প্রচ্ছন্ন প্রাধান্য দেওয়ার পাশাপাশি প্রতি মুহূর্তে নিজেদের সহনশীল ভারতীয় করে তোলার চেষ্টা করতে হচ্ছে ওদের— এটা অপ্রিয় কিন্তু খুব তেতো সত্যি। আগে এটা ওরা মোটা দাগে প্রকাশ করে ফেলত। ইদানীং শিক্ষার আওতায় এসে সূক্ষ্ম হতে শিখেছে।'

রাজু বিরাট একটা ধাক্কা খেয়েছে বুঝলাম, 'তুই কি সত্যিই এটা মনে করিস?'

'অফ কোর্স! বাংলাটা ঠিকঠাক বলেছি তো?'

'তুই শুধু অসাড় নোস। আজ বুঝলাম এত লেখাপড়া তোর কোনো কাজেই আসেনি। তুই একজন... একজন...'

রাজু কি আমাকে ক্রুয়েল বলতে চায়! কেন বলবে? ও কি বুঝতে পেরেছে আমি সুদীপার সঙ্গে কী করেছি? আরও বিশ্রী কিছু বলতে চাইছে, কিন্তু পেরে উঠছে না। আমি ওর চোখদুটো দেখছিলাম। যতই চেষ্টা করুক, ওর চোখে ঘেন্না ফোটে না। রাগ ফোটে না। ওর চোখের দিকে তাকালে সব কিছু কেমন গোলমাল হয়ে যায়।

তবু আমি ওর সঙ্গে ঝগড়াটা চালাতে চাইলাম, 'আমি কী? পারভার্ট? সাইকো? ফান্ডামেন্টালিস্ট? বুঝতে পারছিস না কী বলবি? আমি তো প্রফেট নই রে! আমি আমার লিমিটেশনের মধ্যে যেটা বুঝেছি সেটাই বললাম। বানিয়ে বললাম না।'

মনে হচ্ছিল রাজু যে-কোনো মোমেন্টে কেঁদে ফেলতে পারে, 'আর ওদের ভয়ে গুটিয়ে থাকা? সেটা তোর চোখে পড়ে না? যে গণতন্ত্র ওদের নিরাপত্তা দিতে পারে না, সেই গণতন্ত্রেই নিজেদের বাঁচানোর জন্য আর নিজেদের পরিচিতিকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য হিন্দুত্ববাদ বিরোধী যে-কোনো দলকেই ওদের যে মরীয়া হয়ে সমর্থন করা, দেখতে পাস না? হিন্দুত্ববাদকে আটকানোর জন্য ভুলভাল প্রার্থীদেরও ভোট দেওয়া? এগুলো তোর মাথায় আসে না? দেখতে পাস না ওরা কেমন জ্যান্তে মরে আছে? যেটাকে তুই ওদের মৌলবাদ বলছিস, বাঙালি মুসলমানের ক্ষেত্রে সেটা সাম্প্রদায়িক অভিমান। হয়তো সেটা অনর্থক। কিন্তু সেটা তো ওদের পক্ষেই বেশি ক্ষতিকর! ওদের সেটা কখনও ভুল রাজনৈতিক আনুগত্যের দিকে নিয়ে যায়, কখনও নিয়ে যায় ধ্বংসের দিকে। কেন দাঙ্গা হয়, কোন অবস্থায় সংখ্যালঘু মানুষ দাঙ্গা করে...'

'বললাম তো, আমি প্রফেট নই।'

'আমিও প্রফেট নই। কিন্তু...'

'তুই একটা ইডিয়ট।'

সুদীপা আমার দিকে তাকিয়ে আছে। আমিও তাকালাম সুদীপার দিকে। সুদীপা চোখ সরিয়ে নিল। কিন্তু বলল, 'আজ মনে হয় রাজুদার মতো ইডিয়টদেরই আমাদের খুব বেশি করে দরকার। যখন বুদ্ধিমান বিবেচনাশীল মানুষরা কিছুই করতে পারছে না, করতে চাইছে না, চুপচাপ দেখছে দেশটা কেমন নষ্ট হওয়ার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে... অশিক্ষিত অমার্জিত চালাক লোকেদের হাতে যখন দেশের ভার...'

'হ্যাঁ। তাহলে আর কী! রাজুকেই চিফ মিনিস্টার করে দেওয়া যাক!'

এই কথাগুলো আমি কেন বলছিলাম নিজেই জানতাম না। এই কথাগুলো তো আমি বলতে চাইনি! তবু বলছিলাম। না চেয়েও আঘাত করছিলাম ওদের দুজনকে। বাট আমার খুব ইচ্ছে করছিল ওদের দুজনকে নিয়ে বেরোই। হেঁটে যাই পাহাড়টার দিকে। সারাদিন পাহাড়ে কাটাই। ওরা অনর্গল কথা বলবে, আমিও প্রচুর কথা বলব, একটা ফাটাফাটি দিন কাটবে তিনজনের একসঙ্গে। হয়তো আমরা তিনজনেই তিনজনকে আদর করতে পারব। কিন্তু একটা রাগ এসে পড়ছিল। আই কুড নট ডিফাইন ইট। রাগটা কেন হচ্ছিল? আমি রাজুকে কোনোদিন পাব না বলে? সত্যিই

কি আমি ওকে চাই? না পেয়ে ওর ওপর রিভেঞ্জ নিতে চাই? গতরাতে আমি যা করলাম, সেটা কি সুদীপার সঙ্গে, নাকি কেবলই রাজুর প্রেমিকার সঙ্গে? আমাকে সিয়োর হতে হবে। নিজের ব্যাপারে সিয়োর হতে পারছি না কেন! আমার মনটা আমার হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে।

আমি কি সত্যিই চাই সুদীপাকে রাজুর থেকে ছিনিয়ে নিতে?

হ্যাঁ, চাই।

ছিনিয়ে নেওয়ার মজাটা কিছুতেই হারাতে চাই না। বাট ছিনিয়ে নিয়েও রাখব কোথায়?

বাপি ফিরল এগারোটা নাগাদ। এমন কোনোদিন দেখিনি বাপিকে। মনে হচ্ছিল কনফিউজড। মনে হচ্ছিল কী ঘটছে বুঝতে পারছে না। বাপিকে দেখে আমার ভালো লাগল না। যে মুখটার দিকে সারা শহর তাকিয়ে আছে, সে মুখে এত ডার্কনেস মানায় না। আই ফেল্ট সামথিং ওয়াজ ভেরি মাচ রং।

বাপি নিজের থেকেই বলল, 'আজ ভোররাতে কিছু লোক ইমামসাহেবের ওপর হামলা করেছে। উনি নিজের বাড়িতে ঘুমোচ্ছিলেন। তারা ঢুকেছে, এবং ওঁকে ছুরি মেরে গেছে। অবস্থা ভালো নয়। সম্ভবত বাঁচবেন না।'

সুদীপা শিউরে উঠে বলল, 'কারা করেছে?'

'সে প্রশ্নটা তো কেউ করছেই না। সবাই ধরে নিয়েছে এটা হিন্দুদের কাজ। কিন্তু আমার মনে হয় না এটা হিন্দুরা করতে পারে। এ কাজ তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। মুসলিম মহল্লায় তারা ঢুকবে কী করে! কিন্তু ওরা সেটা কিছুতেই শুনবে না। ওদের মাথায় খুন চড়ে গিয়েছে। কিছুতেই বোঝানো যাচ্ছে না। ওদের মহল্লার কাছে অরুণ শাঁসকা নামে একজনকে ওরা ধরেছে। তার জামাকাপড়ে রক্ত ছিল। ওদের বক্তব্য সে-ই খুনি। কিন্তু সবাই জানে লোকটা মাতাল। রক্তটা সম্ভবত লোকটার নিজেরই। ওরা সেটা মানবে না। লোকটাকে ধরে রেখেছে। জ্যান্ত ছাড়বে বলে মনে হয় না।'

'তাহলে?'

'খুনোখুনিটা প্রায় থেমেই গিয়েছিল। এই ঘটনার পরে কী হবে কিছুই বলা যাচ্ছে না। মুসলিমরা এখন কোনো কথা শুনবে না। তৌহিদুল একটু আগে ডাইরেক্ট

অ্যাকশনের ডাক দিয়েছে। আমার ফোন ধরলই না তৌহিদুল। এদিকে হিন্দুরাও তৈরি। হিন্দুদের হাতেও প্রচুর বোমা আর বন্দুক এখন। আজ হয়তো অনেক মানুষের প্রাণ যাবে। আমি চিফ মিনিস্টারকে অনুরোধ করেছি তৌহিদুলকে ফোন করতে। যদি তাঁর কথা শোনে।'

রাজু জিজ্ঞেস করল, 'কিন্তু উনি ফোর্স পাঠাবেন না?'

'এখনই না। আগে উনি নিজে ওদের থামানোর চেষ্টা করবেন। একটু সময় দেবেন ওদের।'

'কত সময়? মানুষের নিরাপত্তার কী হবে? পুলিশ নেই, ইন্টারনেট নেই...'

'ধর্ম খুব স্পর্শকাতর জিনিস রাজু। ওঁর কিছু করার নেই এখনই। কিন্তু আজ রূপনগরে কেউ-ই নিরাপদ নয়। তোমরা কেউ বাড়ির বাইরে যাবে না। জনার্দন আর তার লোকেরা বাড়ি ঘিরে থাকবে। এ বাড়ির কিছু হবে না।'

সুদীপা বলল, 'আমি বাবার কাছে ফিরে যেতে চাই। এই অবস্থায়...'

বাপি শেষ করতে না দিয়েই বলল, 'সেটা হয় না। এখন তোমাকে আমি যেতে দিতে পারি না। তুমি ওঁর সঙ্গে ফোনেই কথা বলো। যদি চান, উনিও এ বাড়িতে চলে আসতে পারেন।'

'বাবা কোনোদিনই আসবে না। আমি জানি।'

রাজু যেন সুদীপার অ্যাংজাইটি দেখতেই পায়নি এমনভাবে আস্তে আস্তে বলল, 'এমন একজন মানুষ, যাঁকে দুটো সম্প্রদায়ই শ্রদ্ধা করে, বিবেকের মতো মেনে চলে, তাঁর ওপর এমন আক্রমণ কারা করতে পারে? ওঁকে মেরে কার কী লাভ হতে পারে? উনি ছিলেন বলেই মুসলমানরা পুরোপুরি হিংস্র হয়ে উঠতে পারছিল না। এবার তাদের কে আটকাবে? আচ্ছা, এটা কি সম্ভব যে মুসলিমদের মধ্যেই একটা অংশ এটা ঘটিয়েছে? যাতে দাঙ্গা না থামে? এবং তাদের পেছনে শহরের অন্য কোনো শক্তি কাজ করছে? যে শক্তি হয়তো ধর্মীয় নয়...'

বাপি অবাক হয়ে তাকাল রাজুর দিকে। কিছুক্ষণ চুপ করে চেয়ে থেকে বলল, 'এটা তোমার মাথায় কেন আসছে?'

'সম্ভব কি নয়?'

'সেটা সম্ভব নয় বলেই মনে হয়। হলে আমি জানতে পারতাম।'

'কাকু, এই দাঙ্গা কি তাহলে রাজনৈতিক নয়!'

'এ আবার কেমন প্রশ্ন! পৃথিবীতে কোন ঘটনাটা রাজনৈতিক নয় বলতে পারো? সব দাঙ্গাই রাজনৈতিক। অনেকরকম স্বার্থ জড়িয়ে থাকে প্রত্যেকটার সঙ্গেই। চাওয়া-পাওয়ার অনেকরকম হিসেব কাজ করে। যারা দাঙ্গা করে তারা সেসব বুঝে নেয়।'

'আর যারা সেসব বুঝে নেয়, তারা নিজেরা কি নিরাপদে থাকে না? তারা তো দূরেই থাকে! তারা রক্তপাতের মধ্যে নিজেদের জড়ায় না। শুধু আঙুল হেলিয়ে ইশারা করে। রাজনীতি কী বিশ্রী ব্যাপার!'

'অতটাও বিশ্রী নয় রাজু। কারণ একটা দাঙ্গা থামানোর পথও প্রায়ই রাজনৈতিকভাবেই দেখা দেয়।'

'হ্যাঁ। যেমন আপনি।'

'আমি!'

'আপনি সেই পথটা খুঁজছেন। এজন্যই এ শহরে আজ আপনি একমাত্র ত্রাতা। সবাই আপনার মতো করে কেন যে পৃথিবীটাকে দ্যাখে না!'

আমি রাজুর চোখ দেখছিলাম।

২১

সুদীপাকে দেখে মনে হচ্ছিল ও আমাকে কিছু বলতে চায়, কিন্তু বলতে পারছে না। জিজ্ঞেস করলাম, 'তোকে অন্যরকম লাগছে! কী হয়েছে? বাবার জন্য খুব উৎকণ্ঠা হচ্ছে? ওঁর সঙ্গে তো অনেক লোক রয়েছে! চিন্তা করছিস কেন?'

সুদীপা অন্যদিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে বলল, 'বাবার সঙ্গে যতই লোক থাকুক রাজুদা, বাবা কিন্তু একদম একা। আমি বাবাকে চিনি। নিজেকে খুব খারাপ লাগছে রাজুদা। মনে হচ্ছে আমি বাবাকে বিপদের মধ্যে ফেলে নিজে লুকিয়ে আছি।'

আমি অসহায়ভাবে বললাম, 'কিন্তু কথা তো হচ্ছে ওঁর তোর সঙ্গে!'

'বাবা হয়তো ফোনে আসল পরিস্থিতিটা আমাকে বলছে না। লুকিয়ে রাখছে অনেককিছু আমার থেকে। রাজুদা, আমার নিজেকে খুব খারাপ লাগছে। আমি কি বাবার কাছে যেতে পারব না?'

'উনিই চান তুই এখানে থাকিস।'

'আমি একটা অ্যাডাল্ট মেয়ে। পলিটিকস করি। আমি কি বাবার ইচ্ছেয় চলব?'

'তুই যদি এখন ওঁর সঙ্গে থাকিস, ওঁর দুশ্চিন্তা বাড়বে। ওঁর বিপদ তো কিছু কমবে না তুই সঙ্গে থাকলে! উনি একটা লড়াইয়ের মধ্যে আছেন। সেটায় তুই কেন বাধা হয়ে দাঁড়াবি?'

সুদীপা আমার দিকে তাকাল। কিছুক্ষণ সোজা আমার চোখের দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, 'আমার কি মানায় এভাবে থাকা? তুমিই বলো? আমার বন্ধুরা আমাকে কী ভাবছে জানি না। এখন ওরা আমার ফোন তোলে না। হোয়াটসঅ্যাপে রিপ্লাই দেয় না। কেউ কেউ ফেসবুকে আমাকে আনফ্রেন্ড করে দিয়েছে। ওদের চোখে আমি অনেক নেমে গেছি। আমারও নিজেকে অদ্ভুত লাগছে। আমি চিনতেই পারছি না নিজেকে। শহরের এই অবস্থায় আমি তো লড়তে চাই! মানুষকে বোঝানোর জন্য রাস্তায় নামতে চাই! পাড়ায় থাকলে বাবা হয়তো আমার জন্য দুশ্চিন্তা করত, কিন্তু নিজেকে এমন ছোটো লাগত না। তবু কেন যে আমি বেরিয়ে যাচ্ছি না, কেন রাস্তায় নামছি না, কেন একটা ভীতু প্রাণীর মতো এ বাড়িতে লুকিয়ে আছি, নিজেই বুঝতে পারছি না! হয়তো এ বাড়িটা একটা চোরাবালির মতো। কোথায় যেন আমাকে গিলে

নিয়েছে। আমাকে পিষে নিংড়ে ছিবড়ে করে ফেলছে। যখন এই বাড়ি থেকে বেরোব, হয়তো আমার আত্মা বলে কিছু থাকবে না।'

কথাগুলো বলে ও নিজের ঘরে চলে গেল। ও কী বলতে চাইল? এ বাড়িতে যারা থাকে তাদের আত্মা নেই? আমারও কি নেই বলে ও মনে করে? ওর চোখের মধ্যে একটা কিছু বদলে গেছে। আগের মতো ও আর আমার দিকে সহজভাবে তাকাচ্ছে না। কী যেন একটা বাধা তৈরি হয়েছে। কী সেটা? কেমন যেন এক অপরাধীর মতো ভাব ওর চোখে! বাবার জন্যই কি অপরাধবোধে ভুগছে? কিন্তু কিছু তো করার নেই! একবার ইচ্ছে হল বলি দুজনে মিলে এ বাড়ি ছেড়ে ওদের পাড়ায় গিয়ে উঠব, অনেকের সঙ্গে হাত মিলিয়ে লড়াইটায় অংশ নেব। এমনকি সেই লড়াই যদি সাম্প্রদায়িক হয়, তবুও লড়ব। যদি বিপদ আসে একসঙ্গে লড়ব। কিন্তু বলতে পারলাম না। এমনও তো হতে পারে, ওর চোখে ওটা দোষারোপের দৃষ্টি! ও যে লড়াইটায় নামতে পারছে না, সেটার জন্য কি আমাকেই দায়ী করছে!

আচ্ছা, আমি কি শুধুই বাচাল? কাপুরুষ? আমি কি লড়তে জানি না? সেই শক্তি কি আমার মধ্যে তৈরিই হয়নি? আর আমার কাপুরুষতা আমি সংক্রমিত করেছি সুদীপার মধ্যে? ও কি সেই দোষারোপই করছে?

কী করে বাঁচতে হয়, আমি হয়তো সেটা আজও শিখতে পারিনি। বাবা সেটা অনেকবার বলেছে। নিজে কিন্তু শেখাতে পারেনি। হয়তো বাবা নিজেও সেটা জানত না। তাই আমাকে এখানে কাকুর কাছে পাঠিয়েছে। এখানে এসেও আমি বাঁচতে শিখলাম না। এত যে বই পড়েছি, শিখতে পারিনি। নিজে একটা উপন্যাসিকা লিখে ফেললাম। কী লাভ হল? ওটা আবর্জনা ছাড়া তো কিছুই নয়! বাবা, কাকু, সোনিয়া এরা তো প্রচুর বই পড়ে! বই হয়তো মানুষকে শেষ অবধি কিছু শেখায় না। জীবনই শেখায়। আমার একটা ধারণা ছিল— যারা নিয়মিত বই পড়ে, বিশ্বসাহিত্যের যারা নিবিষ্ট পাঠক, তারা কখনও অন্যায় করতে পারে না, জীবনকে বুঝে নিতে তাদের ভুল হয় না। আমার ধারণাটা সম্ভবত ঠিক নয়। আজ সকালে সোনিয়া এ দেশের মুসলমানদের সম্পর্কে যে উক্তিটা করল, আমার মনে হল ওর এত বই পড়া মিথ্যে হয়ে গেছে। বই মানুষকে বদলে দিতে পারে কি? হয়তো খুব বেশি হলে অনুঘটকের কাজ করতে পারে। মানুষ বদলে গেলে, নিজের থেকেই বদলায়।

জীবনের তাপে ও চাপে বদলায়। জীবন সবসময়ই বইয়ের চেয়ে অনেক বড়ো। বিবেকানন্দকাকু যদি একটা বইও না পড়তেন, যদি একজন নিরক্ষর মানুষও হতেন, তাহলেও একজন বিরাট মানুষই হতেন উনি।

আমার ইচ্ছে করছে নিজের লেখা উপন্যাসিকাটা পুড়িয়ে ফেলি। নষ্ট করে দিই। কী লাভ ওটা রেখে? একজন বিভ্রান্ত মানুষের কি লেখক হওয়ার অধিকার আছে? সে লেখা কেউ পড়ুক বা না পড়ুক, সেই লেখার কোনো অস্তিত্ব রাখাই কি উচিত? যে নিজেই আজও জীবনের হদিশ পায়নি, তার লেখা কাকে কী দিতে পারে!

ফ্রানৎস কাফকা তাঁর সমস্ত লেখা নষ্ট করে দিতে চেয়েছিলেন। কেন? আজ আমি হয়তো সেটা একটু বুঝতে পারছি।

আমি বাঁচা শিখতে চাই। প্রতিদিনই আমি নিজের মতো করে বাঁচা অভ্যাস করি। হয়তো আমার সবচেয়ে বড়ো সমস্যাটা হল— আজও নিজেকে চিনতে পারিনি। অন্ধের মতো হাতড়ে বেড়াচ্ছি নিজের খোঁজে। কেউ যদি আমাকে সত্যিই ভালোবাসত, হয়তো তার চোখের আয়নায় আমি নিজেকে খুঁজে পেতাম। কেউ আমাকে ভালোবাসবে, এটা মনে হয় অসম্ভব।

কিন্তু সুদীপা? ও কি আমাকে ভালোবাসে না? অন্যের ভালোবাসা বোঝা যায় কী করে? নিশ্চিত হওয়া যায় কী করে? চোখের ভাষায়? দেহের সংকেতে? আমার মনে হয় নিজের ভালোবাসা দিয়েই অন্যের ভালোবাসা বুঝতে হয়। আমি পারছি না। আমি কি নিজেই সুদীপাকে ভালোবাসি? হ্যাঁ, ওকে সবসময় দেখতে ইচ্ছে করে। ওর সঙ্গে থাকতে ভালো লাগে। ওর কথা শুনতে ভালো লাগে। ও সঙ্গে না থাকলে আজকাল সব কিছু ফাঁকা লাগে। এই যে ও এই বাড়িতে এসে আছে, আমার ভিতরটা কোনোভাবে ভরে আছে। আনন্দে ভরে আছে। খুব নিশ্চিন্ত আছি। ও যতক্ষণ ওর বাড়িতে ছিল, আমি উৎকণ্ঠায় ছটফট করছিলাম। এটাই কি ভালোবাসা? নাকি এটা শুধুই কাপুরুষতা? আত্মকেন্দ্রিকতা?

রূপনগরে কয়েক মাস থেকেও আমি আজও রূপনগরের পাহাড়টায় যেতে পারিনি। অথচ বাবা যখন এখানে আসার কথা বলেছিল, পাহাড়টার কথা ভেবেই আমার কলকাতা ছেড়ে আসতে কষ্ট হয়নি। আজ যখন রূপনগরে আগুন জ্বলছে, মনে হচ্ছে পাহাড়টা অনেক দূরের। কোনোদিনই হয়তো আমি ওটার কাছে যেতে

পারব না। ও অনেক দূর থেকে আমাকে মাপছে। আমি কত বেঁটে। কত ভীতু। কত নগণ্য। কত অপদার্থ। একটা পাহাড়ের কাছে যাওয়ার যোগ্যতা হয়তো আমার নেই। কোনো পাহাড় হয়তো আমার জন্য নয়!

শ্বাস নিলেই রক্তের গন্ধ পাচ্ছি। নোনতা টাটকা রক্ত। এই গন্ধ আসছে কোথা থেকে? এ বাড়ির আনাচে-কানাচে কি রক্ত ছড়িয়ে আছে? কিন্তু এরকম আমার মনে হচ্ছে কেন? নাকি রূপনগর শহরের বাতাসেই ছড়িয়ে পড়েছে রক্তের গন্ধ! সারা শহরে হত্যালীলা চলছে। নরসংহার চলছে। আমরা এ বাড়িতে জনার্দনের পাহারায় নিরাপদেই আছি। কিন্তু এই নিরাপত্তা খুব ঠুনকো। বাইরে যখন অগণিত মানুষের প্রাণের কোনো মূল্যই নেই, তখন চার দেওয়ালের মধ্যে কিছু মানুষের এই নিরাপদ সুখী জীবনের চেয়ে হাস্যকর আর কী হতে পারে! মনে হচ্ছে এই নিরাপত্তার সারা গায়েই রক্তের গন্ধ। হাতে পাকা পেয়ারা নিলে যেমন হাতের তালুতে গন্ধ রয়ে যায়, হত্যাও মনে হয় তেমনই, তা সকলকেই অপরাধী করে রেখে যায়, আর যদি তা হয় গণহত্যা, সেই অন্যায়ের ভার একজন সরে থাকা মানুষ কোথায় নামাবে! বাংলাদেশে যখন গণহত্যা চলে, গৃহযুদ্ধের আবহ জেগে ওঠে, তখন কি এপার বাংলার একজন মানুষ নিজেকে নিরপরাধ ভাবতে পারে! তার মনের মধ্যে জেগে কি ওঠে না এক অজ্ঞাত অপরাধের বোধ— সে যে বুঝে উঠতে পারছে না কাকে সমর্থন করবে, স্বৈরাচারকে নাকি মৌলবাদকে? তলস্তয় বলেছিলেন অপরাধ কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, একটা অপরাধের জন্য সমগ্র মানবজাতিই দায়ী। এর চেয়ে সত্যি কথা হয় না। আমি হাতে অস্ত্র নিয়ে এই দাঙ্গায় নামছি না বটে, কিন্তু এই দাঙ্গার জন্য আমিও দায়ী। কারণ এই দাঙ্গার পেছনে আমার নীরবতা আছে, যখন এই দাঙ্গা চলছে তখন তা থামানোর জন্য আমার কোনো চেষ্টা নেই, প্রয়াস নেই— এ এক অপরাধ ছাড়া আর কী! এই রক্তের গন্ধ হয়তো আমার সারা শরীর থেকেই আসছি।

সারা শহর থেকে এই দিনের আলোতেই বোমার শব্দগুলো ভেসে আসছে। ওখানে কোথাও এখন সুদীপার বাবা আছেন। ওখানেই কোথাও আলেফ আলী হাতে অস্ত্র নিয়ে বেরিয়ে পড়েছে রাস্তায়। আমি এই বাড়ির মধ্যে বসে আছি। কেবল নিজেই বসে নেই, যে মেয়েটা এ সময় হয়তো লড়াই করত, তাকেও এনে রেখেছি

এই নিশ্চেষ্টতার মধ্যে। সে-ও লড়তে পারছে না। একটু আগেই তাই দোষারোপ করে গেল।

একটু বেরোলাম বাড়ির বাইরে। বাড়ির মধ্যেকার রক্তের গন্ধটা নাক থেকে গেল না।

জনার্দন দাঁড়িয়েছিল, হাতে একটা রাইফেল, বলল, 'বেরোচ্ছেন কেন? বাড়ির মধ্যেই থাকুন। অবস্থা ভালো নয়। শুনতে পাচ্ছেন তো!'

দূরে তখন পরপর কয়েকটা বোমার আওয়াজ শোনা যাচ্ছে।

জনার্দন আবার বলল, 'আজ অগুনতি লোক মরবে এই শহরে।'

জিজ্ঞেস করলাম, 'এ বাড়িতে যদি হামলা হয়, কী করবে জনার্দন?'

জনার্দন উদাসীনভাবে বলল, 'লড়ব। যতক্ষণ লড়া যায়। আমরা থাকতে আপনাদের কিছু হতে দেব না।'

আমার ইচ্ছে হল জিজ্ঞেস করি, কীসের জন্য ওরা লড়বে! টাকার জন্য! আনুগত্যের জন্য! কী পেয়েছে ওরা কাকুর কাছে যে ওরা নিজেরা মরতে ও অন্যকে মারতে এমন তৈরি আছে!

জিজ্ঞেস করলাম, 'এটা তো তোমার শহর নয় জনার্দন! এ শহরে এসে তুমি লড়াই করছ কেন?'

জনার্দন ভাবতে সময় নিল না, 'নেতা তো আমারই! যখন যে নেতার ছত্রছায়ায় থাকব, তার জন্য জান কবুল করে লড়ে যাব। আমার আর কোনো চিন্তা নেই। সব চিন্তা নেতার। নেতা যদি কাউকে মারতে বলে, মারব। যদি মরতে বলে, মরব।'

আমি সত্যিই অবাক হয়ে গেলাম। এমন আত্মসমর্পণ আজকের দিনে সম্ভব! এখন তো কথায় কথায় নেতারা দল বদলে নিচ্ছে! আনুগত্য বদলে নিচ্ছে! বিশ্বাসযোগ্যতা, বিশ্বস্ততা... এসব শব্দ আজ রাজনীতিতে অচল। তার মধ্যে জনার্দন এ কথা কী করে বলছে! এর আগে ও বীরভূমের বাহুবলীর অধীনে ছিল, আজ বিবেকানন্দকাকুর কাছে আশ্রয় নিয়েছে। যদি বীরভূমের সেই নেতা জেলে না যেতেন, ও এই শহরে পালিয়ে আসত না। ও নেতাকে ছাড়েনি। নেতাই ওকে ছেড়ে গেছেন। ও তখন নতুন নেতা খুঁজেছে।

'জনার্দন, তোমার মুসলমানদের সম্পর্কে ধারণা কী?'

'খুব খারাপ জাত ওরা। এ দেশে থাকে, কিন্তু পাকিস্তানের জয়গান গায়। পাকিস্তানে চলে গেলেই পারে! আছে কেন এ দেশে!'

'সবাই কি সেটা করে? সবাই কি তোমার মতে খারাপ?'

'আমি কি গুনে গুনে দেখব ওদের মধ্যে ভালোমানুষ কতজন! বাবা আমাকে ছেলেবেলায় বলে দিয়েছিল— জনা, আর যাই কর মুছুরমানকে কখনও বিশ্বাস করবিনি।'

'কিন্তু ওদের মধ্যে তো শাহরুখ খান আছে! এ পি জে আবদুল কালাম আছেন!'

'এক বস্তা পচা আলুর মধ্যে দু-একটা ভালো আলু থাকলে সেগুলোও পচে যায়। আমিও আপনাকে বলছি, মুসলমানকে বিশ্বাস করবেন না। পস্তাতে হবে। মুসলমানদের কাছে সবার আগে তাদের ধর্ম। তারপর বাকি সব কিছু। হিন্দুদের সেটা নয়। এ দেশে হিন্দুরাই হিন্দুদের সবচেয়ে বড়ো শত্রু। ভিতরে বাইরে হিন্দুদের খুব বিপদ।'

দূরে পরপর কয়েকটা বোমার শব্দ শোনা গেল।

কাছেই অনেকে সমস্বরে চিৎকার করল, 'জয় শ্রীরাম!'

আকাশের দিকে তাকালাম। অনেকগুলো কাক উড়ছে। কিন্তু ডাকছে না। এত কাক ওড়াউড়ি করছে কেন? দূরে পাহাড়টা দাঁড়িয়ে আছে। যেন একটা লাইটহাউস! যেন এই শহরের অভিভাবক! কিন্তু খুব অসহায়। শুধু তাকিয়ে দেখা ছাড়া ওর কিছু করার নেই। আচ্ছা, পাহাড় কি মানুষের আত্মার মধ্যে ঢুকে যেতে পারে! মনে হচ্ছে যেন আমার ভিতরে ওর অস্তিত্বের একটা স্তর তৈরি হয়েছে। আমার আত্মায়। অবিশ্যি সুদীপা তো বলেছে এ বাড়িতে কারও আত্মা নেই। এ বাড়িটা চোরাবালি।

বললাম, 'কিন্তু আলেফ আলী তো আছে! সে-ও কি খারাপ মুসলমান? তোমার সঙ্গে তো তার খুব দোস্তি!'

'আলেফ আলীর সঙ্গে দোস্তি!' হো হো করে হেসে উঠল জনার্দন। ওর হাসি দেখে মনে হল কোথাও যেন কোনো বিপদ নেই। বিপদ থাকলেও ও সেটার পরোয়া করে না। কোনোরকমে হাসি থামিয়ে বলল, 'রাজুবাবু, আপনি এখনও নাবালক আছেন। পলিটিকস আপনি বোঝেন না। শুনুন, আলেফ আলী কারও

দোস্ত-টোস্ত নয়। কারও কিচ্ছু নয়। আলেফ আলী যে কী জিনিস! আপনাকে সেসব আমি বলতে পারব না। তবে ওকে বিশ্বাস করবেন না।'

আবার কয়েকটা বোমার শব্দ।

জনার্দন দাঁতে দাঁত ঘসে বলল, 'একবার আসুক এদিকে! সব কাটাবাচ্চাগুলোকে যদি একের পর এক না শুইয়ে দিই আজ! শালা সবকটার লাশ ফেলে দেব।'

'শুধু মুসলমানদের কথা ভাবছ কেন! হিন্দুরাও তো আসতে পারে! তারা এলে কী করবে? তাদেরও লাশ ফেলে দেবে?'

'কিছু করতে এলে তো ফেলতেই হবে! কিন্তু ওরা আসবে না। কাক কাকের মাংস খায় না।'

'জগন্নাথ গোস্বামী এই সুযোগটা নিতেই পারে কাকুকে রাস্তা থেকে সরিয়ে দেওয়ার।'

'বিবেকানন্দ বসাকের বাড়ির দিকে চোখ তুলে কেউ চাইবে না, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। বাড়ির ভিতরে যান। বেরোবেন না। সেই অস্তরটা সঙ্গে আছে তো?'

'আছে। কিন্তু ওটা চালানোর ক্ষমতা আমার কব্জিতে নেই।'

জনার্দন হে হে করে হাসছিল। আমি বাড়ির মধ্যে এলাম আবার। নিজের ঘরে এলাম। বোমার শব্দ প্রায়ই শোনা যাচ্ছে। আর প্রায়ই ভেসে আসছে সমস্বরে চিৎকার। কাছের চিৎকারগুলো স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে— জয় শ্রীরাম, হর হর মহাদেব ইত্যাদি। কিন্তু দূরের চিৎকারগুলো বুঝতে পারছি না। ওগুলো কি মুসলিমদের রণহুংকার? আজ এই শহরে কতজন মারা যাবে? আজই কি এই শহর শ্মশান হয়ে যাবে? কিংবা কবরস্তান? জগতের যত ক্রোধ, যত রোষ কি আজ রূপনগরের আকাশে জমা হয়েছে?

আমি ওই কাকগুলোর কথা ভাবছিলাম।

নাগরিক পাখিগুলো এখন মাটিতে খাবারের খোঁজে ঘুরে না বেড়িয়ে আকাশে কেন উড়ছে? ওরাও কি মাটিতে নামতে সাহস পাচ্ছে না! ওরা মানুষকে আর ভয় পায় না। মানুষের এঁটোকাঁটা খেয়েই ওদের চলে। কিন্তু আজ মনে হয় ওরা মানুষকে ভরসা করতে পারছে না। কিন্তু ওদের জন্যও আকাশ আছে। সেখানে ওরা আশ্রয় নিতে পারে। মানুষের জন্য তেমন কোনো আশ্রয় নেই।

বাইরে থেকে যখন একের পর এক বোমার শব্দ ভেসে আসছে, স্লোগান শোনা যাচ্ছে বাতাস ফাটিয়ে, আমি মূর্খের মতো নিজের উপন্যাসিকাটা বের করলাম। চোখ বোলাতে শুরু করলাম আবার। কী হয়েছে এটা? কেন লিখেছি? একজন উদভ্রান্ত মানুষের লেখা একটা বিশৃঙ্খল লেখা। এর মধ্যে কি পেরেছি আমি নিজের আত্মাকে ঢেলে দিতে? নিজের শরীর বিছিয়ে দিতে? আমি কি সত্যিই নিজেকে একজন লেখক হিসেবে কল্পনা করতে পারি? কল্পনা কি করতে পারি পাঠক এই লেখাটা পড়ছে, তৃপ্ত হচ্ছে, বা অতৃপ্তির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে?

তবু এটাকে ছিঁড়ে ফেলে দিতে পারি না।

বাড়ির কাছেই একটা মিছিল যাচ্ছে। ঘনঘন 'জয় শ্রীরাম' শোনা যাচ্ছে।

মিছিলটা কিছুক্ষণ বাড়ির সামনে থামল। স্লোগান চলল। তারপর একজন সবাইকে থামতে বলল, এবং চিৎকার করে বলতে শুরু করল, 'ভাইসব, যাদের এই দেশে থাকার কোনো অধিকার নেই, যাদের জন্য পাশেই পাকিস্তান রাষ্ট্র রয়েছে, এই দেশকে টুকরো করে যাদের জন্য সেই পৃথক রাষ্ট্র বানানো হয়েছিল, বাংলাদেশ রয়েছে, তারা সেখানে যায় না, এ দেশেই থাকে, এ দেশেরই নুন খায়, এ দেশেরই সম্পদ শোষণ করে, আর এ দেশের সর্বনাশ করে, যারা আজ আমাদের রক্তপিপাসায় মেতে উঠেছে, তাদের আমরা ছাড়ব না, আজ তাদের রক্তপাত করে এ দেশের মাটিকে পবিত্র করব আমরা। প্রয়োজনে আমরা প্রাণ দিতে প্রস্তুত। প্রয়োজনে আমরা আজ প্রাণ নিতেও তৈরি আছি। ভাইসব, প্রভু রামচন্দ্রের এই দেশে বিদেশিদের অত্যাচার আর আমরা সহ্য করব না। আজ আমরা রক্তবীজের ঝাড়কে শেষ করে দেব। হিন্দুরাষ্ট্রের জন্য যদি আজ আমাদের আত্মবলিদান করতে হয়, সেই মৃত্যু পরম আনন্দের, পরম সুখের। সেই মৃত্যুকে বরণ করে নিতে আমাদের আনন্দ হওয়া উচিত। বলো সবাই... জয় শ্রীরাম!'

সমস্বরে সাড়া উঠল, 'জয় শ্রীরাম!'

'আমরা কারা?

'হিন্দু!'

'লড়বে কারা?'

'হিন্দু!'

একটা বন্দুক গর্জে উঠল।

ওরা কি এবার বাড়ির মধ্যে ঢুকতে চেষ্টা করবে? ওরা কি ভেবেছে বিবেকানন্দ বসাক মুসলিমদের সমর্থন করেন? এটা ওদের শত্রুর বাড়ি?

জনার্দন কী করছে?

কিন্তু মিছিলটা চলে গেল। ওদের স্লোগান ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল বাতাসে। ওই বাতাসের মধ্যেই কোথাও সুদীপার বাবা আছেন। জ্যোতির্ময়বাবু আছেন। ওই বাতাসের মধ্যেই দাঁড়িয়ে আছে রূপনগরের পাহাড়টাও।

কোথায় যাচ্ছে ওরা?

২২

টানা মনখারাপ করা বৃষ্টির মতো দিন আর রাতের মধ্যে কোনো পার্থক্য ছিল না। মৃত্যুর আবহাওয়া উঁচু হয়ে রইল। রাতেও সারা শহর জুড়ে বোমা ফাটল। চিৎকার শোনা গেল। আমরা সবাই জেগে রইলাম। সুদীপা মাঝেমধ্যেই ফুঁপিয়ে উঠছিল। আধঘণ্টা ছাড়াই বাবাকে ফোন করছিল। আমার মা-ও ফোন করছিল সোনিয়ার নম্বরে। আমার কি কলকাতায় ফিরে যাওয়াই উচিত ছিল? কী করলাম এই শহরে বসে? কিছুই তো করতে পারলাম না! কেবল অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করলাম। কিন্তু সে-ও তো ঘরে বসে! বাইরে যাওয়ার সাহস নেই আমার। একবারও দেখতে পেলাম এই দাঙ্গার মধ্যে রূপনগরের সাধারণ মানুষ কীভাবে আছে? রেললাইনের পাশের বস্তিতে কী অবস্থা? নিজেকে মনে হচ্ছিল তারকোভস্কির সিনেমার মতো— যেন আমি একটা ঘোড়া, সমুদ্রসৈকতে আপেল চিবোচ্ছি। দাঙ্গাকে দেখলাম না চোখের সামনে। শুধু তার ত্রাসের মধ্যে বসে থাকলাম। যদি কোনোদিন লেখক হতে পারি, এই অভিজ্ঞতা কাজে লাগবে কি? লাগবে কি সত্যিই? কোভিডের অভিজ্ঞতাকে তো কাজে লাগাতে পারিনি! আমি লেখক হতে পারব না। তবু, অভিজ্ঞতা হল। রাতে কয়েকটা মিছিল গেল বাড়ির সামনে দিয়ে। কিংবা একটাই মিছিল কয়েকবার যাতায়াত করল। সশস্ত্র মিছিল। ওরা লড়াইয়ের দিকে যাচ্ছে, বোঝা যাচ্ছিল। মিছিলগুলো হিন্দুদের। বোঝা যাচ্ছিল শহরে তাণ্ডব চলছে। কোনো পক্ষই পিছিয়ে নেই।

সকালও হল। অদ্ভুত একটা সকাল। আলো যে ফুটে উঠেছে, আলাদা করে বোঝাই যাচ্ছে না। তবু পাখি ডাকছে। জানলা দিয়ে রোদ এসে পড়ছে। বোমার আওয়াজ তখনও মাঝেমধ্যেই শোনা যাচ্ছে। এদের কি ক্লান্তি নেই? নাকি মানুষের রক্তের গন্ধে নেশা আছে?

কাকু ব্রেকফাস্ট টেবিলে থমথমে মুখে জানালেন ইমামসাহেব আর নেই। প্রায় তিরিশজন লোক মারা গেছে এর মধ্যে। আহত অজস্র। হাসপাতালে জায়গা হচ্ছে না। গুরুতর আহত কাউকে রেফার করারও উপায় নেই। অনেক মন্দির ভাঙা হয়েছে। বড়ো রামমন্দিরটা তছনছ করা হয়েছে। সুধানন্দ আশ্রমে আগুন লাগানো হয়েছে। মোহান্তকে জ্যান্ত ফেলে দেওয়া হয়েছে সেই আগুনে। হিন্দুরাও মসজিদের মধ্যে ঢুকে ভাঙচুর চালাতে গিয়েছিল, কিন্তু মুসলিমরা পাহারায় ছিল, এবং সেখানেই সবচেয়ে বেশি লোক মরেছে। বেশি হিন্দুরাই মরেছে, কারণ তাদের মধ্যে সংহতির অভাব ছিল, হাতে অস্ত্র থাকলেও তারা পুরোদমে লড়াই করতে পারেনি। এ হত্যাযজ্ঞ ওপর থেকে ফোর্স না এলে থামবে না। এখনও অবধি সংবাদমাধ্যমে কোনোকিছু আসতে দেওয়া হয়নি। ইন্টারনেট বন্ধ থাকায় সামাজিক মাধ্যমেও কিছু ছড়ায়নি। রূপনগর এখন একটা বিচ্ছিন্ন রণক্ষেত্র। মুখ্যমন্ত্রী ফোর্স পাঠানোর ব্যাপারে ভাবনাচিন্তা শুরু করেছেন। না পাঠিয়ে সম্ভবত উপায় নেই আর। হয়তো আজকের মধ্যেই সেটা হবে।

সোনিয়া ওর চোখের মধ্যে দীর্ঘ প্রত্যাশা নিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'জগন্নাথ গোস্বামী অ্যারেস্টেড হবে তো?'

ওর মাথায় প্রথমেই এই প্রশ্নটা এল! ওর বাপির প্রতিদ্বন্দ্বীর পতন! আর কি কিছু ওর চাওয়ার নেই?

কাকু একটা টোস্টে কামড় দিয়ে আলগাভাবে বললেন, 'জগন্নাথকে তো সবার আগে গ্রেফতার করা দরকার! দেখা যাক!'

'কী আবার দেখার আছে বাপি?'

'গ্রেফতার করার ফলে ওর প্রতি যেন মানুষের সহানুভূতি বেড়ে না যায়, সেটাও খেয়াল রাখতে হবে। হিন্দুত্ববাদ খুবই সাংঘাতিক জিনিস।'

আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'আর তৌহিদুল?'

কাকু আমার দিকে চাইলেন। কিন্তু মনে হল আমাকে পেরিয়ে তাঁর দৃষ্টি চলে গেল। ধীরে ধীরে বললেন, 'সব কিছুই হয়তো সঙ্গে সঙ্গে হবে না।'

আমি হতাশ হলাম। কাকুর গলার স্বরের মধ্যে কিছু একটা ছিল, যা আমাকে অন্ধকার আর ঠান্ডা একটা আবহাওয়ার মধ্যে ঠেলে দিল। যেন একটা খুব পুরোনো কুয়ো। তার মধ্যে জুরাসিক যুগের অন্ধকার, চামচিকের বাস, ভয়প্রদ একেকটা কদাকার ব্যাং...

সুদীপা হঠাৎ বলে উঠল, 'গ্রেফতার করলে তো দুজনকেই একসঙ্গে করা উচিত স্যার! এক যাত্রায় পৃথক ফল কী করে হয়?'

সুদীপার মুখ শীর্ণ দেখাচ্ছে। চোখের তলায় কালি। চোখদুটো তার ফলে আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

কাকু কোনোকিছু লুকিয়ে না রাখার হাসিই হাসলেন, 'পৃথক ফল হবে তো বলিনি!'

'আপনি বললেন সব কিছুই সঙ্গে সঙ্গে হবে না।'

'মুসলিমদের একতা সেটার কারণ। তৌহিদুলকে ওর মহল্লার লোক প্রাণ দিয়েও বাঁচাবে। ফলে তাকে গ্রেফতার করতে গেলে অনেক প্রাণহানির সম্ভাবনা। জগন্নাথের ক্ষেত্রে সেটা হয়তো হবে না। হিন্দুরা অতটা ঐক্যবদ্ধ নয়। তাই জগন্নাথকে তুলে নেওয়া কিছুটা সহজ। সবার আগে যেটা দরকার, সেটা হল হত্যালীলা থামানো। আর যেন সাধারণ মানুষের প্রাণ না যায়! সম্পত্তির সর্বনাশ না হয়। এই শহরটার যা ক্ষতি হল, বহুদিন লাগবে সেখান থেকে ঘুরে দাঁড়াতে। পর্যটন ব্যাবসার তো দফা রফা হয়ে গেছে! সামনেই পুজো। এ সময় শহর ভরে যায় টুরিস্টে। এ বছর সব ফাঁকাই থাকবে।'

কাকুর এসব কথা যেন ওর কানেই ঢোকেনি এমন একটা চোখে তাকিয়ে সুদীপা জিজ্ঞেস করল, 'আর আলেফ আলী?'

কিছুক্ষণ সবাই চুপ। শিখামাসি এসে সবাইকে অমলেট দিয়ে গেল। সোনিয়া ওর প্লেট থেকে মুখ তোলেনি। কাকু সম্ভবত ভাবলেন উত্তরটা কী দেবেন। তারপর বললেন, 'আলেফের তো কোনো দোষ নেই দেখতে গেলে! ও সব কিছুর মধ্যেই ছিল, আবার ছিলও না। যে কমিউনিটিতে ও বিলং করে, সেখানে ওকে থাকতেই

হত। নাহলে ওকে সন্দেহের চোখে দেখা হত। কিন্তু আমি চিফ মিনিস্টারকে বলেছি, ও নিয়মিত আমার সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছে, সব খবর দিয়েছে, আমার লোক হয়েই ওদের মধ্যে থেকেছে, কোনো ক্রাইম করেনি। ওর মায়ের আয়াকে রেপ করে অমন নৃশংসভাবে খুন করা হয়েছে। আলেফ খেপে উঠতেই পারত। ওদের রক্ত তো গরম! কিন্তু ও বদলা নেওয়ার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়েনি। ওর বিরুদ্ধে বলার কিছু নেই। বরং আমাকে সাহায্য করেছে পরিস্থিতিটা সামলাতে, মানে আমি যতদূর পেরেছি আর কী! ওকে তো বরং সাধুবাদ জানানো উচিত! ব্রেভ বয়!' তারপর কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, 'কিন্তু এর মধ্যে বেচারার মা মারা গেলেন। ম্যাসিভ হার্ট অ্যাটাক। দুনিয়ায় ছেলেটার আর কেউ রইল না।'

সোনিয়া যেন দুঃসংবাদটাকে পাত্তাই দিল না। মুখ তুলে বলল, 'টাউনটা এখনও শেষ হয়ে যায়নি, সে কিন্তু শুধু তোমার জন্যই! অনলি ইউ, বাপি।'

কাকু আপশোসের সুরে বললেন, 'শেষ হতে খুব বাকিও নেই। সব কিছু আবার ফিরে পেতে অনেক সময় লাগবে।'

তখনই একটা বোমার শব্দ শোনা গেল। সুদীপা একটু যেন কেঁপে উঠল।

কাকু বললেন, 'ফোর্স না নামলে এ থামবে না। অন্য কোনো উপায় নেই।'

সুদীপা তীব্র কিন্তু কাঁপা গলায় বলল, 'স্যার, রাজনীতির কি এতটাই নোংরা আর ভয়াবহ হওয়ার দরকার আছে! শুধু কোনো সম্প্রদায়ের ভোট কমে যেতে পারে এই ভয়ে ফোর্স আগেই না নামিয়ে, এতগুলো মানুষের প্রাণ নষ্ট হতে দেওয়া... এত কুৎসিত হতে হবে রাজনীতিকে? কমিউনিস্ট আমলে ভাবা যেত এটা, আপনিই বলুন? কমিউনিস্ট আমলে পশ্চিমবঙ্গে একটাও দাঙ্গা হয়েছে? কেন হয়নি? সরকার হতে দেয়নি। বাবরি মসজিদ ভেঙে দেওয়ার পরেও পশ্চিমবঙ্গে কোনো হিংসাত্মক ঘটনা ঘটেনি। অথচ আজ!'

কাকু হাসলেন, 'তাহলে মানুষ তাদের ছুড়ে ফেলে দিল কেন?'

'একটা বিরাট ষড়যন্ত্র হয়েছিল। আপনি সেটা জানেন স্যার। আজ সকলেই জানে। পুলিশের ড্রেস পরিয়ে কাদের সেদিন ঢোকানো হয়েছিল আজ সকলেই জানে।'

'সকলেই জানে? তাহলে সকলে আর তাদের ফিরে চাইছে না কেন? বিধানসভায় আজ একটাও সিট নেই কেন তাদের? লোকসভায় কয়েকটা বাদ দিয়ে সব সিটে

জামানত অবধি ফিরে পায়নি কেন? মানুষ চায় তাদের?'

'মানুষ কি সত্যিই জানে সে কী চায়? মানুষকে ভুল বোঝানো কি আদৌ কঠিন? ইতিহাসের দিকে তাকালেই বোঝা যায় বাংলার মানুষ ইতিহাস থেকে কোনোদিন কোনোকিছু শেখেনি।'

কাকু আর কোনো উত্তর দিলেন না। কিন্তু সোনিয়া মুখ তুলে তাকাল সুদীপার দিকে। সোনিয়ার মুখে একটা অদ্ভুত ভাব। কিংবা সেখানে অনেকগুলো ভাব একসঙ্গে খেলা করছে। আমি বুঝতে পারছিলাম না সোনিয়ার মধ্যে কী চলছে। সুদীপার এই মন্তব্যটার জন্যই ও যেন অপেক্ষা করছিল। কিংবা, এই মন্তব্যটা সুদীপা করতে পারে, এই ভয় ওর ছিল। সুদীপার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকার পরে আমার দিকে তাকাল। চোখ নাচাল। কী বলতে চাইছে? সুদীপা তো ভুল কিছু বলেনি! যেটা বলেছে নিজের আদর্শের দিক থেকে বলেছে। এ বাড়িতে আসার পর এ শহরে ওর বন্ধুরা আর ওর সঙ্গে কথা বলতে চাইছে না। ওর ইমেজের ক্ষতি হয়েছে। কিন্তু কোথাও যেন আরও বড়ো কোনো ক্ষতি সুদীপার হয়ে গেছে। হয়তো ওর আত্মা কোথাও জখম হয়েছে। একটা মেয়ে হয়ে সোনিয়া কি বুঝতে পারছে না সুদীপা কেন এতটা মর্মাহত হয়ে আছে!

আমার হয়তো সুদীপার সঙ্গে কথা বলা দরকার। জানি না ওকে কী বলতে পারি! এখন ওর দিকে তাকালে আমার সমস্ত সংলাপ শুকিয়ে যাচ্ছে। তবু ব্রেকফাস্টের পরে ওর ঘরে গেলাম। ও জানলার ধারে বসে বাইরে তাকিয়ে আছে। হাতে মোবাইল। একটু আগেই হয়তো বাবার সঙ্গে কথা বলছিল। এখন মুখটা একটু সতেজ হয়েছে। আমাকে দেখে হাসল। বিছানায় এসে বসল। আমি ওর পাশে বসলাম। কত সহজে আমরা বিছানায় বসে আছি। অথচ একটা বিছানা আমাদের দুজনের মধ্যে কতকিছু ঘটাতে পারে! বিছানাকে সে সুযোগ আমি দেব না। জানি, ও-ও দেবে না।

'এখানে এনে তোর আমি অনেক ক্ষতি করে দিলাম সুদীপা। তোর ইমেজ নষ্ট হয়ে গেল।'

সুদীপা আমার দিকে তাকাল। মুখ এখন অনেকটা স্বাভাবিক।

'রাজুদা, একটা কথা বলো তো, ভালো না বেসে কারও সঙ্গে তুমি শারীরিক সম্পর্ক করতে পারবে?'

আমি চমকে গেলাম। এ বিষয়ে কথা বলতে তো আমি আসিনি! কিন্তু কি নিয়ে কথা বলতে এসেছিলাম? শুধু জানি ওর সঙ্গে কথা বলতে এসেছিলাম এ ঘরে। মাথায় কোনো বিষয় ছিল না।

তবু জানতে চাইলাম, যেমন মানুষ অপ্রীতিকর প্রশ্নের সামনে বলেই ওঠে, 'হঠাৎ এ প্রশ্ন কেন!'

লীলার ভঙ্গিতে সুদীপা বলল, 'বলো না!'

এই প্রশ্নের কী উত্তর দেব! ওকে কি বলব নিজের শরীরের সঙ্গে আমার একটা যুদ্ধ আছে! ওকে কি বলব সোনিয়াকে আমি ফিরিয়ে দিয়েছি! কেন ফিরিয়ে দিয়েছি! নিজেকে আমার জর্জ বার্নার্ড শ-র নাটকের চরিত্র মনে হল। যেন নারীত্বের গ্রাস থেকে নিজের স্বাধীনতা বাঁচাতে আমি বদ্ধপরিকর— এই আমার আইডিয়া। যেন একটা মেয়ের হাতে ধরা পড়লে আমার কোনো অস্তিত্ব থাকবে না, স্বাতন্ত্র্য থাকবে না, আমি নিশ্চিহ্ন হয়ে যাব। খুব বেশি সচেতন হয়ে উঠলাম নিজের লিঙ্গ সম্পর্কে। ওটা শক্ত হচ্ছে। উঠছে। গনগনে হয়ে উঠছে। আমার পাশেই সুদীপা। কয়েক ইঞ্চির দূরত্বে ওর শরীর। হাত বাড়ালেই ওকে পাব। ও কি বাধা দেবে? আমি জানি বাধা দেবে না। কী করে জানলাম? কেন আমি সব কিছু জানতে পারি আগেই! একজন অজ্ঞ অশিক্ষিত মানুষের নিশ্চিন্ত নিরিবিলি শরীর আর মন কেন আমার হল না! কেন মাথার মধ্যে একটা বোধ কাজ করে! মেয়েমানুষও তো সেই বোধের অন্তর্গত! সুদীপাকে রাক্ষসীর মতো কুশ্রী আর ভয়াবহ মনে হচ্ছিল।

তবু, তুষারপ্রান্তর থেকে ঘুরে এসে মানুষ যেমন দেখতে পায় তার ঘরের আগুন নিভে গেছে, তেমনভাবে আমি বললাম, 'আমি আজও কারও সঙ্গে সেক্স করিনি। আমার কোনো অভিজ্ঞতাই নেই। আমার কি এ নিয়ে কোনো কথা বলা মানায়!'

'অভিজ্ঞতা নেই বোলো না। হস্তমৈথুন তো অন্তত করেছ! সেটাও কি অভিজ্ঞতা নয়? কোনো মেয়েকে ভেবেই নিশ্চয়ই সেটা করতে হয়েছে তোমাকে? তাই না?'

সুদীপার কী হয়েছে? এসব নিয়ে কথা বলছে কেন! এ বাড়িতে বসে ওর মুখে এই কথাগুলো কেমন যেন বেমানান! কিংবা আমার কাছে অপ্রত্যাশিত। হয়তো

পার্কে বসে এ কথাগুলো বললে অনেক বেশি স্বাভাবিক হত। ওকে এখানে এনে আমি কি সত্যিই নষ্ট করে দিলাম!

তবু বললাম, 'সেটা করেছি। করতে হয়েছে।'

'কাকে ভেবেছ? ক্যাটরিনা কাইফকে? কৃতি শ্যাননকে?... নাকি সোনিয়াকে?'

আমি চাইলাম একটা অস্ত্র ছুড়ে ওকে থামাতে, 'তোকেও তো ভাবতে পারি? নাকি পারমিশন নেই?'

ও কেমন ভূতুড়েভাবে হেসে উঠল, 'আমাকে ভাববে? আমাকে ভেবে তোমার হবে? বেরোবে?'

আমি কি লজ্জায় লাল হব এখন? উঠে চলে যাব? শরৎচন্দ্রের নায়কের মতো?

ও নিজেই আবার জিজ্ঞেস করল, 'আচ্ছা রাজুদা আজও তুমি কেন কোনো মেয়ের সঙ্গে সেক্স করোনি? কাউকে পাওনি? নাকি, কাউকে ভালোবাসতে পারোনি বলে?'

'হয়তো সেটা নয়। হয়তো আমার নিজের সঙ্গে বোঝাপড়া অনেক বাকি থেকে গেছে!'

'সেক্স তো খুব সামান্য ব্যাপার আজ রাজুদা! আজকের দিনে কে কার সঙ্গে সেক্স করল, সে নিয়ে কি কেউ মাথা ঘামায়? সেক্স নিয়ে কুসংস্কারগুলো তো বাঙালির মধ্যেও কেটে যাচ্ছে দ্রুত!'

'আমার মধ্যে সেক্স নিয়ে কোনো কুসংস্কার নেই। বললাম তো তোকে, আমার নিজের সঙ্গে বোঝাপড়ার বাকি আছে।'

'কোনো মেয়ে যদি তোমার সামনে এসে তোমাকে... দিতে চায়, তুমি ফিরিয়ে দিতে পারবে?'

'হয়তো পারব। হয়তো দিয়েছি।'

'কাকে ফিরিয়ে দিয়েছ?'

আমি চুপ করে থাকলাম।

'সোনিয়াকে ফিরিয়ে দিয়েছ, তাই না?'

আমি চুপ করেই থাকলাম। বুঝতে চেষ্টা করছিলাম ওর মধ্যে কী চলছে।

'রাজুদা, তুমি কি আমাকে ভালোবাসো? আজ স্পষ্ট বলেই দাও!'

আমি একটুও সময় না নিয়ে বললাম, 'না। তুই যেটা জানতে চাইছিস, সেভাবে নয়। কিন্তু আমি তোর ভালো চাই। তোর সঙ্গে কথা বলতে, সময় কাটাতে ভালো লাগে আমার। তোর কোনো বিপদ হতে পারে জানলে অস্থির হয়ে উঠি। সেজন্যই তোকে এ বাড়িতে এনে রেখেছি।'

'বোনের মতো ভালোবাসো?'

হঠাৎ সুদীপা হাসতে শুরু করল। প্রথমে আস্তে। তারপর হাসির বেগ বাড়তে শুরু করল। মনে হচ্ছিল ওর শরীর মন আত্মা সব কিছু দখল করে নিচ্ছে ওর হাসি। এভাবে হাসতে আমি কাউকে দেখিনি। কী হয়েছে ওর? থামতে চেষ্টা করছে, কিন্তু পারছে না। যত আমার মুখের দিকে চাইছে ততই আরও হাসতে শুরু করছে। আমিই কি ওর হাসির কারণ? কষ্ট পাচ্ছে খুব হাসতে হাসতে। আর পারছে না। চোখ দিয়ে জল আসছে। যেন হাসি আর কান্না একইসঙ্গে ওকে আক্রমণ করেছে। ও অসহায়। আমি যদি সামনে থাকি ও নিজেকে সামলাতেও পারবে না।

আমি উঠলাম। ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম। বাইরে থেকেও ওর হাসির শব্দ শোনা যাচ্ছে।

দেখতে পেলাম সোনিয়াকে। নিজের ঘরের বাইরে দাঁড়িয়ে সুদীপার হাসি শুনছে। ওর মুখেও হাসি। কিন্তু নিঃশব্দ হাসি। ভিতরে সব কিছু ফাটিয়ে বেরিয়ে আসার চাপ সহ্য করেও যেমন মাটির ফাটল থেকে জল চুঁইয়ে চুঁইয়ে বেরিয়ে আসে, ভিতর থেকে কোনো গর্জন শোনা যায় না, অথচ একটা বিস্ফোরণের আভাস জেগে থাকে, সোনিয়ার মুখ যেন এখন সেটাই! রাক্ষসীর মুখ!

ও আমার দিকে এমনভাবে তাকাল, যেন ও কোথাও জিতে গেছে।

কী মানে এর? কী হচ্ছে কিছুই বুঝতে পারছি না। মনে হচ্ছিল আমার মাথায় অসহ্য চাপ পড়েছে। মনে হচ্ছিল হাড়ের বেষ্টনি চুরমার করে ধূসর পদার্থটা বেরিয়ে আসবে, ছিটকে পড়বে, চারদিকে— আমার রক্তাক্ত মস্তিষ্ক, আমার রক্তাভ চেতনা, আমার থেঁতলে যাওয়া স্মৃতি, আমার আহত সিদ্ধান্ত, আমার অকেজো সব অভিজ্ঞতা।

উফ!

আমি প্রায় ছুটে নিজের ঘরে ঢুকলাম। বিছানায় বসে হাঁফাতে লাগলাম।

মনে হচ্ছিল মরে যাব।

সারাটা দিন আচ্ছন্নতার মধ্যে কেটে গেল। কানে কেবল বাজছিল সুদীপার হাসি, আর সোনিয়ার অদ্ভুত মুখ। কী যেন বলতে চাইছে ওরা! কী বলতে চাইছে! ওদের মধ্যে কি কোনো যৌথ সংলাপ গড়ে উঠেছে, যেটার আমি হদিশ পাচ্ছি না! সেটা কি আদৌ আমার অধিগম্য! হয়তো আমার অধিকারই নেই জিজ্ঞাসা করার! হয়তো এক শিশুর মতোই ওদের জগৎ থেকে আমি ছিটকে পড়েছি। ওরা আর আমাকে নিজেদের মধ্যে জায়গা দেবে না, আর আমাকে নিজেদের অন্তর্গত করে নেবে না। কী যেন এক জ্যামিতিক বিন্যাসে আমি আমার জায়গা স্থায়ীভাবে হারিয়ে ফেলেছি। অথচ সেই জায়গাটা এখনও শুধু আমার জন্যই রাখা আছে।

বিকেলে রূপনগরে ফোর্স ঢুকল। বোমার আওয়াজ আর শোনা গেল না। সমস্ত শহরে চেপে বসল নিস্তব্ধতা। যেন এক জাগ্রত শ্মশান। সজীব কবরস্তান।

হিন্দুদের অস্ত্র সমর্পণ করতে বলা হল। তারা প্রথমে রাজি হল না। কিন্তু তাদের নিরাপত্তার দায়িত্ব বাহিনী নেবে, এবং দাঙ্গার জন্য কোনো সাধারণ লোককে ধরা হবে না, এটা নিশ্চিত করে বলার পরে তারা রাজি হল। মুসলিমরা কোনো শর্তেই অস্ত্র দিল না। বাহিনী চাপ দিল না, শুধু তাদের সতর্ক করে দিল যদি তারা কোনোরকম হিংসার দিকে যায়, তাদের মোকাবিলা আর হিন্দুদের সঙ্গে নয়, বাহিনীর সঙ্গেই হবে। এটা শোনার পরে মুসলিমরা নিজেদের মহল্লায় ফিরে গেল। তৌহিদুল ঘোষণা করল তাদের যা কর্তব্য ছিল তা আপাতত শেষ হয়েছে, এখন ভবিষ্যতের অপেক্ষা। তৌহিদুলকে ধরার চেষ্টাই বাহিনী করল না। বাহিনী কেবল চাইছিল শহরটা যেন শান্ত আর নিরাপদ হয়। অপরাধীদের শাস্তি নিয়ে খুব একটা চাপ ওপর থেকে নেই, এটা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল। মুখ্যমন্ত্রী চাইছিলেন দ্রুত আর মসৃণভাবে ব্যাপারটা শেষ করতে।

সন্ধের মধ্যেই জগন্নাথ গোস্বামী গ্রেফতার হল। কিন্তু দাঙ্গার জন্য নয়। আরও কিছু অপরাধের অভিযোগ তার নামে নাকি আগে থেকেই ছিল। সুগতকেও ধরা হয়েছে। সুগত নাকি পালাতে গিয়ে আহতও হয়েছে।

স্থানীয় পুলিশ আবার গর্ত থেকে বেরিয়ে এসেছে। তারা মাইকে প্রচার করছে ইন্টারনেট ফিরে আসার পরে দাঙ্গার কোনো ছবি বা ভিডিয়ো যদি পোস্ট করা হয়,

তাহলে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে। রীতিমতো হুমকির সুর এখন তাদের গলায়।

দাঙ্গা যে হয়েছে, রক্ত যে ঝরেছে, এই সত্যটা নিঃশব্দে মুছে দেওয়া হচ্ছিল। হয়তো সেটাই ঠিক। নাহলে রূপনগরের আগুন সারা পশ্চিমবঙ্গে ছড়িয়ে যাবে। মিডিয়া সব জেনেও চুপ করে থাকতে বাধ্য হয়েছে তাই। জনসাধারণ কী জানবে, সেটা অনেককিছুর উপর নির্ভর করে। যারা মরেছে তাদের পরিবারকে দশ লাখ করে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে এটা রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে মৌখিকভাবে জানানো হয়েছে। আহতরাও ক্ষতিপূরণ পাবে। কিন্তু কোথাও সে কথা লেখা হবে না। ক্ষতিপূরণ কেন? দাঙ্গা করার জন্য? কত সহজে তিরিশজন মানুষের প্রাণহানি টাকা দিয়ে চাপা দিতে পারে একটা সরকার! কী পারে না শাসক!

মুখ্যমন্ত্রী কয়েকদিনের মধ্যেই আসবেন এ শহরে। কাকুকে পাশে রেখে একটা সভা করবেন। কাকুর সঙ্গে উনি নাকি মহাত্মা গান্ধির মিল খুঁজে পেয়েছেন। বলা বাহুল্য, ওঁর এ কথা শুনে সবাই হাসবে। মুখ্যমন্ত্রী ভাঁড়ামি না করে কিছু কি করতে পারেন না?

এইসব খবরই আমি পাচ্ছিলাম, কিন্তু কোনো ক্রোধ হচ্ছিল না, অসন্তুষ্টি হচ্ছিল না, একটা কুয়াশার পর্দার ওপার থেকে সব কিছু শুনছিলাম। যেমন রাতে ঘুমিয়ে প্রায়ই দেখি কুয়াশার মধ্যে ভেড়াগুলোকে। কোনোকিছুকেই বাস্তব মনে হচ্ছিল না। বাস্তব বলে যে কিছু আছে, সেই ধারণাই হারিয়ে ফেলেছিলাম। এভাবেই রাত হল। ঘুমের মতো কিছু একটা আমাকে ঘিরেও ধরল।

কিন্তু সেই ঘুম বা আচ্ছন্নতা, যাইহোক, সেটা ভেঙে গেল মাঝরাত নাগাদ একটা হাসির শব্দেই।

আবার হাসছে! কে হাসছে? সুদীপা? সোনিয়া?

আমি প্রেতগ্রস্তের মতো নিজের ঘর থেকে বাইরে বেরোলাম।

কড়া আলো জ্বলে আছে প্যাসেজে।

কে হাসছে?

সুদীপার ঘর থেকে আসছে হাসির শব্দটা।

সুদীপার ঘরের সামনে দাঁড়ালাম। ভিতর থেকে গলা শুনতে পাচ্ছি। দুজনের গলা। কী বলছে ওরা? সারাদিন একটা ঘোরের মধ্যে কেটেছে। ওদের কথাগুলো সেই ঘোরের সঙ্গেই মিশে যাচ্ছে। অথচ প্রত্যেকটা শব্দ স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছি। কিংবা সেই স্পষ্টতা একটা বিভ্রম। এ জীবনে যেন স্পষ্টতার মধ্যে প্রবেশ করার উপায় আর আমার নেই। যে দরজা আমার জন্য নির্দিষ্ট ছিল, সেটা বন্ধ হয়ে গেছে। এই বিচ্ছিন্নতা নিয়ে আমি কোথায় যাব! কী বলছে ওরা? একবার যেন আমার নাম শুনতে পেলাম সোনিয়ার মুখে। কিংবা হয়তো ওটা সুদীপা উচ্চারণ করল! মাঝেমাঝে গুনগুণ করে গানও গাইছে একজন। সোনিয়া। নাকি সুদীপাও গান জানে!

আমার সব গুলিয়ে যাচ্ছে।

মাথার ওপর প্যাসেজের তীব্র আলো জ্বলে আছে। এত জোরালো আলো কেন! কী দেখাতে চায় এই আলো! এত আলো তো আমি চাই না! এত আলো পৃথিবীও কি চায়! আমি স্বীকারই করি না এনলাইটমেন্টের কোনো প্রয়োজন আছে সময়ের কাছে, সমাজের কাছে, ব্যক্তিমানুষের কাছে। এনলাইটমেন্ট একটা অশ্লীল শব্দ।

হাত রাখলাম দরজায়। দরজাটা খুলে গেল।

এই দরজা আমার জন্য তো নয়! তবু... কেন খুলে গেল!

সোনিয়া উঠে এল। আমার হাত ধরে ভিতরে নিয়ে গেল। কিংবা, এমনও তো হতে পারে, ও সুদীপা... সুদীপাই আমার হাত ধরে ভিতরে নিয়ে গেল। খাটের পাশে একটা চেয়ারে বসাল। আমার চুলে হাত বুলিয়ে দিল। তারপর আমার চুলের মুঠি ধরে একটা জোরে টানও দিল, ঠাট্টা করেই। উহ! আমার লাগল খুব! নাহ, ও সুদীপা হতে পারে না। আমি বিশ্বাস করি না সুদীপা আমাকে কষ্ট দিতে চাইছে। ও কি সোনিয়া হতে পারে? সোনিয়া কি পারে আমাকে শারীরিক যাতনা দিতে? পারে কি সোনিয়া? ওদের কেউ-ই কি পারে?

চিন্তার জ্বলন্ত টুকরোগুলো সারা ঘরে উড়ে বেড়াচ্ছে। আমার করোটির মধ্যে এখন অসহ্য দহন। আমি নিজে পুড়ছি। দেখতে পাচ্ছি বিছানায় দুটো অবয়ব একে অন্যের মধ্যে মিশে যাচ্ছে, মিলে যাচ্ছে, আবার বিচ্ছিন্ন হচ্ছে, আবার জুড়ে যাচ্ছে, গলে যাচ্ছে, পুড়ে যাচ্ছে, ধুলো হয়ে উড়ে যাচ্ছে গুঁড়োয় গুঁড়োয়। আমি চিনি

ওদের। অথচ এখন যেন কিছুতেই চিনতে পারছি না। ওরা কারা? সোনিয়া? সুদীপা? কিংবা কোনো নাম দিয়ে ওদের আলাদা করা যাবে না। ওই তো ভিক্তোরিয়া ওকাম্পো! প্লাতা নদীর পাশে একটা কাঠের বাড়িতে থাকত। আমি যখন বিকেলে হাঁটতে যেতাম, আমার দিকে চেয়ে থাকত। মনে হত, আমার মুখের দিকে তাকিয়ে আমার শিশ্নের মাপ বুঝে নিচ্ছে। ওই তো মার্গারেট এলিজাবেথ নোবেল! আমার কাকার মেয়ে। একদিন উত্তর কলকাতার নির্জন গলিতে আমাকে জড়িয়ে ধরতে চেয়েছিল, বলেছিল আমার পুজো করতে চায়, আমি পালিয়ে গিয়েছিলাম, ও পেছন থেকে চাপা গলায় চেঁচিয়ে বলেছিল— কাওয়ার্ড! ওই দুটো অবয়বের মধ্যে আমার যাবতীয় তৃষ্ণা, যাবতীয় পিপাসা, যাবতীয় চাওয়া, না-চাওয়া, পাওয়া, না-পাওয়া দাউদাউ করে জ্বলছে। কত মুখ উঁকি দিচ্ছে! কিছু মুখ চেনা। কিছু অচেনা।

পাপ আর অপরাধের মধ্যে মনে হচ্ছে ওটা আমার সামনে কোনো বিছানা নয়— কিন্তু আমারই চিন্তার লেলিহান আয়তক্ষেত্র।

আমি চেয়ারে বসে তাকিয়ে রইলাম। আমার দেখার মধ্যে কোনো ধীরতা নেই, কোনো প্রতিশ্রুতি নেই। বিফল চেয়ে থাকা। ওই যে দুটো মেয়ে কী যন্ত্রণা নিয়ে ওরা নিজেদের মধ্যে ডুব দিয়েছে, আমি কোনোদিন বুঝব না। অথচ ওই যন্ত্রণা দিয়েই ওরা আমার সামনে ওই দৃশ্য রচনা করতে পেরেছে। একের-অপরের প্রতি সমঝোতা, একের-অপরের প্রতি সমর্থন। দুটো মেয়ের মধ্যে। আমি আমার শুকনো লিঙ্গ দিয়ে, ক্ষয়প্রাপ্ত স্তনবৃন্ত দিয়ে তা কি কোনোদিন বুঝতে পারব! আমি যেন সামগ্রিক অচেতনায় ডুবে আছি এখানে, চেয়ারটায় বসে, একটা ঝড়ের মধ্যে বসে আছি, অথচ দুলছি না, নড়ছি না, কাঁপছি না, যেন বসে আছি কোনো স্থিরবিন্দুতে।

নিজেরই হাতের মুঠোয় আমি টুকরো টুকরো হয়ে যাচ্ছি।

প্রত্যেকটা টুকরোয় গনগন করছে আগুন।

ওদের আগুন? একে অন্যের যোনিতে মুখ রেখে ওরা হাসছে আমার দিকে চেয়ে।

দুই রাক্ষসী! যাদের মধ্যে সাম্যবাদ আর পুঁজিবাদকে আলাদা করা যাচ্ছে না। ক্লাস... ক্লাস আলাদা করা যাচ্ছে না। অর্থনীতি, রাজনীতি, সমাজতন্ত্র, প্রজাতন্ত্র, গণতন্ত্র, স্বৈরাচার, নারীবাদ, মহাকাশ, সৌরজগৎ, প্রোগ্রামিং, ধর্ম, অধর্ম,

আস্তিক্যবাদ, নাস্তিক্যবাদ, হাইজিন, জলবায়ু... সব একাকার! ভালোবাসতে পারা আর না-পারার মধ্যে...

একজন হাতছানি দিচ্ছে আমাকে। ওই তো সোনিয়া। আজ অবধি চোখের সামনে কোনো মেয়েকে আমি উলঙ্গ দেখিনি। এই তো দেখতে পাচ্ছি। সোনিয়া। সুদীপা। ওরা কী বলতে চাইছে আমাকে। আমাকে কি পাগল করে দিতে চায়? ওরা কি জানে না আমি এমনিতেই পাগল?

হাতছানি দিচ্ছে আমাকে সোনিয়া।

সোনিয়া বলল, 'কাম! জয়েন আস!'

ওদের এখন আলাদা আলাদা করে চিনতে পারছি। ওই তো সোনিয়া! ওই তো সুদীপা! চোখের সামনে কুয়াশাটা কেটে যাচ্ছে। কেন কেটে যাচ্ছে? আমাকে শাস্তি দেবে বলে? কীসের শাস্তি? পাপের? অপরাধের? কী করেছি আমি?

আমি উঠলাম। যেন ভেসে গেলাম ওদের দিকে। আমাকে ওরা টেনে নিল।

ওরা হাসছে। ওদের মধ্যে আমিও একটা পিণ্ড হয়ে গেছি। আমার হাত নেই, পা নেই, মুখ নেই, গলা নেই, বুক নেই, আছে কেবল একটা... শিশ্ন। আমার সারা শরীর একটা শিশ্ন। আমার সব প্রতিরোধ, শরীর নিয়ে আমার সব পরীক্ষা ওরা নষ্ট করে দিচ্ছে, ধ্বংস করে দিচ্ছে... ওদের মধ্যে, ওদের সঙ্গে মিলে আমি এখন মাংস ছাড়া কিছু নই। কিন্তু মাংসের সঙ্গে আত্মার দূরত্ব কে কবে মাপতে পেরেছে! আমার আর কোনো বিচ্ছিন্নতা নেই। আমার আর কোনো আংশিকতা নেই।

নিজেকে আমার এত পূর্ণ লাগছে কেন?

'রাজুদা...'

'অ্যাই রাজু... রাজু... উফফফ!'

এই আগুন আর কুয়াশার মধ্যে নিজেকে এত চরিতার্থ কেন মনে হচ্ছে আমার! যেন উপবাসের দিনে আমাকে খেতে দেওয়া হয়েছে, আর আমি নিজের ধর্মের কথা না ভেবে, অন্য কারও অনাহারের কথা না ভেবে নিজে গোগ্রাসে খাচ্ছি, আমার পাকস্থলী ভরে গেছে, আমার মুখে লালারস ধন্য হচ্ছে, দাঁতগুলো কৃতজ্ঞ হয়ে উঠছে, নখগুলো চাইছে জীবনে প্রথমবার তাদের প্রাপ্য বুঝে নিতে, এই মুহূর্তে প্রত্যেকটা দৃশ্যে প্রত্যেকটা শ্রাব্যে আমি পরম বিস্মিত হচ্ছি, এই কি অভিজ্ঞতা,

এই কি স্মৃতির সঞ্চয়, আমার আশা আমার হতাশা যখন অন্নের ভিতর দিয়ে তৃপ্ত হচ্ছে, আমারই ভিতরের বাতাসপূর্ণ অন্ধকারে। ওরা আমাকে শাস্তি দিতে চায়। প্রতি মুহূর্তে বুঝতে পারছি ওরা আমাকে প্রত্যেক স্পর্শে বুঝিয়ে দিচ্ছে আমার প্রতি তীব্রতম দোষারোপ। কিন্তু আমার তো মনে হচ্ছে আমি কেবল ভূমিকা নিচ্ছি না এই শরীরী নাটকে। আমি তো একজন দর্শকও বটে! ওদের হাড়ের ওপর চেপে থাকা মাংস টের পেতে পেতে, ওদের মাংসের ওপর বিছিয়ে থাকা চামড়ায় হাত রেখে, ওদের শরীরের রক্তস্রোত বুঝে নিতে নিতে আমার মনে পড়ছে নিজের ব্যর্থ উপন্যাসিকাটার কথা! আমার মনে পড়ছে এই শহরে নষ্ট হওয়া তিরিশজন মানুষের প্রাণ!

বিস্তীর্ণ একটা মাঠের মধ্যে উঠে আসা বিরাট একটা চাঁদের মতো আমাদের মধ্যে জেগে উঠেছে এক আলোর উৎস। এনলাইটমেন্ট নয়। এনলাইটমেন্ট নয়।

শরীরের খেলা মানুষকে এতকিছু দিতে পারে!

আমার শিশ্ন কে মুখে ভরে নিয়েছে!

কে?

সুদীপা? সোনিয়া?

এ কী বিকৃতি! এ কী পশ্বাচার!

আমার ভিতরে বাস করা পিশাচটা এখন কী করবে?

কিন্তু আমার মনে হচ্ছিল এই মুহূর্তেই আমি যদি লিখতে বসি, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ উপন্যাসটা আমি লিখে ফেলতে পারব। আমাকে কেউ আটকাতে পারবে না। আমিই হয়ে উঠব বাঙালির প্রফেট। আমার কথা ধ্রুব হবে। অক্ষরে অক্ষরে মিলে যাবে ভবিষ্যতের সামনে। ঠিক এই মুহূর্তেই আমার সামনে যদি কেউ মেলে দেয় লেখার খাতা।

কে যেন আমার মুখে চেপে ধরেছে নিজের যোনি!

কে? সোনিয়া? সুদীপা?

আমি উন্মাদের মতো চাটতে শুরু করলাম।

ওহ কতখানি পশু হয়ে উঠতে পেরেছি আমি!

এমন শান্তি জীবনে পাইনি। আমার সব দ্বিধা কেটে যাচ্ছে। সব দোলাচল মিটে যাচ্ছে। সব ভান ঝরে যাচ্ছে। নিজের সঙ্গে দেখা হচ্ছে আমার। নিজের মুখ দেখতে পাচ্ছি। জীবনে প্রথমবার।

অন্য কোনো আলোর আর প্রয়োজন নেই আমার।

কোনোদিন কি আমি আলো চেয়েছিলাম সত্যিই? হতে কি চেয়েছিলাম তিমিরবিনাশী?

আজকের পর কি আমি লেখক হতে পারব? আর কি বানাতে হবে না আমাকে? ফেনাতে হবে না? নিজের সঙ্গে লুকোচুরি খেলতে হবে না? মনে হচ্ছে জীবনের সব উন্মাদনার চাবি আজ আমি খুঁজে পেয়েছি। নিজের পিশাচকে নিঃশেষে মেরে ফেলার পথ আমি খুঁজে পেয়েছি। এখন ওরা খেলছে আমাকে নিয়ে। খেলুক!

'আহ!'

আমি চোখ বন্ধ করে পুরোপুরি আত্মসমর্পণ করলাম।

নিজের ঘরে যখন ফিরে এলাম, ওরা ও ঘরেই ঘুমিয়ে পড়েছে, কিন্তু আমি নিজের ঘরে ফিরে এলাম, বের করলাম উপন্যাসিকার পাণ্ডুলিপিটা। অনেক মিথ্যে রয়ে গেছে এটার মধ্যে। কিন্তু অনেক সত্যও আছে। আছে কিছু খাঁটি ক্রোধ, শুদ্ধ অভিমান। সেগুলো ব্যর্থ হওয়ার নয়।

উন্মাদনা কখনও ব্যর্থ হয় না।

এই প্রথম নিজের লেখার প্রতি আত্মবিশ্বাস খুঁজে পেলাম আমি। কারণ এই মুহূর্তে আমার হারানোর আর কিছু বাকি নেই। কী হারাতে পারি আমি আজ? আমার দীর্ঘ অবরোধ, অনন্ত অবদমন আজ ধ্বংস হয়ে গেছে।

একটু আগে যেটা ঘটে গেল, হয়তো আমার জীবনে বিপুল ভূমিকম্পের মতোই একটা কিছু, এই মুহূর্তেই আমার মন সেটা থেকে ডুব দিল পাণ্ডুলিপিতে। আত্মবিশ্বাসের মধ্যেও, সত্যিই, নিজের মনকে চিনতে পারা খুব কঠিন। কঠিন কেন বলছি! চেনা যায় না। হয়তো চেনার চেষ্টা করাটা লেখকের কাজ নয়। ঋষির কাজ। সন্তের কাজ। আমি তা নই। আমি কি তখনই শুদ্ধ, তখনই খাঁটি, যখন আমি পশু? কিন্তু সেই পশুত্বের সঙ্গে দেবত্বের তফাত কোথায়? মিলন কোথায়? আজ আমাকে

এই উপন্যাসিকার সঙ্গে একটা ফয়সালা করতেই হবে। মনের এই অবস্থা থাকতে থাকতে সেটা যতদূর করে ফেলতে পারি, ততই ভালো। এরপর হয়তো আবার মনের মধ্যে চেপে বসবে কোনোকিছু হারিয়ে ফেলার ভয়। অজ্ঞাত কিছু হারিয়ে ফেলার ত্রাস।

উন্মাদের মতোই কাটতে শুরু করলাম একের পর এক শব্দ, একের পর এক বাক্য। একেকটা পাতা ছিঁড়ে ফেললাম। যা একসময় সত্য ছিল, আজ আর তা নয়। আজ এক অন্য মানুষ উপন্যাসিকাটায় হাত দিয়েছে। লেখাটা অনেক ছোটো হয়ে আসছে। অনেক অবান্তর অংশ খসে পড়ছে। সেগুলো এই মুহূর্তের অপেক্ষাতেই ছিল, কখন আমি দেব তাদের নির্বাসন। এই মুহূর্তে আমার যেটাকে সত্য মনে হচ্ছে, সেটাই সত্য, যেটাকে মিথ্যে মনে হচ্ছে, সেটা মিথ্যে।

কখন ভোর হয়েছে খেয়াল নেই।

একসময় চোখে পড়ল জানালার বাইরে আলো ফুটেছে। পাখিগুলো ডাকছে।

আমারও কাজ শেষ হয়েছে। হয়তো এই উপন্যাসিকা কোনোদিনই ছাপা হবে না। কিছুই হয়নি এটা। কিন্তু আজ যে আমি লিখতে পারলাম, কাজ করতে পারলাম, নিজেকে সফল মনে হচ্ছে, এই সফলতা একজন লেখকের নিশ্চয়ই, আজ আমি নিজেকে প্রথমবার লেখক ভাবতে পারছি, যার একজনও পাঠক নেই, হয়তো তার কোনো পাঠক জন্মাবে না কোনোদিন, এই পাণ্ডুলিপিটা অনস্তিত্বের মধ্যে একদিন মিলিয়ে যাবে, অপঠিত থাকবে তখনও, তবু, আজ প্রথমবার মনে হচ্ছে কিছু লিখলাম, কিছু লিখতে পারলাম, কিছু হোক না হোক। জানি না আগামীকাল এই পাণ্ডুলিপির দিকে চেয়ে আবার ব্যর্থতার বোধ আমার মাথায় আসবে কিনা। কিন্তু আজকের এই তৃপ্তি মিথ্যে নয়।

পাখিগুলো ডাকছে। পাখিগুলো...

হঠাৎ আমার বুকের মধ্যে দীর্ঘ একটা তৃষ্ণা জেগে উঠল। এই ঘর থেকে, এই বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ার তৃষ্ণা। খুব ইচ্ছে জেগে উঠল আজ, এখনই, পাহাড়টার কাছে যাওয়ার। মনে হচ্ছিল আমার বুকের মধ্যেই পাহাড়টা জেগে উঠেছে, আর আমাকে ডাকছে। যেন ওর কাছে যেতে পারলে নিজের কাছে আমার চেতনা আরও স্পষ্ট হয়ে উঠবে। মনে হচ্ছিল কী যেন প্রতিশ্রুতি রয়েছে ওর কাছে আমার, কিংবা

আমার কাছে ওর। অস্থির হয়ে উঠলাম বেরিয়ে পড়ার জন্য। ওর উচ্চতার কাছাকাছি একবার পৌঁছোনোর জন্য। দূর থেকে যে দেখেছি ওর সারা শরীরে অরণ্যের হাতছানি, কাছে গেলে কি দেখতে পাব ও কর্কশ কঠিন অজস্র পাথর দিয়ে গড়া? লক্ষ লক্ষ বছর আগেকার পাথর? কোটি কোটি বছর আগেকার পাথর? ওর চূড়ার কাছাকাছি নাকি কোন প্রাচীন রাজার শিলালিপি আছে। ওর চূড়ায় নাকি আছে কোনো অজ্ঞাত যুগের একটা মন্দির। সেটার মধ্যে আজ আর কোনো দেবমূর্তি নেই।

আমার সেসব দেখতে ইচ্ছে করছে। ছুটে যেতে ইচ্ছে করছে এখনই।

ব্রাশও করলাম না। মুখও ধুলাম না। বেরিয়ে পড়লাম ঘর থেকে।

কিন্তু সদর দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে জনার্দন অলসভাবে বিড়ি টানছে। ওর ভঙ্গির মধ্যে কেমন একটা ঢিলেঢালা ভাব থাকে সবসময়। যেন কোনোকিছুতেই কিছু এসে যায় না ওর। কিন্তু মুহূর্তের মধ্যেই টানটান হয়ে উঠতে পারে। তখন মনে হয় ওর মধ্যে একটা শ্বাপদ লুকিয়ে আছে।

আমাকে বেরোতে দেখেই খপ করে আমার হাতটা ধরে নিল, 'কী ব্যাপার রাজুবাবু? বেরোচ্ছেন নাকি?'

'একটু ঘুরে আসি। আজ বাইরে যেতে খুব ইচ্ছে করছে।'

'না না, কোথাও যেতে হবে না। ছাতে গিয়ে হাওয়া খান।'

'বেরোতে হবে জনার্দন। বাড়ির মধ্যে অসহ্য লাগছে আমার।'

'আপনাকে যেতে দিয়েছি শুনলে উনি খুব রেগে যাবেন রাজুবাবু। বকাবকি করবেন।'

'কিছু হবে না। তুমি বোলো আমি তোমার বারণ শুনিনি।'

'এই তো মুশকিল করলেন! অস্তরটা সঙ্গে আছে?'

'না। ওটা নিতে আমার ভালো লাগে না। শহরে এখন ফোর্স আছে তো! কিছু আর হবে না।'

'যতই ফোর্স থাক। কিছু বলা যায় না। ওটা নিয়ে আসুন। আমি দেখছি তারপর।'

আবার ঘরে গেলাম। আলমারি থেকে পিস্তলটা নিলাম। ঠান্ডা কনকনে হয়ে আছে সেটা। ট্রাউজারের পকেটে ভরতেই পকেটটা বিশ্রীভাবে ঝুলে গেল। কী হবে এটা

রেখে? আমি চালাতে জানি। জনার্দনই দেখিয়ে দিয়েছে। কিন্তু চালাতে পারব না কোনোদিনই।

সবাই সব পারে গো জনার্দন! আমি কি আলেফ আলি?

বেরোতেই জনার্দন বলল, 'একা যেতে দেব না। সঙ্গে তারককে নিয়ে যান।'

তারক দেখলাম তৈরি। কিন্তু ওর সঙ্গে বেড়াতে যেতে হবে! লোকটাকে দেখে মনে হয় সকালের হাওয়ায় একজন মানুষ কেন বাড়ির বাইরে যেতে চায়, ও বোঝে না। ও বোঝে না কেন একজন মানুষ মরিয়া হয়ে পাহাড়ের কাছে যেতে চায়, পাহাড়ের সঙ্গে একজন মানুষের কী কথাবার্তা থাকতে পারে। এই লোকের মধ্যে কোনো বিস্ময়বোধ নেই। আনন্দ কাকে বলে এ জানে না। এর সঙ্গে বেরিয়ে আমি কোথায় যাব? কিন্তু জনার্দন ছাড়ল না। তারক আমার সঙ্গে চলল।

একটু এগোতেই তারক বলল, 'সকালে হাঁটা ভালো। খিদে হয়।'

আমি কিছু বললাম না।

তারকই আবার বলল, 'কতদূর যাবেন? জনার্দনদা বেশি দূর যেতে মানা করেছে।'

'চলো না!' আমি বিরক্তি আড়াল না করেই বললাম, 'তোমার চিন্তা নেই।'

এই লোকটাকে আমি সহ্য করতে পারছি না কেন? আমার মতো নয় বলে? আমার শরীর-মন সব কিছু এই লোকটার থেকে ছিটকে যেতে চাইছে। অসহ্য লাগছে লোকটার এই সঙ্গে সঙ্গে চলা।

মোড়ের মুখে এসে দেখলাম চারদিকে ধ্বংসের চিহ্ন। বেশ কিছু দোকানপাট ভাঙা হয়েছে। অজস্র জিনিস ছড়িয়ে আছে ফুটপাতের ওপর। স্বাভাবিক দিন হলে এতক্ষণে কয়েকটা দোকান খুলে যেত। আজ বন্ধ। কেবল অজস্র পায়রা উড়ছে ফুটপাতে আর রাস্তায়, আর তাদের ফাঁকে ফাঁকে কিছু কাক। বাহিনী টহল দিচ্ছে। আমাদের দেখে কয়েকজন এগিয়ে এল। জানতে চাইল আমরা কেন বেরিয়েছি। তারক বলল আমরা বিবেকানন্দ বসাকের লোক। শুনে আর কিছু বলল না। বুঝলাম এরা সকলেই বাইরে থেকে এসেও কাকুকে চেনে। আমাদের সঙ্গে অস্ত্র আছে। যদি সার্চ করত, আমাদের গ্রেফতার হওয়ার কথা।

চললাম পাহাড়ের রাস্তাটার দিকে। আজ পুরোপুরি নির্জন এই রাস্তা। লাল মোরাম উজ্জ্বল হয়ে আছে। পাথরগুলো ঝকঝক করছে। আর সবুজ বন দু-পাশে। এখানে

এলে মনেই হয় না একটা শহরের খুব কাছাকাছি আছি। খুব ইচ্ছে করছিল যদি একবার জ্যোতির্ময়বাবুর সঙ্গে দেখা হয়! অনেক কথা জমে আছে, যা কেবল ওঁকে বলা যায়। উনিও আমাকে দেখলে সুখী হতেন। হয়তো সঙ্গে তারককে দেখতে ওঁর ভালো লাগত না। হয়তো উনি আমার ট্রাউজারের বিসদৃশভাবে ঝুলে থাকা পকেটটার দিকে তাকাতেন। তারপর কি স্বাভাবিকভাবে কথা বলতে পারতেন?

হঠাৎ মাথায় একটা প্রশ্ন এল— উনি বেঁচে আছেন তো? ওই তিরিশজনের মধ্যে উনিও নেই তো?

মনের মধ্যে যেন নিজের খরচে ডেকে আনা অন্ধকার ঘনিয়ে এল।

দূরে পাহাড়টা সকালের রোদ মেখে দাঁড়িয়ে আছে। যেন গত কয়েকদিনের ক্ষতচিহ্নের মধ্যে ঢুকে গেছে আজ সকালের রোদমাখা কাচ। ঠিক করলাম আজ পাহাড়টায় যাব। এতদিন চেষ্টা করেও যেতে পারিনি, আজ যাব ওর কাছে। উঠব ওর চূড়ায়। দেখব কেমন সেই শিলালিপি।

এগিয়ে চললাম।

তারক বেশ কিছুক্ষণ উশখুশ করছিল। এবার বলল, 'আর কতদূর যাবেন আপনি?'

সরাসরি স্পষ্ট উত্তর দিলাম, 'আমি আজ ওই পাহাড়টায় যাব তারক। তুমি ইচ্ছে করলে ফিরে যেতে পারো।'

তারক রুষ্ট গলায় বলল, 'আমি আপনাকে ছেড়ে ফিরতে পারব না। জনার্দনদা মেরে ফেলবে। আর, আমি এগোতেও পারব না।'

'কেন?'

'আর একটু গেলেই তো সেই জায়গা!'

'কোন জায়গা?'

'যেখানে সেই কুমকুম মেয়েছেলেটার লাশ পড়েছিল।'

এসব কী! ভূতের ভয়! এমন তাগড়া একটা লোকও একটা মরা মেয়ের আত্মাকে ভয় পায়!

'তাতে কী?' হেসে উঠে এটা বলেই আমার মনে হল ওর এই উক্তির মধ্যে একটা গভীর অতল খাদ রয়েছে, আমি যার কিনারায় ওর অসাবধানতায় পা রেখে

ফেলেছি— কিন্তু পতনটা এখন কার হবে?

আমি ফিরে দাঁড়ালাম, যেমন করে বাগানে গজিয়ে ওঠা অচেনা গাছের দিকে কৌতূহলী মালি ফিরে তাকায়, 'তুমি জানলে কী করে কোথায় ওর লাশ পড়েছিল? তুমি কি দেখতে এসেছিলে?'

তারক হকচকিয়ে গেল, আর আমার চোখের দিকে তাকাচ্ছে না, সারা শরীরে একটা চমকে যাওয়া পশুর অস্থিরতা জেগে উঠেছে, উত্তর দিচ্ছে না, মনে হচ্ছে এখন আমাকে ফেলে পালাতে পারলে বাঁচে।

'কী হল? বলো, তুমি জানলে কী করে?'

'আমি শুনেছি।'

'কার কাছে শুনেছ?'

'অত জমা-খরচে আপনার কী দরকার রাজুবাবু? আমি আর যাব না। আপনিও ফিরে চলুন।'

আমি পকেট থেকে পিস্তলটা বের করলাম। ওটা আমি ধরতে জানি। চালাতেও জানি। এরাই আমাকে শিখিয়েছে।

'বলো কী করে জানলে? নাহলে এখানেই তোমাকে শেষ করে দেব। সত্যিই শেষ করে দেব তারক। আমার চোখের দিকে চেয়ে দ্যাখো একবার। তোমাকে এখনি মারতে পারি আমি।'

আমি ওর কপাল থেকে কয়েক ইঞ্চি দূরে পিস্তলটা তুলেছি।

আশ্চর্য! আমার হাত তো কাঁপছে না!

২৪

আমার সামনে দাঁড়িয়ে তারক জ্বরগ্রস্ত ষাঁড়ের মতো থরথর করে কাঁপছিল। আমি জানি ওরা কেউ আমাকে স্বাভাবিক মনে করে না। জানে আমি পাগল। আমাকে বিশ্বাস করা যায় না। সেই আমার হাতে একটা সেলফ-লোডিং সেমি-অটোমেটিক পিস্তল, ওর কপালের কয়েক ইঞ্চি দূরে, এখন তারক আমার ওপর কোনোরকম ভরসা করতে পারবে না। হয়তো আমার চোখ দেখেই ও বুঝতে পারছে আমার মাথার মধ্যে আগুন জ্বলছে। আমার চোখ। আমার চোখের দিকে তাকালে নাকি মন

শান্ত হয়ে আসে, মনে আনন্দ বেড়ে ওঠে, অনেকেই বলে থাকে। এখন আমার চোখের মধ্যে তারক কী খুঁজছে? চোখের ভাষা বুঝতে পারার শক্তি কি ওর আছে?

'বলো তারক! আমি কিন্তু সত্যিই তোমাকে এখানে গুলি করে মারব।'

'বলার মতো কী আছে রাজুবাবু? আমি ভূতের ভয় পাই। ছেলেবেলা থেকেই আমার খুব ভূতের ভয়।'

'যাদের খুন করো, তাদের ভূতকেও ভয় পাও তুমি?'

'আমি কাকে খুন করেছি? কী বলছেন এসব?'

'মেয়েটার লাশ কোথায় পড়েছিল, তুমি জানলে কী করে?'

মুহূর্তের ভগ্নাংশের জন্য তারকের চোখ নেমে গেল আমার চোখ থেকে। তারপরেই মরিয়া হয়ে আবার উঠল ওর চোখ, ও ক্রুদ্ধ গলায় বলল, 'আমি শুনেছি। ওটা না জানার কী আছে?'

আমি পিস্তলটা শক্ত করে ধরলাম। তারকের মুখের মানচিত্র আরও ভেঙেচুরে গেল। ঢোঁক গিলল। ও জানে হত্যার আগে মানুষের মুখ-চোখ কেমন হয়। ও ত্রস্ত হয়ে উঠল। ফ্রানৎস কাফকা লিখেছিলেন, 'আমি লজ্জিত হয়েছিলাম যখন আমি বুঝতে পেরেছিলাম জীবন হল একটা কস্টিউম পার্টি, আর আমি আমার নিজের মুখ নিয়ে উপস্থিত হয়েছি।' তারক কি এখন আমার সত্যিকারের মুখটা দেখতে পাচ্ছে? কেমন আমার সত্যিকারের মুখ? আমার তীব্র ইচ্ছে হচ্ছিল তারকের মুখের খুব কাছে গিয়ে ওর চোখের তারায় নিজের মুখটা দেখি। কিন্তু ওর বেশি কাছে গেলে ও অনায়াসে পিস্তলটা কেড়ে নেবে আমার হাত থেকে। সে দক্ষতা ওর অবশ্যই আছে।

'সব কিছু জানতে নেই রাজুবাবু। আপনি সহ্য করতে পারবেন না। কী করতে কী করে বসবেন!'

'তুমি না বললেও বুঝতেই পারছ আমি কী করব?'

'বুঝতে পারছি। আপনার মাথায় খুন চড়ে গেছে। কিন্তু মাথা গরম করলেই মানুষ মারা যায় না। মানুষ খুন করা খুব কঠিন কাজ রাজুবাবু। চাইলেই সবাই পারে না। প্রচুর মনের জোর লাগে। হয়তো সেটা আপনার আছে। আমাকে মেরে দেবেন। কিন্তু আপনাকে বললেও তো জনার্দনদা আমাকে মেরে দেবে!'

'তার মানে আমি ঠিকই বুঝেছি। এবার বলে ফ্যালো।'

আমি জানি আমার মাথায় খুন চড়ে যায়নি। এত শান্ত আমার নিজেকে জীবনে কোনোদিন লাগেনি। পেছনে পাহাড়টা এখন আমার হাতের দিকেই তাকিয়ে আছে। দেখছে এমন একজনের হাতে পিস্তল উঠে এসেছে যে স্বপ্নেও কোনোদিন ভাবেনি তার করতলে একটা অস্ত্রের হাতল লেগে থাকবে। আমার কবজি এক কিশোরের মতো সরু। রক্তকে সবচেয়ে ভয় পেয়েছি আমি জীবনে। মাছের রক্ত অবধি দেখতে পারি না। মুরগি কাটার দৃশ্য দেখলে শরীর ঝিমঝিম করে আমার। আমি শুধু কথা বলতে পারি। বকবক করতে পারি। আমার কথাকে কেউ গুরুত্বও দেয় না। জীবনে কোনো কাজ করতে পারিনি। কোনোকিছু শুরু করেও শেষ করতে পারিনি। একটা অপদার্থ! আহাম্মক! সেই আমি একজন মানুষকে মেরে ফেলার জন্য...

পাহাড়টা দেখছে।

তারক বলতে শুরু করল। যা ঘটেছে তার স্তরগুলো একের পর এক খুলে যেতে লাগল আমার সামনে। ও মিথ্যে বলছিল না। বানিয়ে কিছু বলছিল না। নিশ্চিত মৃত্যুর সামনে দাঁড়িয়ে একটা ঘটনাকে বানিয়ে ফেলার শক্তি ওর নেই। ওর চোখ কখনও যাচ্ছিল আমার হাতের অস্ত্রটার দিকে, কখনও আমার চোখে, আর অনর্গল বলে যাচ্ছিল কী ঘটেছে সেদিন। সব কিছু আমি শুনতে পাচ্ছিলাম। যে বিবেকানন্দ বসাককে আমি একজন আদর্শ মানুষ মনে করেছিলাম, রূপনগর শহর আজ যাকে একজন মসিহা ভাবছে, যে আলেফ আলির সঙ্গে বন্ধুত্ব করার অনেক চেষ্টা করেছি আমি, কিন্তু সে আমাকে এড়িয়ে গেছে বারবার, যে জনার্দনকে দেখেছি পাথরের মূর্তির মতো সদর দরজার বাইরে পাহারায় থাকতে, যাতে... আমাদের কোনো বিপদ না হয়, যাতে আমার কোনো বিপদ না হয়, তাদের চামড়া খুলে ভিতরের রক্ত আর মাংস আমার সামনে প্রকাশিত হচ্ছিল। চতুর্দিকে সবুজ হাসছে। ছড়িয়ে থাকা পাথরগুলোর ওপর রোদের অফুরান উজ্জ্বলতা। আমি শুনতে পাচ্ছিলাম কুমকুমের আর্ত চিৎকার, টের পাচ্ছিলাম মরার আগে মেয়েটা কী নরক যন্ত্রণা ভোগ করেছে। বুঝতে পারছিলাম কতখানি নিস্পৃহতা নিয়ে আলেফ আলি সে সময় গাড়ির মধ্যে বসেছিল। কতখানি বিচক্ষণভাবে মেয়েটাকে মেরে ফেলার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন বিবেকানন্দ বসাক। শুধু এই শহরে নিজের আধিপত্য নিরঙ্কুশ করার জন্য। তারপর... আরও তিরিশজন মানুষের প্রাণ...

এই কি রাজনীতি!

এই কি সাম্প্রদায়িকতার রাজনৈতিক প্রয়োগ!

আমি জিজ্ঞেস করলাম, খুব শান্ত গলায়, যেভাবে মানুষ এক শিশুকে ছড়া শোনাতে বলে, 'বাঁশ ঢুকিয়ে মেয়েটার শরীরের ভিতরটা কেমন দেখেছিলে তারক? রক্তমাংস ছিল? নাকি বিশ্বব্রহ্মাণ্ড দেখা যাচ্ছিল?'

'অন্ধকার ছিল রাজুবাবু।'

'আর ইমামসাহেব? তাঁকে কে মেরেছে? কাকু আর আলেফের কথায় জনার্দনই তো? তুমিও ছিলে?'

'না। ও ব্যাপারে আলেফ জানত না। আমিও ছিলাম না। জনার্দনদার সঙ্গে তৌহিদুল ছিল সেদিন। ইমামসাহেবকে না মারলে তৌহিদুল শহরের বস হবে কী করে?'

'কাকু জানতেন না?'

'ওঁরই কথায় সব হয়েছে রাজুবাবু। সবাই ওঁর হাতে পুতুলনাচের পুতুল। আমরা তো হুকুম মেনেছি শুধু! আমাদের ওপর রাগ করে কী হবে?'

'কিন্তু মেয়েটাকে রেপ করার সময় তোমার কেমন লেগেছিল?'

'রাজুবাবু, পাগলামি করবেন না। আমি আপনাদেরই লোক। আপনাদেরই চাকর। নিজে কিছুই করিনি। যা হুকুম হয়েছে, তালিম করেছি। আপনিও যদি কিছু করতে বলেন, কাউকে মারতে বলেন...'

নিজের অস্ত্রটা বের করার জন্য তারক মরিয়া হয়ে হাত নামাল, আর আমি ট্রিগারে চাপ দিলাম। কার্তুজের খোলসটা বেরিয়ে গেল। পিস্তলটা আমার কবজিতে ধাক্কা দিল। তারক ছিটকে পড়ে গেল। দীর্ঘ জিরাফের মতো শরীরটা কিছুক্ষণ মোরাম রাস্তার উপর তোলপাড় করল। সারা গায়ে মোরামের লাল ধুলো মাখামাখি হচ্ছে ওর। কিন্তু তারক এত ছটফট করছে কী করে! ওর তো এক মুহূর্তও বেঁচে থাকার কথা নয়! কপালে গুলি লেগেছে। ব্রেন নিশ্চয়ই ডেড হয়ে গেছে! তাহলে কি হার্ট সচল আছে এখনও! শরীরের কি তাহলে একটা স্বতন্ত্র সময় লাগে মৃত্যুতে নিথর হওয়ার!

আস্তে আস্তে তারকের শরীর নিস্পন্দ হয়ে গেল। মাথা ঘিরে রক্তের একটা ছোটো পুকুর তৈরি হয়েছে। সেটা ক্রমেই বড়ো হচ্ছে।

আমি রাস্তার ধারে বমি করলাম। রাতে তেমন কিছুই খাইনি। সকালেও না খেয়ে বেরিয়েছি। শুধু টক জল উঠে এল গলা থেকে। সেইসঙ্গেই একটা পুলকের অনুভূতি সারা শরীরে ছেয়ে গেছে। যেন খাদের ধারে দাঁড়িয়ে আমি জীবনের অন্তিম ঝাঁপটা দিতে পেরেছি। মাথাটা কিছুক্ষণ ঘুরল। একটা পাথরের ওপর বসলাম। একটু সুস্থ হয়ে নেওয়া দরকার। এখন হাঁটতে পারব না। তারককে মেরে আমার মধ্যে কোনো দুঃখ কোনো আতঙ্ক টের পাচ্ছি না আমি। মাথার মধ্যে কোনো আগুনও নেই। কেবল খুব বিশ্রী লাগছে। কেমন এক বিবমিষা। আর ওই পুলক। রামাচল যাদবকে রাস্তায় পড়ে থাকতে দেখে যেমন লেগেছিল। প্রায় তেমনই, শুধু একটু বেশি তীব্র।

পাহাড়টার দিকে তাকালাম। নিশ্চল নিথর এক পাথরের স্তূপ, সবুজে সবুজ হয়ে আছে আকাশের নীলে। ওর কাছে আজও যাওয়া হবে না আমার। একটু আগেই একটা হত্যাকাণ্ড দেখল ও আবার। সেদিনও অন্ধকারের মধ্যে দেখেছিল কুমকুমের ধর্ষণ, শুনেছিল তার আর্তনাদ, সাহায্যের জন্য চিৎকার, দেখেছিল তার হত্যা। কিছু করেনি। কাউকে বলেনি। পাহাড় কোনো কথা বলে না। আমার মতো কল্পনাপ্রবণ মূর্খরাই হয়তো ধরে নেয় পাহাড়টার কথা বলার শক্তি আছে, পাহাড়টা কিছু বলছে। এই যে সামনেই পড়ে আছে তারক, ওর মাথার ভিতর থেকে রক্ত বেরিয়েই চলেছে, পাহাড়টা এ দৃশ্য কি মনে রাখবে? যুগে-যুগান্তরে কত হত্যা ও দেখেছে! একসময় এ অঞ্চলে বাঘ বেরোত। বাঘ কেমন করে হরিণের ঘাড় ভেঙে দেয়, টুঁটি ছিঁড়ে নেয়, পাহাড়টা দেখেছে। স্মরণাতীত সময় থেকে ও দেখে আসছে খাদ্য আর খাদকের লীলা। কুমকুমও এক খাদ্য ছিল, রাজনৈতিক খাদ্য, বিবেকানন্দ বসাক আর আলেফ আলির প্লেটে, তৌহিদুলের কলাই-করা থালায়। যে তিরিশজন মানুষ মরল দুই সম্প্রদায় মিলিয়ে, তারাও তো খাদ্যই ছিল! তাদের প্রাণের মূল্য দশ লাখ টাকা ক্ষতিপূরণে ঠিক করে দিয়েছে সরকার। বিবেকানন্দ বসাকের সরকার। আলেফ আলির সরকার। তৌহিদুলের সরকার।

কী করব? ওদের ক্ষমা করে দেব? আমি শাস্তি দেওয়ার কে?

তাহলে তারককে মারলাম কেন আমি?

মুহূর্তের খেয়াল? নিছক অবিবেচনা?

আমার ভিতরের সেই পিশাচটার জয় হল কি? আমি কি হেরেই গেলাম?

ওহ্ মা গো! কেন মারলাম লোকটাকে! ও তো সব স্বীকারই করে নিয়েছিল!

লোকটা ঠিকই বলেছিল। ও হুকুমের চাকর। ওকে মেরে কিছুই লাভ নেই। আমার ওকে মারা উচিত হয়নি। কিন্তু কী করতাম? পুলিশের হাতে তুলে দিতাম? যে পুলিশ সারা শহরে যখন দাঙ্গার আগুন জ্বলছে, একবারও থানা থেকে বেরিয়ে আসেনি? কী হত? কী হয় এ রাজ্যে? এ রাষ্ট্রে? এই লোকটা নিজের থেকে কিছুই করেনি। কিন্তু মেয়েটাকে রেপ করার মজা কি নেয়নি? সেটা কি ওর ব্যক্তিগত উল্লাস ছিল না? সেটার দাম কেন দেবে না তারক? ওকে যদি আজ ছেড়ে দিতাম, কী হত? আরেকবার প্রমাণ হত রাজকুমার চৌধুরি একটা ইডিয়ট। সে শুরু করতে জানে, শেষ করতে জানে না।

কিন্তু আমি মানুষের জীবনের দাম বুঝে নেওয়ার কে?

তবে কি ব্যক্তিগতভাবেই মারলাম লোকটাকে? আত্মসম্মান? অহংকার?

চোখে আঙুলের ডগা স্পর্শ করে বুঝলাম জল এসে গেছে।

একটা মোটর সাইকেল আসছে। বাইকটা একদম কাছে এসে থমকে দাঁড়াল। রয়্যাল এনফিল্ড। আরোহীর মাথায় হেলমেট নেই। হাঁ করে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ আমার দিকে। তারপর বাইক ঘুরিয়ে যত জোরে পারে চালিয়ে পালাল। পিছনে লাল মোরামের মেঘ। ধীরে ধীরে বাইকটার প্রচণ্ড শব্দ মিলিয়ে এল। ও কি গিয়ে পুলিশে খবর দেবে? কোন পুলিশ? থানায় লুকিয়ে থাকা পুলিশ? ও কি গিয়ে ফোর্সকে ডেকে আনবে? আমি জানি ও কিছুই করবে না। যে লোক ওভাবে পালায়, সে কিছুই করবে না। হয়তো জীবনে কোনোদিনই কাউকে বলবে না সে একটা হত্যাকাণ্ডের একদম ঘটনাস্থলে এসে দাঁড়িয়েছিল, নিজের চোখে খুনিকে দেখেছে।

আমার খুব হাসি পেল। নিজের মনেই কিছুক্ষণ হেসে নিলাম। ভাবলাম, আমি কিন্তু পালাইনি! আমি কিছু করেছি। সেটা ভুল হতে পারে। ঠিক হতে পারে। অনৈতিক হতে পারে। নীতিসম্মতও হতে পারে। কিন্তু একটা কাজ আমি করেছি। সেটার কারণ আছে, ফলাফলও আছে। হয়তো আমাকে সেটা ভোগ করতে হবে। হয়তো কেন? ভোগ করতেই হবে। হয়তো আজই।

উঠে পড়লাম। ফিরতে শুরু করলাম শহরের দিকে। এ রাস্তায় আর কি কখনও আসা হবে আমার?

হঠাৎ, হয়তো কোনো কারণ ছাড়াই মনে হল, আর কি কখনও আমার মায়ের সঙ্গে দেখা হবে? আমার অসুস্থ মা... ছেলে খুন করেছে শুনলে আর কি বাঁচবে? বাবার মুখটা কেমন হবে খবরটা পেয়ে? বাবা কি অবাক হবে? খুব কি অবাক হবে?

কী করছি আমি? একটা কাজের মতো কাজ সত্যিই করছি কি? কিংবা, এও আমার চিরকালীন ছেলেমানুষি! এও কি আমার অপরিণতমনস্কতা! আমি তো জানি একটা তারককে মারলে এক হাজার নতুন তারক তার জায়গা নিতে প্রস্তুত হয়ে আছে এই পশ্চিমবঙ্গে। একজন বিবেকানন্দ বসাককে মারলে আবার নতুন কোনো বিবেকানন্দ বসাক আসবে। একজন আলেফ আলিকে মারলে আর কোনো আলেফ আলি কি তার জায়গা নেওয়ার জন্য তাকিয়ে নেই রূপনগরেই? বিনোদ ঘোষালের কি অনেকখানি সুবিধা করে দেওয়া হবে না? কী হবে জনার্দনকে মেরে? হয়তো এক হাজার জনার্দন অপেক্ষা করে আছে ওর জায়গায় আসার জন্য। কোনো মানুষই তার জায়গায় ধ্রুব নয়। খালি জায়গা পড়ে থাকবে না, ঠিক পূরণ হয়ে যাবে। এই দুর্নীতিপরায়ণ অপরাধপ্রবণ বোধহীন সময়ে একজনকে মেরে কী হয়? হয়তো বিভ্রমের পরিসরটা আরও বেড়ে ওঠে। এ রাজ্যে যা কিছু ঘটে, যত বড়ো ঘটনাই হোক, মানুষ সাতদিনের মধ্যে ভুলে যায়। জনসাধারণের বিস্মৃতির ওপর নির্ভর করে রাজনীতি চলে এখানে। সরকার চলে।

আমি হাতের পিস্তলটা দেখছিলাম। কত নিরপেক্ষ নিস্পৃহ একটা অস্ত্র! যার হাতে থাকে তার হয়েই কাজ করে। বোতলের দৈত্যের মতো। না, আমার মাথা এখন আর গরম নয়। যখন তারককে মেরেছিলাম, তখনও গরম ছিল না। যা করছি, ঠান্ডা মাথাতেই তো করছি! কোল্ড ব্লাডেড মার্ডার। কেবল নিজেকে সন্দেহ হচ্ছে। কী হাস্যকর! বাচাল ইডিয়ট রাজকুমার চৌধুরি একজন খুনি হয়ে গেছে আজ! একটু আগেই! কোন এক অদ্ভুত পরশপাথর তাকে স্পর্শ করে গেছে! কিন্তু সে বিনয় নয়, বাদল নয়, ক্ষুদিরাম নয়। সে নিজের কাছেই সন্দেহজনক।

মোড়ের কাছে এসে দেখলাম রাস্তা এখন ফাঁকা। ফোর্স এখন অন্য কোথাও টহল দিচ্ছে। কিছু দোকানদার এসে তাদের দোকানের অবস্থা দেখছে। ফুটপাত থেকে কিছু কিছু জিনিসপত্র কুড়োচ্ছে। তাদের শরীরের কাঙাল ভঙ্গি দেখলেই বোঝা যায় তারা কতটা ত্রস্ত হয়ে আছে, কতটা অসহায় তারা এখন।

বিবেকানন্দ বসাকের বিজয়ী মূর্তিটা আমার চোখের সামনে ভেসে উঠল। ভেসে উঠল আলেফ আলির গ্রিক যোদ্ধার মতো চেহারা। এই লোকগুলোর পাশে ওদের মনে হচ্ছে গ্রহান্তর থেকে এসে পড়া প্রাণী— যেন দেবতা। আমি ওই দেবতাদেরই অংশ। এই লোকগুলো আমার কেউ নয়। এদের কাছে গিয়ে কথা বলতে গেলে এরা এখন ঘাবড়ে যাবে— বিবেকানন্দ বসাকের বন্ধুর ছেলে আমাদের কাছে কেন এসেছে! কিছু মতলব নিশ্চয়ই আছে! অথচ এরা এখন জানে বিবেকানন্দ বসাকই এদের ত্রাতা। তিনিই বাঁচিয়েছেন এদের নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে। এ শহরে এখন বিবেকানন্দ বসাকই ভগবান।

বাড়ির কাছে এসে দেখলাম আলেফের রয়্যাল এনফিল্ড আরবি ঘোড়ার মতো অবহেলায় দাঁড়িয়ে আছে। দেখলাম একা জনার্দনই এখন পাহারায় আছে। অন্যরা সম্ভবত বাড়ির ভিতরে, হয়তো সারারাত জেগে থাকার পরে এখন তারা ঘুমোচ্ছে। জনার্দন তার কর্তব্যে ফাঁকি দেয় না। তার ক্লান্তি নেই। অবসর নেই। অবকাশ নেই। এই জনার্দনরা হাজার হাজার বছর ধরে ক্ষমতার দরজা পাহারা দিচ্ছে। এরা আছে বলেই ক্ষমতাসীন লোকেরা রাতে ঘুমোতে পারে, লাঞ্চ আর ডিনার সারতে পারে পরিবারের সঙ্গে বসে। এরা আছে বলেই কিছু লোক ক্ষমতার অলিন্দে নিজেদের নিশ্চিন্ত ভাবতে পারে। নাহলে ক্ষমতা অর্জন করতে তারা ভয় পেত। লোকের ওপর আধিপত্য করতে ভয় পেত। এই জনার্দনরা ছিল বলেই একসময় রাজতন্ত্র সুরক্ষিত ছিল। এরা আছে বলেই আজকের স্বৈরাচার নিরুপদ্রব আছে। আজকের তথাকথিত গণতন্ত্রে সব কিছু মসৃণভাবে চলছে।

আমি কাছে যেতেই জনার্দন এগিয়ে এল, 'তারক কোথায় রাজুবাবু?'

বলেই ওর চোখ পড়ল আমার পাঞ্জাবিতে। আমার হলুদ পাঞ্জাবিতে এখন ঘিলু আর রক্তের ছিটেগুলো শুকিয়ে আসছে। জনার্দন রক্ত খুব ভালো করে চেনে।

ও কিছু বলার আগেই, কিছু করার আগেই, ওর দীর্ঘ পেশাদারি অভিজ্ঞতা নিয়ে আমার ওপর লাফিয়ে পড়ার আগেই আমি পিস্তলটা বের করে ওর বুকে গুলি করলাম।

জনার্দন 'আঁক' শব্দ করে পড়ে গেল। মৃত্যুচিৎকারের মধ্যে কেমন হাস্যকরতা থাকে! ঠিক তারকেরই মতো ছটফট করছে এখন। বিরাট চেহারাটা কী অসহায় দেখাচ্ছে!

ওকে মারব তো ভাবিনি! মারতে চাইনি। কেন মারলাম! কী হয়ে গেল হঠাৎ আমার!

গুলির শব্দে ভিতরে চিৎকার শুরু হয়েছে।

আমি দৌড়ে ঢুকলাম বাড়ির মধ্যে, দৌড়ে সিঁড়ি ভেঙে দোতলায় গেলাম।

আমার বুক কাঁপছে না। হাতও কাঁপবে না, নিশ্চয়ই।

বিবেকানন্দ বসাক তাঁর স্টাডি থেকে বেরিয়ে এসেছেন। তাঁর পাশেই দাঁড়িয়ে আছে আলেফ। সোনিয়া বেরিয়ে এসেছে তার ঘর থেকে। সুদীপাও। কেউ কোনো কথা বলছে না। ওদের দিকে না তাকিয়েও বুঝতে পারছি ওরা বোবা হয়ে আমাকে দেখছে। সিঁড়িতে ছুটে এসেছে জনার্দনের লোকেরা। এগোতে সাহস পাচ্ছে না।

আমি পিস্তলটা বিবেকানন্দ বসাকের দিকে তুলে ধরলাম।

আমিই প্রথম কথাটা বললাম, 'পাহাড়ের রাস্তায় তারকের দেহটা পড়ে আছে। একটু আগে জনার্দনকে গুলি করলাম। ওদের মেরে কী লাভ হল জানি না। কিন্তু... মেরেই ফেললাম।'

উনি দীর্ঘ একটা শ্বাস নেওয়ার চেষ্টা করে বললেন, 'এসব তুমি করছ কেন? তুমি আমার বন্ধুর ছেলে! আমি ভেবেছিলাম তোমাকে নিজের ছেলের জায়গা দেব। তুমি এ কী করলে!'

'যদি আমি আপনার নিজের ছেলে হতাম, তাহলেও এটাই করতাম।'

'কিন্তু কেন?'

'কারণটা খুব সহজ। আমি আজ সব জেনে গেছি। যা আমার জানার কথা নয়, তারক আমাকে সে সবই বলতে বাধ্য হয়েছে।'

'তো? আমি নিজেই হয়তো তোমাকে সে সব খুলে বলতাম একদিন। হয়তো আজই বলতাম। তুমি কি আমাদেরই একজন নও? তুমি কি তুচ্ছ মরালিটি নিয়ে মাথা ঘামাও নাকি? তুমি না নিৎসে পড়েছ! জানো না কাউকে মেরে ফেলার চেয়ে নিজের আকাঙ্ক্ষাকে অতিক্রম করতে বা নিজের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে অনেক বেশি শক্তি লাগে? তুমি কি আমাদের সবার কাছে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ নও রাজকুমার?'

'জানি না। কিন্তু আমি আজ নিজের শক্তির পরীক্ষা হয়তো দিচ্ছিই না। আজ শুধু টের পাচ্ছি সব কিছু ছাপিয়ে আমার মধ্যে একটা তীব্র আবেগ আছে। আর সেটা হয়তো নৈতিক আবেগ। সেটা পুরোপুরি আমার ইচ্ছাধীনও নয়। এসব ঘটনা সেটায় এমন ঘা দিয়েছে, আমি আর সহ্য করতে পারলাম না। যা কিছু আজ করছি, ইচ্ছে করে যে করছি তা নয়। বিশ্বাস করুন, আমি না করে পারছি না।'

ওঁকে কিছুটা আড়াল করে দাঁড়িয়ে আলেফ তীব্র গলায় বলল, 'আমি আপনাকে অনেকবার বলব ভেবেছি আংকল, এ ছেলেটা জেহরিলা সাপ, একে বিশ্বাস করবেন না। আজ সেটা সচ হল। ও পিস্তল কোথায় পেল?'

কাকু নীচু গলায় বললেন, 'আমিই দিয়েছি। বিরাট ভুল হয়েছে। জীবনের সবচেয়ে বড়ো ভুল।'

আমি শান্ত গলায় বললাম, 'আমি আপনাকে শাস্তি দেব। আপনাকে শাস্তি দিতে আমি বাধ্য হচ্ছি। কারণ আজ আপনি এ শহরে ঈশ্বর। পুলিশ আপনাকে ধরবে না। রাষ্ট্র তো আপনাকে পুরস্কৃত করবে। আমি এই আলেফ আলিকেও আজ শাস্তি দেব। হয়তো... নিজেকেও শাস্তি পেতে হবে আজ আমাকে। সেটা পেতেই হবে। এতদিন জীবনটা যেভাবে কাটিয়েছি, তার শাস্তি। হয়তো আজ যা করতে চলেছি তারও শাস্তি। নরহত্যাকে পৃথিবী ক্ষমা করে না।'

'দুটো মানুষকে মেরেছ। ফাঁসি তোমার হবেই। তোমার বাপ-মায়ের কথাটা একবার ভেবে দ্যাখো। এখনও হয়তো তোমার সুযোগ আছে। এখনও আমি কিন্তু সব কিছু সামলে নিতে পারি। তোমাকে বাঁচাতে আমি এখনও পারব। তুমি ওটা নামাও, প্লিজ! পাগলামো কোরো না। আমাকে... মেরো না। আমি তোমার একমাত্র ওয়েল উইশার। তোমার বাবাও তোমাকে ত্যাগ করেছে, ভেবে দ্যাখো! আমি ছাড়া আজ কেউ নেই তোমার।'

'আমি আপনাকে মারব তো বলিনি! শাস্তি দেব বলেছি। আপনাকে, আলেফকে, নিজেকে... যে শাস্তি থেকে আমরা কেউ কোনোদিন বেরোতে পারব না।'

উনি আরও অবাক হলেন। ওঁর দু-চোখ বিস্ফারিত হল।

ওঁর বিহ্বল দৃষ্টির সামনে, আলেফ আলির অসহায়তার সামনে আমি পিস্তলটা ঘোরালাম সোনিয়ার দিকে। সোনিয়া আমার দিকে অপলক চেয়ে আছে। ওর চোখে অসহায়তা নেই। বিস্ময় নেই। আতঙ্ক নেই।... জল নেই। পিস্তলটা নিজের দিকে ঘুরতে দেখেও ওর চোখ কাঁপল না।

ওর কি আমাকে এখন আর কিছুই বলার নেই?

আমার হাত কি এখন একটু কাঁপছে?

বিবেকানন্দ বসাকের মরণাহত আর্তনাদের মধ্যে ট্রিগারে চাপ দিলাম।

সোনিয়া নিঃশব্দে পড়ে গেল। এই প্রথম আমি লক্ষ্য করলাম মেঝেটা দাবার ছকের মতো সাদা-কালো পাথর বসিয়ে তৈরি করা। মুহূর্তের জন্য আমার খুব ঠান্ডা লাগল।

আর, আলেফ ঝাঁপিয়ে পড়ল আমার ওপর।

পাগলপুর

টেলস অফ অর্ডিনারি ম্যাডনেস
রাজকুমার চৌধুরি প্রণীত

যেমন চাবুকে থাকে সমুদ্রের ধার। সপাং!!!!!!!!! আর সংক্রামক থুতুর গুঁড়োগুলো উড়তে থাকে। স্পষ্ট হতে শুরু করে রক্তের লম্বাটে ফালি। ওই স্পষ্টতাকে বিশ্বাস করা যায় না। ও তো ঝরবে না। ঝরে পড়বে না। পাখির ঠোঁটের চেয়েও শক্ত হয়ে আটকে আছে ও। কেউ যে একবার সিঁড়ির তলায় ব্লেড ঘসে দিয়েছে, ও আর মুছবে না। মুছে দেওয়া যাবেই না ওকে। পাখনা কেটে দেওয়া আঘাতগুলো আসলে আর জীবনে অভিজ্ঞতার অংশ হয়ে থাকতে চায় না। ওরা বীজ হতে চায়। বালিশ সরে যাওয়া টাকার মতো নয়। জল, ঘুম, আর জানালার সম্পর্কের মতোই কিছু আঘাতের স্মৃতি। কিছু ক্ষতচিহ্নের স্থায়ী হওয়ার শক্তি। ১টা ক্ষতচিহ্ন সচরাচর আর ১টা ক্ষতচিহ্নের বন্ধু হতে পারে। শত্রু হতে পারে। ক্ষতচিহ্নদের চরাচরে কে যে যে কাকে স্বাগত জানায়।

সপাং ফার্মেসি

'তোমাকে আমি ৬ মাত্রার ক্ষতচিহ্ন দিলাম। এই চিহ্নকে তুমি যেমন তেমন ভেবো না। একে যে তুমি নিয়ে যাচ্ছ, কিছুদিন টক খেয়ো না। পেঁয়াজ খেয়ো না। শুদ্ধ হয়ে গ্রহণ কোরো একে। এর কাছে কোনো তীব্রতাকে ঘেঁসতে দিয়ো না। কোনো রিপুর সঙ্গে ঘসা লেগে এ যেন মিলিয়ে না যায়। অর্ধেক খালি পেয়ালায় একে ঢেলে গ্রহণ কোরো। অন্য কোনো ক্ষতচিহ্নের প্রয়োজন হবে না। এই ক্ষতচিহ্ন নিজেই নিজেকে পুনরুৎপাদন করতে পারে।'

'৬ কেন? ৩০ বা ২০০ বা ১০০০ নয় কেন?'

'১ ধাক্কায় অতটা তোমার সহ্য হবে না। বরং দিনের মধ্যে কয়েকবার নিয়ো।'

'র নয় কেন? ০ মাত্রার ক্ষত তো দ্রুত কাজ করে! সে চিহ্ন নয়। দগদগে। পুঁজরক্ত গড়িয়ে পড়ছে। সে ধাক্কা দেয় না। স্পষ্ট কাজ করে।'

'সুখ সারাতে চাও? না, অসুখ?'

কিছু কিছু মেঘ ঠিক সূর্যের মতোই জ্বলে। ১ চামচ ২ চামচের চেয়ে গাঢ় হয়ে থাকে। ৩ চামচ ২ চামচের চেয়ে পাতলা। হাওয়া আমাকে যে সম্পর্ক দিয়েছিল, সেখানে পুকুরের নয়, হিন্দু হোটেলের বাটামাছ ছিল। হ্যাঁ, পুকুরকে আমি ছায়া বলে ডাকি। সূর্য দেখা যাচ্ছে না। তবু যেমন দুপুর হয়ে থাকে। তবু যেমন ভেতরটা সূর্য হয়ে থাকে। সাদা মেঘের রোদ চলে যায় কৃষ্ণচূড়ার দিকে। মানুষ নিজেকে প্রকৃতির চেয়েও অনেক স্তব্ধ ভাবতে পারে, অন্তত কয়েক মুহূর্তের জন্য। ১টা দীনদরিদ্র আংটির মধ্যে ঢুকে পড়তে চায় দুপুর। দুধের মতো সাদা দুপুর হয় ১টা। গরিব আর রোগা মানুষগুলো সিপিএম, তৃণমূল, বিজেপির বাইরে শুধু ভাত হয়ে যায়। ক্যালেন্ডার ছিঁড়ে বেরিয়ে আসা তারিখ হয়ে যায়। ঠিক যেমন ১৫০ কিলোমিটার দূরের বাতাসে ছুটে আছে সমুদ্রের জল। বাতাসে লোনা সুনীল রক্তের গন্ধ। বাতাস আমাকে যে সম্পর্ক দিয়েছিল, সেখানে হিন্দু হোটেলের নয়, প্রকৃতির মতোই অনিশ্চিত বাটামাছ ছিল। মানুষের তৈরি ঘাট যেমন বৃষ্টির জলে তৈরি পুকুরে ডুবে যায়। প্রথমে জলে ডোবে। পরে মাটিতে। মাটির অংশ হয়ে যায় ইটগুলো। প্রাকৃতিক হয়ে থাকে। বাসনমাজার দাগ তখনও বুকে নিয়ে। কেউ আর কখনও তাতে আলতাপরা নীলিমা ঘসবে না।

লে। খা

'দাদা আমি ডিম খেতে চেয়েছিলাম। ডিম যেমন আমাকে খেয়েছে। দাদা... আমিও ১টা ডিম খেতে চাই।'

'পয়সা নেই।'

'মিথ্যে কথা!'

'ডিম কেনার পয়সা নেই, এটা মিথ্যে কথা নয়।'

'কেন? ছোটোবোনকে ১টা ডিম খাওয়াতে তোমার চামড়ায় বাঁধে?'

'আমি পয়সার ডিম খাওয়াই না।'

'তবে। খাওয়াও।'

'খাওয়াচ্ছি তোকে। যে বোন ডিম খায়, তার নাম আমি দিলাম সায়রাবানু।'

'ঈশ!'

'১টা নরম আর গরম গোল পিচ্ছিল সাদা। সেই সাদা পৃথিবীর অন্য কোনো সাদার সঙ্গে মেলে না। নখ বসালে নখের ময়লায় সাদা বেরিয়ে যায়। ভেঙে বেরোনো সেই সাদার মধ্যে আছে ১ আশ্চর্য রং। তাকে ফোটালে চোখের জলের মতো শক্ত হয়। ভাজলে হাসির মতো ছড়িয়ে যায়। পোচ করলে ব্যথার মতো জমে থাকে। তার রং, আহা তার রং রে বোন!!!!! তাকে ঈর্ষা করেই ইরানে গোলাপের চাষ হয়। মনে আছে, বাবরশাহ একদিন ভারতে এসেছিল? ওই রংকে লোকে ভুল করে কুসুম বলে। বোঁটা নেই কিন্তু। কোনোরকম বোঁটা নেই কোথাও। দুধের সঙ্গে ডিমকে যেন ঘুলিয়ে ফেলিস না।'

'ইল্লুস! দাদা...'

'তুই। তোর মুক্তোর মতো দাঁত বসালি সেই সাদায়।'

'ইল্লুস!!!!'

'এখন। তোর দাঁতের ফাঁকে সেই আশ্চর্য নোংরা লেগে গেছে, যাকে লোকে ভুল করে ডিম্বকণা বলে। এখন তোর। গলা ভরতি নরম। গলা ভরতি গরম। তুই একটু আস্তে ঢোঁক গিলবি। একটু... আস্তে...'

'ইইইইইইইল্লুস!!!!!!!!'

'লে। খা।'

নতুন ইটের জানালা

১টা জানালা আমাদের বাড়ির দেওয়ালে ক্ষতচিহ্ন হয়ে আছে। আমাদের প্লাস্টারহীন নতুন ইটের দেওয়াল। পাতলা স্বচ্ছ কাচের জানালা। জানালা অবিশ্যি কাচের হয় না। শার্সিগুলো কাচের। লোহার কর্কশ ফ্রেম। এলোমেলো সবুজ রং করা। ওই সবুজ রং যেন ১টা সবুজ লতার অনুপস্থিতি ধরে রেখেছে যাতে গোলাপি ফুল হয়। সে নেই— লতার সুবাদেই ১টা ফ্যাকাসে টব যেন নেই— টব হয়ে আছে। ওই জানালাটার জন্য আমাদের বাড়িটাকে বাঙালি বাড়ি মনে হয় না। মনে হয় ইরানের কোনো পয়সাওলা লোকের বাড়ি, বা ইতালির কোনো গরিব পরিবারের। দেশছাড়া স্বভাবের এই বাড়িটা আমাদের চরিত্রও বদলে দিয়েছে। সারাদিনের মধ্যে কোনো কোনো অপ্রত্যাশিত মুহূর্তে ১-১টা কবিতা লাফিয়ে ওঠে। জীবনের চামড়ায় কিছুটা অংশ খসে যায়। ক্ষত তৈরি হয়। র। পুঁজরক্তসমেত। তাকে

চিহ্নায়িত করার প্রক্রিয়াটা শুরু করতে হয়। মাত্রা ঠিক করতে হয়— ৩, ৬, ১২, ৩০, ২০০, ১০০০, বা ১০০০০। কেউ কেউ তাকে দৃশ্য বলে। যেন বর্ণনা করেই খালাস। কেউ কেউ তাকে অন্তরে নিয়ে যায়। দেখার অন্তরে নিয়ে যায়। অপটিকাল সংবেদনের বাইরে। কিংবা, রেটিনার অনেক বেশি গভীরে। সেখানে একটা কাচের জানালা আর অভিজ্ঞতা থাকে না। কারণ যে জানালা দৃশ্য দেখার জন্য, সেই জানালা স্বয়ং ১ দৃশ্য। যে দেওয়ালে সে আটক আছে, সেটা নতুন ইটের।

'তুমি হাওয়ার মধ্যে গিয়ে ওই অচেনা লোকটাকে নিজের নাম বললে কেন?'

'দ্যাখো, আমি কাকে নিজের নাম বলব সেটা আমার ব্যাপার। তুমি নাক গলিয়ো না।'

'বাইরে গেলে ওড়না সামলাও। ঠিক করে কথা বলো। আজ দিনটা খুব পরিষ্কার। স্পষ্ট রোদ উঠেছে। আজ তোমার কাউকে নিজের নাম বলা ঠিক নয়। অচেনা কাউকে।'

'চেনা লোককে বললে দোষ নেই তো? তোমাকে বলি?'

সাদা রৌদ্রের মধ্যে খুব হাওয়া দিচ্ছিল। বাইরে গাছপালাগুলো ওলট-পালট হচ্ছিল। ইটের দেওয়ালে বাতাসের ধাক্কা টের পাওয়া যাচ্ছিল। সোঁ-সোঁ শব্দের মধ্যে কিছু ১টা পড়ে গেল। সম্ভবত কোনো ঘরে ১টা দুধের গেলাস। শব্দটা ধাতব নয়।

অমলকান্তি। যদ্দূর পেতে চেয়েছিল

যে ক্যামেরায় পায়ের ছাপ গভীর হয়ে পড়ে, তার নামও তো দূরবিন। খড়হাঁসে ছেয়ে থাকা ১টা জলাভূমির পাশে অমলকান্তি ১টা চা দোকান খুঁজে পেয়েছে। বৃদ্ধ দোকানি। একদা তিনি বাজি কারখানার মালিক ছিলেন। সরকার শব্দদূষণ বন্ধ করে দিল। সেই কাজ ছেড়ে তিনি ভাতের হোটেল খুললেন। চলছিল মন্দ নয়। ২টো হাঁটু হঠাৎ একদিন জবাব দিয়ে দিল। তখন ছোট্ট চা দোকানটা খুললেন। পাশেই গড়ে উঠছিল বিরাট ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ। মোরাম রাস্তা বানানো হয়েছিল। লোকজনের যাতায়াত বেড়েছিল জলাভূমিটিতে। সময় কাটানোর পাশাপাশি রোজগার মন্দ হচ্ছিল না। অমলকান্তি প্রাতঃভ্রমণে বেরিয়ে রোজ চা খেত। গরম চা। অগণিত বালিহাঁসের হইচইয়ের মধ্যে। দিনের সবচেয়ে নরম রোদের মধ্যে। সেই রোদের ছবি তোলা যায় না। সেই রোদের ছবি নামানোও যায় না।

'বাজি বানানো, আর চা বানানোর মধ্যে তফাত কী?'

'বয়সের তফাত স্যার। হাঁটুর তফাত।'

'বুঝলাম না।'

'আমিও কি ছাই বুঝি নাকি! আপনার প্রশ্নটা শুনেই উত্তরটা মুখে এল। হয়তো কিছুই তফাত নেই। সেটা মন দিয়ে করতাম, এটাও করছি। সেটায় চাপ বেশি ছিল। ল্যাঠা বেশি। পুলিশ-টুলিশের ঝামেলা ছিল। এখন বেশ নিরিবিলি আছি।'

'তখন মানুষের কানের জন্য মাল বানাতেন, এখন জিভের জন্য।'

'শুধু কান কেন? আলোর বাজিও বানাতাম স্যার। তুবড়ি। রংমশাল। হাউই। চরকি। সেসব মাল তো চোখের জন্য। আর, জিভের সোয়াদের জন্য কেউ চা খায় নাকি? মানুষ তো চা খায় মন দিয়ে।'

'কীরকম?'

'এই যে আপনি সকালে হাঁটতে বেরোন, সেই হাঁটা, আর মানুষের অফিস-আদালত-ইস্টিশন-বাসস্ট্যান্ডের দিকে হাঁটা তো ১ নয় স্যার! অথচ আপনি কিছু কম জোরে হাঁটেন না। এই তো, কেমন ঘেমে গেছেন। চা খেচ্ছেন। রেস্ট নিচ্ছেন। শখের হাঁটার পরেও রেস্ট নিতে হয় স্যার।'

'তা হয়।'

'হাতে ক্যামেরা নিয়ে বেরোন। অথচ আজও হাঁসগুলোর দিকে ক্যামেরা তাক করতে দেখলাম না।'

'দেখলে আমার সেই ছবি তোলার ছবি নিজের মনে তুলে নিতে, নাকি নামিয়ে রাখতে?'

'অনেক দূরের কথা বলছেন। ঠিকঠাক ঠাহর হয় না। আমি বরং চা-টা নামাই।'

গরম গেলাসটা হাতে আসার আগে অমলকান্তি লম্বা লম্বা হোগলায় ছেয়ে থাকা, কচুরিপানায় ঢেকে থাকা জলাভূমিটা দেখছিল। ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ হয়ে যাওয়ার পরে এমন আর থাকবে না। চিরে রাস্তা বেরোবে। সব খড়হাঁস এলাকাছাড়া হবে। পালিয়ে বাঁচবে। এই চা-দোকানটা কি টিকবে? কলেজের নির্মাণ শেষ হয়ে এসেছে। এই কলেজ তৈরি হতে থাকার সুবাদে দোকানটা হয়েছে। কলেজে আসার রাস্তা

এরপর মোরাম থেকে পিচঢালাই হয়ে তাকে মুছে দেবে। আজ থেকে ১ বছর পরেই হয়তো এখানে আর সকালে বেড়াতে আসতে ভালো লাগবে না।

কষ্ট হবে অমলকান্তির। ১টাও খড়হাঁসের ছবি তো সে তোলেনি।

কথা বলার মেশিনটা আজ ছবি তোলার যন্ত্র হয়ে গেছে। ঘোড়াকে দলাইমলাই করতে করতেই কেউ একলাফে পিঠে চড়ে বসল, আর জকি হয়ে গেল। আস্তাবলের ইঁদুরগুলো সংসারে এসে ঢুকছে। ইঁদুরকে বিষ দিলে যে গৃহস্থের অকল্যাণ হয়, এই ধারণাও আজ অনেক দূরের হয়ে গেছে। ইঁদুরের যে ক্ষুদ্র জীবন, তার যে শস্য আহরণ, সে যে চুরি নয়, সে যে তার অধিকার, এই বিশ্বাস আমরা কবে হারিয়ে ফেললাম? বরং বিড়াল পোষা ভালো। ইঁদুর আর বিড়াল দুজনেই আশ্রয় পাক। দুধ। আর ধান। নিজেরাই তাদের অধিকারের সীমা বুঝে নিক গৃহের সীমানার মধ্যে। কালো দেওয়াল জুড়ে নিরপরাধ সাদা রৌদ্রের আলপনা আঁকা হোক। যদি রক্তের ছিটেফোঁটাও পড়ে, সে যেন বিষের স্পর্শ থেকে মুক্ত থাকে। প্রয়োজনীয় হিংসায় মালিন্য থাকে না। শুধু, জাল ফেলে মাছ ধরতে নেই। পাপ। এটুকুই। 'মাছ' আর 'জাল' এই দুটো শব্দ যদি কাছাকাছি আসে, মাঝখানে 'ক্ষুধা' নয়, 'বিলাস' এসে বসে। 'শ্রম' নয়, 'সুবিধা' এসে বসে। সুবিধা আর প্রগতিকে এই বাংলায় আজ আর আলাদা করা যাচ্ছে না। কিংবদন্তিগুলো নেই হয়ে বেঁচে থাকছে। সব মূর্তির মাথায় আজ মানুষ আর মানুষীর গু লেগে আছে।

২০২৪-এর প্রেমিক-প্রেমিকারা এবং সুভাষচন্দ্র বসু

'আজও বাঙালি ভাবে সুভাষ বোস ফিরে আসবেন। এই ২০১৭ সালেও কেউ কেউ ভাবেন। তাই না? কী যে আশ্চর্য ওই মানুষটা!'

'আপনি ভাবেন, মানিকবাবু?'

'না। আমি অত সহজ-সরল নই।'

'আর ওই যে মেয়েটা মোবাইল মুখে গুঁজে বসে আছে? টিউশন পড়তে যাচ্ছে। পথে পার্কে ঢুকে প্রেমিকের সঙ্গে একটু দেখা করে নেবে। আলাদা কোনো কথা হবে না। এখনও সে প্রেমিকের সঙ্গেই কথা বলছে। যখন দুজন পাশাপাশি বসবে, তখনও দুজনে মুখে নয়, মোবাইল টিপে টিপে টেক্সট করবে, সে কথা যাতে কেউ

শুনে না ফ্যালে। ও কি ভাবে সুভাষ বোস ফিরে আসবে? ওর প্রেমিক কি তা ভাবে?'

'ওরা কেন তা ভাববে? ওরা পড়ার বইয়ের বাইরে ওঁর নামই শুনেছে কিনা সন্দেহ। আর স্কুলে একটা ছুটির দিন পেয়েছে। আম্বেদকর আর সুভাষের ছবি আলাদা করে চিনতেই পারবে না হয়তো। ওরা কি দেশ নিয়ে কথা বলে নাকি? রাষ্ট্র কাকে বলে জানে? খুব বেশি হলে ভোট নিয়ে কথা বলে। চাকরি-বাকরি নিয়ে বলে। তাৎক্ষণিক কিছু ইস্যু হয়তো এসে পড়ে মুখে। এরপর যে জেনারেশনটা আসবে, তারা হয়তো রবীন্দ্রনাথ আর গান্ধির ছবিও আলাদা করে চিনতে পারবে না।'

'আচ্ছা, কী নিয়ে কথা বলে ওরা? কী নিয়ে কথা বলে ২০১৭-র প্রেমিক-প্রেমিকারা?'

'জানি না সুমিত্রা। যতটা বুঝি, ক্রিকেট নিয়ে। সিনেমা নিয়ে। সিরিয়াল নিয়ে। সেক্স নিয়ে। কিংবা... শুধুই অর্থহীন মোবাইল টিপে যায়।'

'তাই কি?'

'তাই তো মনে হয় আমার সুমিত্রা।'

'বয়স কত হল?'

'কেন? বুড়োর মতো কথা বলছি? আমার কিন্তু আজও লাঠি লাগে না। দাঁত বাঁধাতে হয়নি। আমি ফেসবুকেও আছি। স্মার্টফোন কিনে দিয়েছে মেয়ে। সহজেই শিখে নিয়েছি।'

'না। হয়তো তা নয়। আপনি বুড়ো নন। কিন্তু, একবারও ভেবে দেখেছেন, আপনার-আমার মধ্যে এই যে কথাগুলো হচ্ছে, ওরা কিন্তু আমাদের মনোভাব জানে। ওরা জানে আমরা প্রেম করছি না। আমরা হাজব্যান্ড-ওয়াইফ নই। পার্কে এসেছি শুধু একটু তাজা বাতাসের জন্য।'

'সেটা হতে পারে। ওদের বাপ-মা ওদের নিশ্চয়ই বোঝানোর চেষ্টা করে। অস্বীকার করছি না। ওরা বোঝার পাত্র নয়।'

'আমরা কিন্তু ওদের মনোভাব জানি না।'

'বললেই হল! ওই যে কুৎসিত...'

'দোলনার ধারে ওই ছোট্ট নীল ফুলটাকে দেখুন। পার্কের লোকেরা ওকে লাগায়নি। নিজেই হয়েছে। কোনোভাবে বীজ এসে পড়েছে। ওর জীবনপ্রণালী আপনি জানেন? আচ্ছা, ওই ফুলটার সঙ্গে নন্দকুমারের ফাঁসি, অন্ধকূপ হত্যা, মন্বন্তর, অনুশীলন সমিতি, বোমার মামলা, অরবিন্দ ঘোষ, চিত্তরঞ্জন দাশ, বাঘা যতীন, জওহরলাল, বিধানচন্দ্র রায়, জ্যোতি বসু, বানতলা, সিঙ্গুর, নন্দীগ্রাম, ছত্রধর মাহাতোদের কোনো যোগসাজশ আছে? দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ও কিছু জানে? সাদ্দাম হোসেন, জর্জ বুশ, বা ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে ওর কিছু আছে মনে হয়?'

'আপনি আমার মায়ের মতো কথা বললেন। তাঁর সব কথা বুঝতে পারতাম না। বাবাও পারতেন না। আমার মা কবিতা লিখতেন, জানেন? একবার বিষ্ণু দে-র সঙ্গে একই পাতায় তাঁর কবিতা ছাপা হয়েছিল ১টা পত্রিকায়।'

'আপনার মা! কবি! কতদিন আগের মানুষ! আচ্ছা মানিকবাবু, ও কি কালিম্পঙের ফুল? কালিম্পং একসময় মার্কিন আর ব্রিটিশ গুপ্তচরদের ঘাঁটি ছিল। আচ্ছা, ও কোনো বিষাক্ত ফুল নয় তো? বাচ্চাগুলো খেলছে ওখানে। নীল রং তো! গা শিরশির করে...'

সে

জমির কাছাকাছি দেওয়াল থেকে কিছু মাটি খসে যেতে চায়। ঘরগুলোর ওপরে সরাসরি উজ্জ্বল সাদা রোদ পড়ে। আলকাতরা মাখানো দেওয়ালের কাছে এসে রৌদ্র তার কিছুটা অংশ রেখে দিতে চায়। সেটা তাপ হয়ে রয়ে যায় গ্রামের বাতাসে। ঘরে সে তাপ ঢোকে না। আমি ধোঁকা দিয়ে ঢুকে পড়েছি এই গ্রামে। এই গ্রামের সাবলীল জীবনযাত্রার মধ্যে দিব্য ঢুকে পড়েছি ভাইরাসের মতো। তোমরা বাধা দিলে না কেন? ভাবছ আমি তোমাদের নতুন শিশুর জন্মের ছবি আঁকতে এসেছি। ভাবছ আমি তোমাদের নবান্ন উৎসবের ছবি এঁকে নিয়ে যাব? ভাবছ ওই সবুজে সবুজ মাঠটা কবে সোনালি ফসলে ভরে যাবে, সেই দিকে তাকিয়ে বসে আছি? ভাবছ তোমাদের ডিপ টিউবওয়েলের জলের যে স্বাদ, তা আমাকে ভুলিয়ে রেখেছে? তা নয়।

আমি এসেছি তোমাদের সবচেয়ে পুরাতন মানুষটার ছবি আঁকব বলে। সে মানুষটা নাকি গত ৬০ বছর রৌদ্রে বেরোয়নি। অন্ধকারেও তাকে দেখা যায়নি। শীত হোক,

বা গ্রীষ্ম, সে ছেঁড়া চট জড়িয়ে থাকে সারা গায়ে। সেই চটের ভিতরে রাশি রাশি আরশোলার বাসা। কে দিয়েছে সেই চট? সেটা কি আলুর বস্তা? সে সপ্তাহে একবার জল খায়। মাসে একবার ভাত। কে তাকে জল দেয় কেউ জানে না। ওসব হিসেব কে রাখে? কে জানতে পারল ওসব হিসেব? কে তাকে ভাত দেয় কেউ জানে না। সে কারও দিকে তাকায় না। সম্ভবত অন্ধ নয় সে। তার নজর লাগলে হয়তো মানুষ মরে-টরে যায়। সে গত ৬০ বছরে একটাও কথা বলেনি। সম্ভবত বোবা নয় সে। তার গলা শুনলেও হয়তো মানুষ আর বাঁচবে না। সে স্ত্রী নাকি পুরুষ, সেটাও কেউ জানে না।

গ্রামের মধ্যে তাকে চোখে দেখেছে, এমন কাউকেও পাওয়া মুশকিল। কেউই বলতে পারে না মানুষটা গ্রামের কোথায় আছে। কোন ঘরে? কোন পোড়ো মন্দিরে? কোন গাছতলায় ভাঙা মাজারে? কেউ জানে না। সে আজ থেকে সাতচল্লিশ বছর আগে এই গ্রামে এসেছিল। সে কোন ভাষার মানুষ, তা-ও কেউ জানে না। ভাষার আরেক নাম দেশ। ৬০ বছর আগেও কারা তাকে দেখেছিল, কেউ জানে না। আজও কে তাকে দেখেছে, কেউ জানে না। সে যে ভূত নয়, এটা নিশ্চিত। কারণ এই সবই শোনা গেছে তার সম্পর্কে। যারা বলেছে তারা মিথ্যে বলার মানুষ নয়। তারা কারা? তারা কবে? তারা কোথায়? লোকটা অশ্বত্থামা নয় তো? সুভাষ বোস? সময়ের স্রোতে সে আটকে আছে। যেমন অভিশাপ হয়, অথবা পাথর।

'এঁজ্ঞে কত্তা, যে মনিষ্যিটা একলা থাকতেই চায়, তাকে না ঘাঁটানোই তো মঙ্গল।'

'মানুষটা যে আছেই, সেটা কি তোমরা জানো? হলফ করে বলতে পারো?'

'এঁজ্ঞে, কথা যখন তার আছে, মনিষ্যিটাও আছে।'

'কী কথা? কী নাম তার? জানো?'

'এখনও নাম রাখা হয়নি এঁজ্ঞে। আপনি মন্দিরের কাছের ওই মসজিদটার ছবি আঁকবেননি?'

তাকে আমি দেখতে চাই। পৃথিবীর সে-ই ১মাত্র লোক, যার আজ নাম রাখা হয়নি। শুধু তার কথা আছে। তার নাম কেউ তুলে রাখেনি। নামিয়ে রাখেনি। প্রয়োজনে আমি ৬০ বছর অপেক্ষা করব তোমাদের গ্রামে। কোনোদিন না হওয়া ১টা অসুখ হয়ে থাকব। তাকে দেখতে। আমি থেকে যাব। সে হয়ে। সে। আমি।

আমিই সে। যাকে কেউ দ্যাখেনি, নাম রাখেনি। সে-ই আমি। যাকে লোকে দেখেছে, নাম রেখেছে। অশ্বত্থামা। ভাওয়াল সন্ন্যাসী। সুভাষ বোস। নাম তাকে যতই মারুক, সর্বনামের মৃত্যু নেই। কেবলমাত্র কথা রবে, মা।

কেন পড়ছেন

আর এই যে লেখাটা ক্রমে এগিয়ে দিচ্ছি আপনার দিকে, পাঠক। আপনি খুব সকালে উঠে হাতে গরম চায়ের কাপ নিয়ে সেটাকে রাখলেন আপনার পড়ার টেবিলে। পত্রিকা খুললেন। দেখলেন পাশেই রয়ে গেছে গত সন্ধের খালি এবং বাসি কাপ। আপনি সেটাকে থাকতে দিলেন। ২-১বার ভুল করে সেটাকে তুলেও নিলেন। তার ঠান্ডা ওজন আপনাকে শিউরে দিল। আপনি বুঝলেন ১জন লেখক ঢুকে পড়তে চাইছে পুরাতন রঙের ১টা নতুন বাড়ির মধ্যে। সেখানে নড়বড়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসতে হয় স্নানের চৌবাচ্চায়, সেখানে অফুরন্ত স্নানের সুযোগ নেই, আর ফাঁকা রান্নাঘরে দুপুরের শুকিয়ে যাওয়া ভাত বাড়া থাকে, পাশে উচ্ছের তরকারি, ক্ষুদ্র বাটিতে সামুদ্রিক মাছের তীকষ্ন অখাদ্য ঝাল, ডাল নেই। আপনি বুঝতে পারলেন এই লেখা জীবনের চেয়ে বেশি কিছুই নয়। মৃত্যুর চেয়ে কম কিছুই নয়। ১-ই পেয়ালা থেকে যেখানে অজস্র মানুষ উবু হয়ে বসে নেশার উত্তাপ শুষে নিতে চায়, মন্দির-মসজিদ-গুরুদ্বার-গির্জার বাইরে, সিপিএম-তৃণমূল-কংগ্রেস-বিজেপির বাইরে, এই লেখা সেই মধুশালার মতো অমৃত কিছুই নয়। আজ ধার। কাল নগদ।

নাম কি কম কথা গা! নামের নাম কে রেখেছিল? কে রেখেছিল name? তারা কি একই লোক? সেই লোকের নাম কী ছিল? জলের নাম কেন তসবির হল না? রুটির নাম কেন খোরশেদ হল না? কেন বাস থেকে নেমে আসা লোকটার ট্রেন থেকে নামা হল না আজও? এই শহরে অজস্র তৈলকণা ওড়ে। নাক বন্ধ করে দেয়। মাথা ধরিয়ে দেয়। খুব ভোরে উঠেও বাতাসে একটা ঝাঁঝালো তেলের ঘ্রাণ পাওয়া যায়। মনে হয় এক চিরদুপুরের নাম কোথাও মিলিয়ে গেছে শান্তির ধারণায়। তাকে আর পাওয়া যাবে না। তেলের নাম যদি বাতাস রাখা হত? হয়তো পৃথিবীটা অন্যরকম কিছু হত। শুধু বাতাসের কারণেই তাহলে কি পৃথিবীতে যুদ্ধবিগ্রহ হত? বাতাসের খনিগুলোর দিকে ছুটে যেত ক্ষেপণাস্ত্রগুলো? আর যদি হাওয়ার নাম হত সোনা? হত না। যে যার নিজের নামে আছে। ১টা লোক ধীরে ধীরে নিজের নাম

হয়ে যায়। তারাপদ রায় জীবনের শেষ মুহূর্তে পৌঁছে তারাপদ রায়ের মৃত্যু খুঁজে নেয়। গোবর্ধন ঢ্যাং আজীবন খুঁজতে থাকে কোথায় লুকোনো আছে গোবর্ধন ঢ্যাঙের অন্তিম শ্বাস। গোবিন্দপুরে কোনোদিন জমে থাকে না মুকুন্দপুরের মেঘ। বৃষ্টি হয়ে ঝরে যায়।

নাম। পোস্তবড়া। আর সীতাহরণের কাহিনি

নাম ১টা ক্ষতচিহ্ন। নির্ধারিত মাত্রায় সে জমে থাকবে কিনা, সেটা অনেক কিছুর ওপরে নির্ভর করে। বিপিন পাল তো হাজার হাজার আছে। কিন্তু ১টা বিপিন পাল ইতিহাস হয়ে যায়। জীবন দাস তো কতই আছে। ১টা জীবন দাস ট্রামের তলায় তার অন্তিম শ্বাসের সন্ধানে চিরসুন্দর হয়ে ওঠে। অমিতাভ শ্রীবাস্তব হয়ে ওঠে অমিতাভ বচ্চন। শচীন কখন যেন খবরের কাগজের কেরামতিতে সচিন হয়ে যায়। কোথাও কোনো পূর্ববঙ্গ না থাকলেও, ১টা পশ্চিমবঙ্গ রয়ে যায়। পশ্চিমবঙ্গের পূর্ব সীমানায় রক্ত জমাট হয়ে আছে, পুঁজের সম্ভাবনা কিছুতেই মিলিয়ে যায় না। দেশভাগের ক্ষত নিয়ে কিছু লোক মোহনবাগান থেকে রিয়েল মাদ্রিদ আর ইস্টবেঙ্গল থেকে বার্সিলোনার দিকে ছুটে যায়। আজও, এই ২০১৭-তেও, কিছু মানুষ ফেঁসে আছে দুই বাংলার মধ্যে।

'আমি বাঙাল নই। আমার ও-দেশের কোনো স্মৃতি নেই। আমার বাবা-মারও কিছু মনে নেই। কোনো কল্পনাও নেই। ঠাকুমার নাকি আবছা কিছু স্মৃতি আছে। সে সেগুলো মুছে ফেলতেই চেয়েছে মন থেকে। বিধবা ঠাকুমা বাবাকে নিয়ে যখন এ-দেশে আসে, তখন তার বয়স আঠারো। বাবা তখন কোলে।'

'তোমার ঠাকুমা বিধবা কেন হয়েছিলেন?'

'দাঙ্গায়। করিম শেখ দাদুর বন্ধু ছিল। সে-ই দাঙ্গার সময় দাদুর মাথা টাঙি মেরে দু-ফাঁক করে দিয়েছিল। দাদু তখন ডাক্তারির উজ্জ্বল ছাত্র। দেখুন, ও দেশের প্রতি আমাদের কোনো মায়া নেই। মোহও নেই। বরং ভয় আছে।'

'কোনো কাঁঠাল বা হিজল গাছের কিংবদন্তি কি তোমার বুকে নেই?'

'না।'

'রুই আর কাতলায় ভরে থাকা কাকচক্ষু কোনো পুকুর তোমার ঠাকুমার চোখে ভাসত না? মৌরলা মাছের ঝাঁক?'

'না। ঠাকুমা ও-দেশের নাম মুখেই আনতে চাইত না। পূর্ববাংলা শুনলে শিউরে উঠত। এমনকি ফরিদপুরের বাংলাটাও ধীরে ধীরে মুছে ফেলেছিল মুখ থেকে। এ-দেশের ভাষায় বাংলা বলত। যদিও একটু টান রয়েই যেত। বিহারি বা মাড়োয়ারিদের যেমন হালকা থেকেই যায়।'

'ওদের সঙ্গে তোমার ঠাকুমার কোনো মিল হতে পারে না।'

'উদাহরণ দিলাম।'

'ওটা উদাহরণ নয়। সীতাহরণের মতো শোনাল। যাইহোক। ১টা আশ্চর্য অভিব্যক্তি তুমি প্রকাশ করলে। হয়তো না জেনেবুঝেই।'

'কী?'

'এ-দেশের ভাষায় বাংলা বলত তোমার ঠাকুমা। এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কথা। যাইহোক। ঋত্বিক ঘটকের সিনেমা কি দ্যাখো? ওই যে রেলগাড়ি ছুটতে ছুটতে ছুটতে থেমে গেল শেষ হয়ে যাওয়া ১টা লাইনের ওপরে...'

'কেন দেখব না? সিনেমা হিসেবেই দেখি। ওই সিনটা ভিস্যুয়ালি তো দারুণ! বাস্টার কিটনের মুভিগুলোর সমকক্ষ প্রায়।'

আশ্বিনের আলোয় পল্লিবাংলার কোনো ঘর দেখে বোঝা যায় না, সেটা ১৯৪৭-এর না ২০২৪-এর। সেটা বরিশালের না হাবড়ার। খুব কুচুটে খুব হিংস্র দুর্নীতিপরায়ণ মানুষের ঘরের পাশেও আগাছা আর বুনো ফুলগুলো শান্তভাবে ফুটে থাকে। সেও কিছু আশীর্বাদ পায়। ১টা আশ্চর্য আকারহীনতা দিয়ে গড়া হয় বাংলার পল্লিজীবন। সেই আকারহীনতার আরেক পিঠ শান্ততা। সেটা শতাব্দীর পর শতাব্দী কেটে গেলেও একটুও বদলায়নি। এমন ১টা ঘাট নেমে যায় পুকুরের পাশে, সেখানে পা রেখে শুধু বাংলার লোকই নামতে পারে। নির্দিষ্ট জ্যামিতি আর পাটিগণিতকে বাংলার জীবন চিরকাল অস্বীকার করতে চেয়েছে। সে সংস্কৃত মন্ত্রের চেয়ে পাঁচালিতে স্বস্তি পায় বেশি, তার ভক্তি তবেই জেগে ওঠে। মন্দ্র কোনো ধ্বনি তাকে টানে না। সে চায় এলিয়ে পড়া এমন এক সুর, যা বৈদিক মন্ত্র আর আজানের মধ্যে তার জীবনের বায়বীয় শ্রীকে ধরে রাখবে, তাকে দিবানিদ্রার ছন্দ দেবে। তার সব ক্লান্তি আর ত্রাস শুষে নেবে পয়ারের ৮ + ৬। খুব ঈর্ষাকাতর মানুষটাও এখানে শান্তিই চায়, অন্যের শান্তিতে সে বিষনজর দেয়। তার শান্তিকামনার মধ্যে বাঙালি

চিরকাল চেয়েছে ঘুমোতে। তাকে অনাবিল পরিশ্রমের শেষে অফুরন্ত ঘুমের সুযোগ আজও কেউ দিল না। তবু, আজও তো সে অনলাইনে পোস্তর অর্ডার দেয়। তার পোস্তবড়ার মাপ আর কত ছোটো হবে? অনলাইনে জিনিস কিনলে দোকানের চেয়ে সস্তাই হয়। এবং, খাঁটি জিনিস পাওয়া যায়। ২০১৭-য় এই হল বাংলার প্রাচীন প্রবাদ।

সীমান্ত সংলাপ

'তোমার পাসপোর্টের মধ্যে আমি আমার পাসপোর্টটা ঢোকাতে চাই। অনেকখানি সাদা মেঘ আমি বের করে দিতে চাই ওই বিদেশে। কোনো জমিকে আমি অনাবাদি রাখব না। কেউ তোমাকে অসম্মান করুক আমি চাই না। তোমার কোনো নদীকে আমি শুকিয়ে যেতে দেব না। আমি তিস্তার ইতিহাস জানি।'

'আমার পাসপোর্ট তোমারটার চেয়ে অনেক ছোটো। ঢুকবে না। কিন্তু সেটা বোঝানোর জন্যই কি ঢোকাবে? তুমি আমার চেয়ে শক্তিমান, আমি তোমার নীচে পড়ে থাকব, অথবা তোমার সামনে নুয়ে থাকব। এই তোমার পাসপোর্টের সুখ, তাই না?'

'দূর থেকে যে কোনো কাগজকে অমনই মনে হয়। ওই দ্যাখো কালো মলাট পেরিয়ে ছোটো ছোটো সোনালি পাখিগুলো উড়ে যাচ্ছে। গাছপালাগুলো কী সুন্দর! সবুজে সবুজ প্রান্তর আর টকটকে লাল ১টা সূর্য উঠেছে। একটু ফাঁক করো। তাহলেই আরও উজ্জ্বল হবে। আমি আমার উজ্জ্বলতা নিয়ে ঢুকে পড়ব। তোমার লাগবে না। প্লিজ নিয়ে নাও।'

'ভিসা করিয়েছ?'

'লাগবে না।'

'কী লাগবে না? ব্যথা? তোমার উজ্জ্বলতা আরও দৃঢ় হোক। তখন ভাবব। বরং অনেক দৃঢ় এবং উত্থিত কিছুকে সহে নেব। তোমার পাসপোর্টের নরম কাগজের আঘাত আমি নিতে চাই না। তোমার সীমান্তনীতি তোমারই থাক। আমার ওপরে চাপাতে এসো না।'

সমুদ্র সংলাপ

'স্যার, ওই বই তো সব খুলতে রাজি হচ্ছে না।'

'কী বলছে কী?'

'বলছে ও জ্যাকেট খুলে রেখে ঢেউয়ের মধ্যে নেমে যাবে। পেছনের মলাট দেখা যাবে। সেই সুযোগ আপনি নিতে পারেন। শুধু পেছনের মলাটের সুযোগ দেবে, তা-ও ঢেউয়ের মধ্যে। কিন্তু সামনের মলাট, বিশেষ করে শিরোনামকে নেওয়ার কোনো সুযোগ ও দেবে না। ঢেউ থেকে উঠে আসার আগে ও আবার জ্যাকেট পরে নেবে। আপনি যে শিরোনামের ক্লোজ সুযোগ চেয়েছিলেন, সে আর হওয়ার নয়।'

'জ্যাকেট খুলে রেখে ঢেউয়ে নামবে, তাহলে উঠে আসার আগে সেই জ্যাকেট ঢেউয়ের মধ্যে পাবে কী করে?'

'সেটা বলেছি। ও বলছে সেটা প্রকাশকের যুক্তির ব্যাপার।'

'ওকে বলেছ, একবার যদি ওর শিরোনামের ক্লোজ সুযোগ দেখাই, ওই একটা সুযোগেই বাজার ফেটে যাবে? পাঠকরা রাতে ঘুমোতে পারবে না ওকে ভেবে ভেবে?'

'বলেছি। ওর কথায় সেটা লেখকের ব্যাপার। সেসব নিয়ে ওর মাথাব্যথা নেই। ও জানে ৩০ বছর পরেই ১টা বইয়ের বাঁধাই ঢিলে হয়ে যায়। পোকার পৃথিবীতে বইয়ের অমরত্ব ১টা মিথ। ১টা বইয়ের প্রতিটা কপিকে কেউ মনে রাখে না। ওকেও রাখবে না।'

'কিন্তু ও হয়তো জানে না, প্রথম ছাপা বাইবেলের ১টা কপির এখন দাম কত! শেক্সপিয়ারের প্রথম এডিশনগুলো নিলামে কত দামে কাটে ও জানে? আর, ও তো আলাদা হলেও চমৎকার ১টা বই। আমাদের পাবলিকেশনের প্রতি আসলে ওর ধারণা নেই। শ্রদ্ধাই তৈরি হয়নি। আচ্ছা, যদি ওর পৃষ্ঠা বাড়িয়ে দিই? জিজ্ঞাসা করে এসো। তেমন হলে প্রধানা বইয়ের সঙ্গেও ওর ১টা সমগুরুত্বের আলোচনা রেখে দেব।'

'তখন প্রধানা বই রেগে যাবে। সে তো সব দেখিয়েছে! সে ওর সঙ্গে আলোচনা শেয়ার করবে কেন? আর, প্রধানা বই সমগুরুত্ব সমর্থন করে না। বলে ওসব অপ্রাকৃতিক নোংরা কদর্য রুচির ব্যাপার। সমাজের একদম তলায় পৌঁছোনোর অনেক সুযোগ আর অফার ও ছেড়ে দিয়েছে ওই কারণেই।'

'শালা! মাঝেমধ্যে ইচ্ছে করে পাবলিকেশনের ব্যাবসা বন্ধ করে অন্য কিছু শুরু করি।'

'২ বাংলা ১ করার চেষ্টা করলে কেমন হয় স্যার?'

'ক-বোতল বাংলা খেয়েছ আজ?'

'স্যার, ১টা বাংলা বই পড়ছিলাম।'

একটা বই হন্তদন্ত হয়ে ঢুকছে মেট্রো স্টেশনে। হাতে একটা ছোট্ট ট্রলি। লাস্ট মেট্রো ধরবে। শুনশান রাত। তার পেছনেই দুজন পাঠক। তারাও হন্তদন্ত। কিন্তু বই বলে কথা! চোখ ঠিক চলে যায়। হঠাৎ একজন পাঠকের চোখ পড়ল সামনে হনহনিয়ে এগিয়ে চলা বইটার ধপধপে সাদা মলাট কিছুটা উঠে আছে, অনেকটা দেখা যাচ্ছে, বোঝা যাচ্ছে। সে খ্যাঁক করে হেসে পাশের পাঠককে কনুইয়ের গোঁত্তা মারল। সেই পাঠক তাকাল।

দ্বিতীয় পাঠক বইটাকে ডাকল, 'হেএএই!'

বই ফিরে তাকাল।

পাঠক আঙুল দিয়ে দেখাল।

বই জিভ কাটল। মলাট ঠিক করে নিয়ে বলল, 'থ্যাংকস!' আবার হনহনিয়ে চলে গেল।

প্রথম পাঠক বেশ নিষ্ঠুর বোঝা গেল। সে দয়ালু পাঠককে বলল, 'কেন দেখাতে গেলি? বেশ দেখছিলাম! মাইরি, বই একটা! শিরদাঁড়ার ভাঁজটা দেখেছিস?'

দয়ালু পাঠক বলল, 'দেখার ওটা পদ্ধতি নয় চাঁদু। চলে এসো। ট্রেন মিস করব।'

স্ট্রিপটিজ

একটু পরে দয়ালু পাঠক একা একটা প্লাটফর্মে। নিষ্ঠুর পাঠক তাকে পৌঁছে দিয়ে চলে গেছে। দয়ালু পাঠক অধৈর্যভাবে পায়চারি করছে। ওভারব্রিজে ধাতব শব্দ হচ্ছে। কিন্তু কেউ কোথাও নেই। হয়তো রাতের ওভারব্রিজ অমন শব্দ করেই থাকে।

হঠাৎ দয়ালু পাঠক দেখতে পেল উলটোদিকের প্লাটফর্মে সেই বইটাও একা দাঁড়িয়ে আছে। পাশে ট্রলিটা দাঁড় করানো। ওটার মধ্যে কি অনেক ডিকশনারি

আছে? মুখে-চোখে উৎকণ্ঠা। ট্রেন এলে যেন পাতায় চাঁদ পায়।

দয়ালু পাঠক উল্লসিত হল। আশেপাশে তাকিয়ে নিয়ে অব্যক্ত আওয়াজ দিল একটা। বইটা দেখতে পেল। একটু অবাক হল। চিনতে পারল। পাতা নাড়ল। দয়ালু পাঠক পুলকিত। সবেগে হাত নাড়ল। হাতের ভঙ্গিতেই জানতে চাইল। কী জানতে চাইল সম্ভবত সে জানে না। বইটা মুখ টিপে হাসল। পাতার ইশারায় বুঝিয়ে দিল লাস্ট মেট্রোর অপেক্ষায় আছে। যেন দয়ালু পাঠক সেটা জানে না।

দয়ালু পাঠকের আস্পর্ধা বাড়ল। সে হাতের ইশারায় বোঝাতে চাইল সেই মলাট উঠে থাকা দৃশ্যটা। বোঝাতে চাইল দৃশ্যটা তার বেদম ভালো লেগেছে। বুড়ো আঙুল আর তর্জনির ডগা এক করে বোঝাল বইটার গড়ন দারুণ লেগেছে তার। বই আবার কপিরাইট টিপে হাসল। ছেনালি করল। দয়ালু পাঠক উত্তেজিত হয়ে পড়েছে, বোঝা যাচ্ছে। সে ইশারায় বইটার নম্বর জানতে চাইল। বই রহস্যময় হাসল।

বই নিজের দিকে দেখাল। ইশারায় জানতে চাইল দয়ালু পাঠক কী চায়। সে কি সব দেখতে চায়?

দয়ালু পাঠক হাঁ হয়ে গেল। প্লাটফর্মের দিকে আঙুল দেখিয়ে জানতে চাইল বই কি তাকে ওখানেই সব দেখাবে। তার বিশ্বাস হচ্ছে না।

বইয়ের মুখে রহস্য বাড়ল। বই এদিক-সেদিক তাকাল। মলাটে সূচিপত্র রাখল। একটার পরে একটা নাম খুলতে শুরু করল।

বইয়ের যে পায়ু হয়, তার নাম কি সমকাল? বইয়ের যোনিতেই কি মহাকাল ঘাপটি মেরে থাকেন? স্পার্মের জায়গা কোথায় হয়? কিংবা, বইয়ের যেন শিশ্ন নেই, এটাই আমরা ধরে নিচ্ছি কেন?

কোনো মানে হয় না এসবের।।

ধর্ম। চুপ

গাছের পাতায় রক্ত জমে আছে। অথবা রস। গাছের পাতায় রক্ত জমে আছে, সেটা যথেষ্ট গভীর ও স্মিত এক দৃশ্য। অথবা ফিলজফি থেঁতলে বেরিয়ে এসেছে রস। শাশ্বত মারা গেছে। সে স্থায়ীভাবেই মারা গেছে, কারণ আমরা তাকে মেরে ফেলেছি। আমরা বলছি সে বেঁচে ছিল না কখনও। আমরা বলছি তার ধারণাটাই

অনেক অনিষ্টের কারণ। কার মাথায় প্রথম এসেছিল শাশ্বতর ধারণা? কোনো বৈদিক ঋষি? গুহার প্রাচীরে যারা কাঠকয়লায় ছবি এঁকেছিল, সেই মাদি এবং মদ্দাদের কেউ? মধ্যরাতে জন্ম নিয়েছিল কি শাশ্বতর প্রথম ধারণা? নাকি উষাকালে? নাকি সন্ধ্যার ঠিক আগে কোনো খাড়া গিরিচূড়ায় শিকারে ব্যর্থ হওয়া কোনো ভঙ্গুর মানুষ প্রথম ভেবেছিল অনাদি অনন্তর বুকে বর্শা বিঁধিয়ে দেওয়ার কথা? পাথরের বর্শা ছিল অবশ্যই। বিপুল ম্যামথের বুক থেকে ফোঁটায় ফোঁটায় ঝরে আসা রক্তের মতো, গাছের পাতায় রস জমে আছে। মৃত্যুর রস। আমরা গাছকে মেরে ফেলেছি। শূন্য পাহাড়ের বুকে যেমন বল্লম ঝুলিয়ে দিতে হয়, আমরা আমাদের মুক্তি নিয়ে একা। শাশ্বত আর আমাদের দেখভাল করবে না।

'এখন আমরা চুপ থাকা নিয়ে কথা বলব। ধর্ম নিয়ে নয়।'

'কেন বলব কথা?'

'পৃথিবীতে কিছু আগ্নেয়গিরি আছে। স্থানীয় লোকেরা সেগুলোকে নরকের দ্বার মনে করে। গেট অব হেল। সেখানে মানুষকে উৎসর্গ করা হয়। শিশুকে, নারীকে ছুড়ে দেওয়া হয় আগ্নেয়গিরির হাঁয়ের মধ্যে।'

'দেওয়া হয়, নাকি দেওয়া হত?'

'ধর্মযাজকরা আগ্নেয়গিরির হাঁয়ের পাশে ক্রুশ তৈরি করে দিয়েছে, যাতে তার মধ্যেকার দানবিক পৈশাচিক শক্তিগুলো বেরিয়ে আসতে পারে।'

'দিয়েছে, নাকি দিয়েছিল?'

'পার্থক্য কি কিছু আছে? আজও তো ধর্মের নামে মানুষকে খুন করা হয়। দ্যাখো, ওই বাচ্চাটা যাচ্ছে। গলায় তাবিজ।'

'দ্যাখো ও তুলসীতলাটা। বউটা ওখানে প্রদীপ জ্বালে। ওর শাশুড়ি জ্বালত। ওর বউও জ্বালবে। হয়তো জ্বালবে।'

' এ তো আবার পুরুষতান্ত্রিক কথা বলছ।'

'দ্যাখো, যে-কোনো কথাকেই ধুয়ে নিলে সে আর তুলসীপাতা থাকে না। তোমাদের একটা অসুখ হয়েছে। সেটার নাম অতিবিশ্লেষণ। সবাই এখন কথা বলতে চাইছে। কেউ শুনতে চাইছে না। ফলে সব কিছু যে টুকরো টুকরো হয়ে যাবে, সেটাই স্বাভাবিক। তুমি এটা ভাবছ কেন ওই বউটি অপারেশন থিয়েটারে কারও

কিডনি দুর্দান্তভাবে প্রতিস্থাপিত করে আজ ঘরে ফেরেনি, বা ওর দুর্ধর্ষ ওকালতির জন্যই কোনো নির্দোষ আজ মুক্তি পেল না আদালত থেকে? এত সীমাবদ্ধ কেন তোমার ধারণাগুলো?'

'ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ি করলে আমি চুপ করে থাকব না। তর্কে সব খাক করে দেব।'

'কিন্তু ধর্ম শব্দটার মধ্যে যে একটা অনাদি-অনন্ত চুপ রয়েছে, সেটাকে কথা বলাবে কী করে? সে তো তর্ক করবে না! তুমি তোমার সম্প্রদায়ের হয়ে লড়ছ, যে সম্প্রদায় ধর্মের ব্যাপারে অসহিষ্ণু। ধর্মের তো কোনো সম্প্রদায় নেই। ধর্ম ব্যক্তিগত, যদিও ব্যক্তিসর্বস্ব নয়। নাহলে ডাক্তারের ধর্মের কী হবে? পুলিশের ধর্মের কী হবে? সেখানেও তো আইকন আছে, মন্ত্র আছে। সেগুলোও ছুড়ে ফেলে দাও। একটা আগ্নেয়গিরির মুখের সঙ্গে এই মুহূর্তে তোমার নিজের মুখের কত মিল, একবার আয়নায় দ্যাখো।'

শাশ্বত আর আমাদের দেখভাল করছে না। কোনো বই আজ আমাদের দেখভাল করছে না। রবীন্দ্রনাথের মাথায় পায়রার গু। স্ট্যাচুর পেছনে সবুজ ঝোপঝাড় ঘন হয়ে এসেছে। কিছু ইট পড়ে আছে। বেদি তৈরিতে ওরা অতিরিক্ত হয়েছিল। আজ থেকে কয়েক বছর পরেই, হয়তো ২০২৫ নাগাদ, রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে কার্ল মার্কসের মূর্তি ঘুলিয়ে ফেলবে বাঙালি। দিশা থেকে বিদিশার দিকে যেতে যেতেও 'দিক' শব্দটাকে খারিজ করা যায় না। বাঙালি বিদিশার দিকে যায়নি। গেছে দিশাহীনতার দিকে। শ্যামবাজারের মোড় ছাড়া আজ কোথাও নেতাজি সুভাষচন্দ্রের কোনো চিহ্ন নেই। অনাদির গায়ে ডেটলের গন্ধ, অনন্তর ধারণায় ফিনাইলের বোতল উলটে গেছে। মন্দির আর মসজিদের মধ্য থেকে লম্বা লম্বা পার্টি অফিস বেরিয়ে আসছে। এখন একটা সাদা দেওয়াল। আর তার গায়ে লেগে থাকা ফিনফিনে গোলাপি কিছু ফুল। ঢালু হয়ে নেমে আসা পাথুরে রাস্তা। পাথরে পাথরে ঘাস। দূরে অজস্র ঘরবাড়ি নিয়ে একটা শহর শুয়ে আছে। দুর্দান্ত রোদে।

কিংবা ওটা একটা গ্রাম। দুর্ধর্ষ রোদে। চুপ। চেতনা।

চৈতন্যে গিয়ে চুপ।

অনুন্নয়ণের কথা

স্মৃতি আর অভিজ্ঞতার মধ্যে খড়হাঁসগুলো। ৩ খড়হাঁস। ৬ খড়হাঁস। ৩০ খড়হাঁস। ২০০ খড়হাঁস। ১০০০ খড়হাঁস। ১০০০০ খড়হাঁস। অমলকান্তির ক্যামেরাটা পড়ে আছে। ধুলো খাচ্ছে। তার মধ্যে ১টাও খড়হাঁস কখনও ধরা দেয়নি। ১টা জলাভূমি আদিগন্ত অনুন্নয়নের স্মৃতি হয়ে আছে, এখন উন্নয়নের অভিজ্ঞতা মেখে। একটা খালি এবং বাসি থালার মতো। কিংবা ১ বিরাট যোনিমণ্ডল, হোগলা বন সূর্যের প্রথম কিরণে লাফিয়ে ধ্বনিত হয়ে আছে যেন অবাধ্য পিউবিক হেয়ার! যৌনকেশ যৌনকেশ যৌনকেশ মৌন।

কিন্তু, অনুন্নয়নের পক্ষ নিয়ে কথা বলা অনুমোদিত নয়। প্রগতি সেই অনুমতি দেয় না। মানবিকতা তার সমর্থক নয়। কাঁচা মাংস থেকে আগুনের দিকে যাওয়াই উন্নয়ন। শ্বদন্তের ক্ষয়ের নাম প্রগতি। খরস্রোতা নদীকে ছিঁড়ে দেয় যে সেতু, তার নাম প্রগতি। অগ্রগতি। কিন্তু অগ্রভাগ থেকে টুপটাপ ঝরে— শিশির, নাকি রক্ত? নাকি অশ্রু? ইতিহাস রক্তকে স্বীকার করে। রক্তকেও স্বীকার করতে হয়, বাধ্যতামূলক। অশ্রুর প্রতি ইতিহাস, ভূগোল, অর্থনীতির কোনো রাষ্টৰীয় দায় নেই।

এগোতে হলে কিছু কান্না পিছনে পড়েই থাকে, যদি পিছন বলে কিছু থাকে। যদি বৃন্দাবন হয়ে থাকে পিছন। অক্রুর সংবাদ কান্নার খতিয়ান। অনুন্নত গোপমহল কাঁদতেই থাকে। মহাভারতে তার জায়গা নেই। আলাদা করে রচনা করতে হয় সেই কান্নাকে। জন্ম হয় সেই মানুষের যিনি সকল নীতির সকল বিবেকবুদ্ধির পরোয়া না করে কুরুক্ষেত্রের প্রান্তরে ক্ষত্রিয়শূন্য করে দেবেন পৃথিবীকে।

সব কিছুই হারিয়ে যায়। গসপেলগুলোর মধ্যে হারিয়ে গেছেন সেই যিশু, যিনি ছিলেন তাঁর সময়ের বিপ্লবী, ১ জন সামরিক নেতা। তাঁর জীবনের বছরগুলো হারিয়ে গেছে। মেরি মাগদালেন হারিয়ে গেছেন। যিশুর জীবনযুদ্ধ হারিয়ে গেছে রোমান সম্রাট টাইটাসের পলিটিকাল কূটনীতি ও সাংস্কৃতিক চাতুর্যের ফলে। ইহুদিদের ইতিহাস তথা সাহিত্য রচনার কৌশল অবলম্বন করেই রোমানরা ইহুদিদের দিল যিশু নামক ১ মসিহা। জুডিয়ার মসিহানির্ভর বিদ্রোহ ফুরিয়ে গেল। তারপরে তো সম্রাট কনস্ট্যানটাইন আর তাঁর মা হেলেনা তৈরি করে দিয়েছেন খ্রিস্টধর্মের রোমান সাম্রাজ্যবাদী আদল। যে ক্রুশকে ঘৃণা করার কথা, রোমানরা সেই

ক্রুশকেই চুম্বন করাল যিশুপ্রেমিকদের। যিশু এসেছিলেন ১জন স্বশিক্ষিত পলিটিকাল লড়াকু নেতা হয়ে, যিনি ভারতীয় চিকিৎসা এবং বৌদ্ধ দর্শনে পারঙ্গম ছিলেন, ক্রুদ্ধ ছিলেন, তাঁকে ঈশ্বর বানিয়ে তাঁরই বিরুদ্ধে খাড়া করে দেওয়া হল তাঁর মৃতদেহকে। ক্রুশেই মৃত হয়ে, কিংবা, ক্রুশ থেকে বেঁচে পালিয়ে গিয়ে তিনি জানতেই পারলেন না তাঁর জীবনের কয়েকটা বছরকে সম্পূর্ণ পালটে ফেলে রোমানরা কেমন বিশ্বব্যাপী ভুলবোঝাবুঝির ব্যাবসা আর ইহুদিবিরোধী সাম্রাজ্যের ভিত তৈরি করেছে। একজন হতদরিদ্র বিপ্লবীকে কনস্টান্টাইন বানিয়ে দিয়েছেন রোমান আগ্রাসনের প্রতীক। যিশুর জীবনের অনুন্নয়ন হারিয়ে গেছে তাঁর হত্যাকারীদের অভিসন্ধিমূলক সমর্পণ আর অগাধ ঐশ্বর্যের আড়ালে।

আর পুরীর মন্দিরে পড়ে থাকল চৈতন্যের হাড়। তাঁর জীবনীর শেষ পৃষ্ঠাগুলো হারিয়ে গেল।

স্মৃতি নিয়ে আমোদিত থাকুন, পাঠক। মনশ্চক্ষে দেখুন, খড়হাঁসগুলো উড়ছে, ১-এর পর ১। হঠাৎ একটা দ্রাম শুনলেন কী? নিস্পন্দ নিরপরাধ ১ খড়হাঁসের মৃতদেহ? যেন সে ৩, ৬, ৩০, ২০০, ১০০০, ১০০০০ খড়হাঁসের প্রতিনিধিত্ব করছে?

অক্ষয় অব্যয় কোনো অনুন্নয়ন নেই।

রামায়ণ নেই ১টা সেতুবন্ধন ছাড়া।

যিশু নেই। বীভৎস ক্রুশিফিকশন ছাড়া।

ইতিহাস নেই। বিজয়ীদের হস্তক্ষেপ ছাড়া, জয়গান ছাড়া। হেরে যাওয়ার ইতিহাস, বিজয়ীদের পক্ষে সর্বদাই বিপজ্জনক। সে পড়ে থাকে মরুভূমিতে, গুহায়। মৃত সাগরের পাণ্ডুলিপি হয়ে। ১ম শতাব্দীর নস্টিক খ্রিস্টানদের লেখালেখি যথা।

সকালে যে ছেলে খবরের কাগজ দিয়ে যায়, সে আপনার বাড়ির মধ্যে ঢুকল, অফুরন্ত কথা বলে চলেছে, কথা বলতে বলতে কাগজটা দিল, কথা বলতে বলতেই বেরিয়ে গেল। আপনার সঙ্গে নয়। আপনাদের সঙ্গে নয়। কানে ব্লু-টুথ। অন্যপ্রান্তে আপনারই শহরের কেউ। অথবা, অন্যপ্রান্তে বেলুচিস্তানের কেউ। এই যে ম্যাজিক, এ জিনিস সকালকে টেনে লম্বা করে দেয়, আলো থেকে শুরু করে অন্ধকার অবধি

আস্ত ১টা দিবস বানিয়ে দেয়। আর মধ্যিখানের ধূসর এলাকাগুলো? ভাবলেই মাথার ওপরে এসে পড়ে তিব্বতের হাঁস। ওরা উড়ে যাচ্ছে, ডানায় ইঞ্জিনের আওয়াজ হচ্ছে। ওদের হৃৎপিণ্ডে পাকস্থলীতে ধাক্কা দিচ্ছে হাওয়া। ডানা উঠছে নামছে।

ইঞ্জিন। ইঞ্জিন।

বউয়ের হাত ছুঁয়ে রাখছে তরুণ। রাস্তা পার হচ্ছে।

খাঁচায় ভরা রাস্তা। রাস্তা উঠছে। নামছে।

তিব্বতের হাঁস

'দূরত্বকে অত গুরুত্ব দিচ্ছ কেন? দূর তো আপেক্ষিক! চৈ চৈ করে ডাকলেই হাঁস চলে আসবে ঘাটের কাছে।'

'দূরত্ব ছাড়া কথা হয় না। তুমি কি তোমার বাগানের হাঁসকে চৈ চৈ বলবে? ৩ ইঞ্চি হোক, বা ১০০০ কিমি, কথা বলতে হলে দূরত্ব লাগেই।'

'আর মানুষ যখন নিজের সঙ্গে কথা বলে?'

'তখনই বলে যখন নিজের সঙ্গে সে দূরত্ব টের পায়। তখন কবিতা লেখে। ঘুমের ঘোরে ঠোঁট নড়ে।'

'তোমার এসব আত্মারামমার্কা ফিলজফি আজকাল খুব সস্তা জানো তো?'

'জানি। কিন্তু আজকাল তো আনলিমিটেড নেট কানেকশন থাকলে সব কিছুই সস্তা। সে জাঁ লুক গদারের সিনেমা হোক, কাঁদিনেস্কির পেইন্টিং, বা ১৯ শতকের দুষ্প্রাপ্য বাংলা পত্রিকা। শুধু আলকাতরা মাখানো দেওয়ালে এসে পড়া উজ্জ্বল সাদা রোদ, সে এখনও অধরা রয়ে গেল।'

'কথা বলবে তার সঙ্গে?'

'তার আগে নিজের সঙ্গে ১টা বোঝাপড়া দরকার। ফাঁক পাচ্ছি না। ডানা পাচ্ছি না।'

সেই মহাবিস্ফোরণের পর থেকেই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে এনট্রপি বেড়ে চলেছে। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ছুটছে, প্রসারিত হচ্ছে, দূরত্ব বাড়ছে ক্রমেই বিবিধ জ্যোতিষ্কের মধ্যিখানে। দূরত্ব জীবনের ধর্ম, বেঁচে থাকার শর্ত। তার সঙ্গে বোঝাপড়া করেই বাঁচতে হবে। নৈকট্য নেই। নৈকট্যের ধারণাটা অসুস্থতার জন্ম দেয়। অগ্রগতি নেই। আছে শুধু বিস্তার। এই যে লেখাটা আপনার দিকে যাচ্ছে, এখানে কোনো তৃতীয় সমালোচক এসে

পড়লে আমার আর আপনার মধ্যে বাঁক ধরবে, সময় আর স্থানের পাঁউরুটিতে আমি-আপনি হয়ে পড়ব অতীতচারী, হতে পারে আমার বয়স তার ফলে কমে যাবে আপনার চেয়ে, অথবা আপনি হয়ে যাবেন সাহিত্যের সুকুমার শিশু।

আমার আর আপনার মধ্যেকার পাঁউরুটিতে সমালোচক একজন ছুরি ছাড়া তো কিছু নন।

লেখাটা আপনার দিকে যাক। অনুমতি করুন। আপনার সঙ্গে এর সময় বাড়ুক, আয় বাড়ুক, আয়ু বাড়ুক। ১টা বিন্দুতে আপনি এই লেখাকে সঙ্গে নিয়ে হেঁটে যাবেন সমালোচকের দিকে। গনগনে গরম ভীম সমালোচক তিনি হয়তো নন। হয়তো কনকনে ঠান্ডা হিম সমালোচক। হয়তো চমরিগাইয়ের দিকে তাকিয়ে বসে আছেন। চমরিগাইয়ের লেজ থেকেই চামর হয়। আপনি জানেন। আমি এটা লেখার পরে লেখাটা জানল।

যা এই লেখাটা পারছে না, আপনি পারবেন।

আপনি জানেন, মানস সরোবরের ১দিকে কৈলাস, আর ১দিকে মান্ধাতা। আমি এই লেখার পরে লেখাটা জানল।

শয্যাতুলুনির হাসি

এই যে 'এই' শব্দটা লিখলাম, ঠিক তখনই কয়েক হাজার আলোকবর্ষ দূরে ১টা সুপারনোভা তৈরি হল, ২টো ব্ল্যাকহোল মিশে গেল ১-এ অন্যের মধ্যে। 'এই'-এর মধ্যে কি তার কোনো প্রভাব পড়ল? বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যে অজস্র অগণিত অপরিমেয় তন্তু, তাদের কেউ কি আপন করবে এই 'এই'-কে? পাশের বাড়ির কুকুরটা হঠাৎ যদি ডেকে ওঠে, সেটা 'এই'-এর কাছে সুপারনোভা বা ব্ল্যাকহোলের চেয়ে ঢের বড়ো ঘটনা। 'সেই' তাকে লক্ষ করবে না। ঠিক 'সেই— ক্ষণেই পৃথিবীতে আরও অজস্র কুকুর ডাকছে, ডেকে উঠছে। পৃথিবীতে কোনো ক্ষণে কোনো ১টাই ঘটনা কি ঘটে? ঘটনার কি থাকে বিশেষ ছাপ? আঙুলের ছাপ? ঘটনার ফরেনসিক রিপোর্টে তার ব্লাড গ্রুপ পাওয়া যেতে পারে, যে রক্ত সাধারণ, যে রক্তের মধ্যে বিনিময়ের সুযোগ থাকে, শুধু থাকে কিছু বিভাগীয় ছুৎমার্গ।

প্রেমের ঘটনার রক্তে খুনের ঘটনার রক্ত মেশানো চলবে না। তবু, তরুণীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাকে নিয়ে তরুণ ঝাঁপ দেয় খরস্রোতা নদীর বুকে। আর ফেরে না। তাদের

আঙুল, তাদের রক্ত, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কোনো তন্তু কি আত্মসাৎ করে? হয়তো কোনো সমান্তরাল পৃথিবীতে তারা ঠিক ওই ঝাঁপ দেওয়ার ক্ষণটিতেই করছে তাদের প্রথম মৈথুন, তরুণীর মুখ থেকে এখানে যখন ত্রস্ত 'আঃ' বেরিয়ে আসছে, সেই অপর পৃথিবীতেও তার মুখ থেকে বেরিয়ে আসছে আকুল 'আহ!' কিন্তু সেই ধ্বনিতে ফুল ফোটার আবেশ লেগে আছে। এখানে যখন ওদের শুইয়ে রাখা হয়েছে মর্গে, পচাগলা, সমান্তরাল অপর পৃথিবীতে তখন ওদের ফুলশয্যা শেষ হয়েছে।

শয্যাতুলুনির মুখে আশ্চর্য বিহ্বল হাসি ফুটে উঠেছে।

'বিড়ালটা গতরাতে তোমার বিছানায় ঘুমোতে এসেছিল। তুমি ওকে বের করে দিয়েছিলে কেন?'

'ও ঘুমোতে দিত না। বুকে হাঁটত। মুখে সুড়সুড়ি দিত। আমাকে ঘুমোতে দিত না।'

'তাই তুমি ওকে ঘুমোতে দিলে না?'

'সতর্ক হওয়া কি খারাপ? যদি বেগতিকে আঁচড়েই দিত?'

'বিড়াল পুষেছ কেন, তাকে যদি এতই অবিশ্বাস?'

'একসঙ্গে ঘুমোব বলে তো পুষিনি!'

'তবে কেন?'

'বাড়িতে ইঁদুর বেড়ে গেছল।'

মানুষের মানুষকে ভুল বোঝা। এ কোনো অসুখ নয়। এই হল জীবনের নিয়ম। ১ মানুষের নির্মমতা, নিষ্ঠুরতা, করুণা, ঈর্ষা, মহানুভবতা, দয়া আর ১ মানুষ বোঝে না। এই যে না বোঝা, এটাই ১ মানুষের সঙ্গে আর ১ মানুষের সম্পর্কের কারণ। যদি মানুষ মানুষকে বুঝত, পৃথিবীতে ১টাই মানবমন থাকত। সেটা হওয়ার নয়।

এই যে লেখাটা আপনি পড়ছেন, আপনি আপনার নিজস্ব প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে আছেন। লেখাটা আপনার সামনে দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। ১টা ট্রেন যেমন যায়। আপনি এতে চড়বেন কিনা, এই লেখা আপনার সামনে থামবে কিংবা থ্রু হয়ে বেরিয়ে যাবে কিনা, সেটা আপনার জীবনের নিয়মের ওপরে নির্ভর করে। হয়তো আপনি একে বেরিয়ে যেতে দেখবেন। কেউ কেউ দেখতেই পাবে না। এই লেখা যদি আলোর গতিতে আপনার সামনে দিয়ে বেরিয়ে যায়, আপনি দেখতে পাবেন না। কিন্তু এই

লেখার আড়ালে ও সমান্তরালে আর ১টা লেখা যদি বেরিয়ে যায়? আপনি সেটাকে এমনিতেই দেখতে পেতেন না। সেই লেখার ১জন আরোহী, সেই লেখার যিনি রসিক পাঠক, তিনি এই লেখাটাকে দেখবেন তাঁর সঙ্গে স্থির হয়ে আছে। এই লেখার গমন তাঁর সাপেক্ষে নেই। তাঁর সমস্যা হবে না এই লেখায়।

অন্য লেখকের কোনো ১টা লেখার জানালার পাঠক আমার এই লেখার ১টা জানালার সঙ্গে সমান্তরালে যাচ্ছেন, এটা ভাবলে পৃথিবীতে ২জন মানুষের সৌভ্রাতৃত্ব বোঝা যায়। ১ জন লেখকের নিজেকে আর অত একা লাগে না। কিন্তু সেটা এই পৃথিবীতে নয়। অন্য কোনো পৃথিবীতে। সেখানে কোনো ২০১৭ নেই। সেখানে কোনো পশ্চিমবঙ্গ নেই।

সেখানে 'আমি' কি আছে?

অন্য কোনো পৃথিবীতে এই আখ্যান 'আমি' কি লিখছে?

'আমি' কী লিখছে?

বিছানায় লাল হয়ে আছে ১ম রক্ত। ১টা ডেলা শক্ত হয়ে আছে। কিংবা, কোনো ১ম রক্ত নেই। নববধূ তার মায়ের কথামতো রং ঢেলে দিয়েছে। আলতা ছড়িয়ে দিয়েছে।

মিথ্যারক্তের দিকে তাকিয়েই শয্যাতুলুনির মুখে আশ্চর্য বিহ্বল হাসি ফুটে উঠছে।

সত্যিরস। মিথ্যারস

লেবুগাছ ঘিরে বড়ো হচ্ছে ছেলেমেয়েরা। সম্মানের ব্যালকনিতে গিয়ে দাঁড়াচ্ছে নারী-পুরুষ। তাদের আগেও অনেকে দাঁড়িয়েছে। পরেও দাঁড়াবে। বালিহাঁসদের মেঘ উড়ে যাচ্ছে আকাশে। ছাদে এবং কার্নিশে পড়ছে এয়ারগানের ছায়া। সাদা রঙের উপত্যকা। লাল রঙের উপত্যকা। রেলক্রসিং ছুটে আসছে। সিগন্যাল দৌড়ে আসছে। পরিত্যক্ত রেলওয়ে স্টেশনগুলোকে সাজিয়ে রাখা হচ্ছে। দিন আর রাতের ফাঁকে বিছানা বদলে নিচ্ছে নদী। অরণ্যে গা ঘসছে অরণ্য।

'এসব কি সত্যিই ঘটছে?'

আরও কঠিন হতে হবে। হাজার হাজার মিটার উঠে যাওয়ার মতো শক্তিশালী করতে হবে ইঞ্জিনকে। প্রতি লোমকূপে বসাতে হবে পেট্রলপাম্প। কেউ যেন কাউকে স্থানচ্যুত না করতে পারে। নিষ্করুণ ১ শক্তি মানুষের বেঁচে থাকার অন্ধকার

এবং সর্বশক্তিমান যুক্তিটাকে নিঃশর্তে খেয়ে ফেলতে চাইছে। ১০ বছরের পুরোনো গাড়ি, ৩০ বছরের পুরোনো বাড়ি, আর ৬০ বছরের পুরোনো মানুষরা পাশাপাশি পাশাপাশি পাশাপাশি।

'লেবুগাছের মতো অপরূপ এই পৃথিবীতে শুধু... ১টাই আসল লেবুগাছ হয়।'

'বেশি কচলিয়ো না। তেতো হয়ে যাবে।'

'কেন?'

'পাতিলেবুর সেটাই নিয়ম। পুরো রস পেতে চেয়ো না।'

'আর কমলালেবু?'

'জানি না। ট্রাই করিনি। তবে, লেবু আর আখের মধ্যে তফাত তো আছেই!'

'সেটা কি সত্যিই তফাত?'

'মানে?'

'ওই গিরগিটিটাকে দ্যাখো, পাতার আলোয় কেমন সবুজ হয়ে আসছে! একটু আগে ওকে গাছের ডালের অংশ মনে হচ্ছিল। ওর চোখ ওই পোকাটার দিকে। পোকাটা রং বদলাতে পারে না।'

'কী করে পারবে?'

'হ্যাঁ। পারবে না।'

'না। পারবে না।'

যে-কোনো লেখাই পলিটিকাল। ১ই ভাষায় কথা বলা মানুষদের সাধারণ বিষণ্ণতার যে বোধ, সেটাকে বুকের মধ্যে না নিয়ে সেই ভাষায় পলিটিকস করা উচিত নয়। পলিটিকস শুরু হতে পারে কোনোকিছু হারিয়ে ফেলার বেদনা থেকে, জনসাধারণকে কোনোকিছু থেকে ছিঁড়ে নেওয়া হচ্ছে, এই অভিযোগ আর ত্রাস থেকে পলিটিকস নামক কাজটা শুরু করা যায়, লেখাও একমাত্র ওভাবেই শুরু করা যায়। পলিটিকসের পরিষ্কার জল ওপর থেকে নীচের দিকে আসে। সমতলে নামতেই নোংরা হয়ে যায়। এই যে ওপর থেকে নেমে আসার বোধ ও ব্যাপার, বৃষ্টির মতো, তুষারের মতো, সেটা আক্রমণ নয়। অপমানও সেটা নয়। অপমানটা শুরু হয়, যখন কেউ কেউকে জানিয়ে জলটা দেয়— 'দেখ, হে হে,আমিই তোকে জল দিচ্ছি। অন্য

কেউ তোকে জল দিত না।' সেটা তখন সমতলের ব্যাপার। নোংরামি শুরু হয়ে গেছে। চানের জল আর খাওয়ার জল আলাদা হয়ে গেছে।

যে-কোনো অপমানের ১টা পলিটিকাল দিক থাকে। কাজেই অপমানের মজাটা বুঝতে হবে। সেখানে যাকে অপমান করা হয়, সে নিজেকে অপমানকারীর চোখ দিয়ে দেখতে শুরু করে। পলিটিকাল কল্পনাশক্তির এ ১টা দুর্দান্ত মজা। যা বলা হয়েছে সেই অভিজ্ঞতা, যা বলা হয়নি সেটার স্মৃতির চেয়ে কম পড়ে যায়। অপমানিত লোকটা নিজের সম্পর্কে যে শব্দ বা বাক্যগুলোকে আজীবন ভয় পেত, সেগুলোই তার ওপরে ছালচামড়া তুলে নিতে আছড়ে পড়েছে। আর তার ভয় নেই। সে নিজেকে সোল্লাসে আরও অপমানিত করতে শুরু করে। সে সিদ্ধান্ত নিতে থাকে তার এবার ক্রোধ হওয়া উচিত, কারণ ওই শব্দ আর বাক্যগুলো তার নিজের সম্পর্কে নিজস্ব, অন্য কেউ সেগুলোয় হাত দিতে পারে না।

ক্রোধের অভিনয় করতে গিয়ে ১টা লোক সত্যিই ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠে। সামাজিক হয়ে ওঠে। সে ভাবে তার এবার ধ্বংসাত্মক হয়ে ওঠা উচিত। আর কিছু না হোক, অপমানকারীর ১টা চুলও যদি সে বাঁকাতে না পারে, নিজের ১টা অংশকে সে ধ্বংস করে ফেলতে চায়, যেটা তার অপমানের কারণ। আবার সেই অংশটার প্রতি তার পিরিতও যায় বেড়ে, কিংবা, পিরিতকে সে তখনই আবিষ্কার করে। ভেবে দেখলে, যে তাকে অপমান করেছে, সে অপমানটা আদৌ করতেই পারেনি, অপমান কাউকে কেউ করতে পারে না, সে কিছু ধ্বনি উচ্চারণ করেছে, অথবা বর্ণমালা লিখেছে, এবং অপমানিত লোকটা নিজেই নিজেকে এবার করছে যা করার। সে ধীরে ধীরে অপমানকারীর কাছে কৃতজ্ঞও হয়ে ওঠে। সেই কৃতজ্ঞতা ১টা বিরাট ব্যাপার। তার বশেই দুজনের ২টো বিশেষ ব্যক্তিত্ব ১টা বিশেষ পৃথিবীতে অভিন্ন হয়ে যেতে চায়।

ভোটে দাঁড়ানো ২ যুযুধান প্রতিপক্ষের মতো।

জনসাধারণ যাকে ভোট দেয়, সে আর জনসাধারণ থাকে না। সে দেবতা হয়ে গেছে। এবার তার কাছে বুক চিরে মানত হবে। ধর্না দেওয়া হবে। দণ্ডী কাটা হবে। মনস্কামনা পূর্ণ না হলে নামিয়ে দেওয়া হবে। কিন্তু ভোটে হেরে যাওয়া অবহেলিত লোকটা খুব বেশি করে জনসাধারণ হয়ে ওঠে। সে কিছুটা ওপরে উঠে যায়, যেন তার জল দেওয়ার অধিকার প্রতিষ্ঠিত হল ভোটের প্রত্যাখ্যানে। বাইবেলে যেমন

লুসিফার ঈশ্বর থেকে বিচ্ছিন্ন স্যাটান হয়ে ঈশ্বরের অস্তিত্বের অন্যতম এমনকি ১মাত্র কারণ হয়ে উঠল। ১জন মঙ্গলময় ঈশ্বর থাকলে ১জন বিরোধি ঈশ্বরকে থাকতেই হয়। প্রায়ই বোঝা যায় না মঙ্গলের ব্যাপারটা কে করছে, সংসদ অথবা বিধানসভার জাঁদরেল সদস্য নাকি ভোটে হেরে যাওয়া সংসদহীন বিধানসভাহীন ফ্যা ফ্যা লোকটা।

রাস্তায় প্রায়ই দেখবেন, পুলিশ বাইকআরোহীকে আটকেছে, কারও মুখে রাগ নেই, হাসিঠাট্টা চলছে। সব সময় সেটা দর কষাকষি নয়, প্রিয় পাঠক।

হোমস। মরিয়ার্টি

'আমি আপনাকে ১টার জন্য কথা দিতে পারি, অন্যটার জন্য নয়।' এই বলে গর্জে উঠে সে আমার দিকে পিছন ফিরে চোখ মিটমিট করতে করতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। শার্লক হোমসের এই অংশটা, যেখানে প্রফেসর মরিয়ার্টি বেকার স্ট্রিটে এসে হোমসকে হুমকি দেবেন, নাতাশার খুব প্রিয়। প্রিয়া অবিশ্যি হোমসের খুব ভক্ত নয়। সে প্রেমের উপন্যাস পছন্দ করে। তারচেয়ে বেশি পছন্দ করে ঘুমোতে। নাতাশা যখনই হোমসের কথা তোলে, বা ইউটিউব থেকে জেরেমি ব্রেট অভিনীত বিখ্যাত হোমস-সিরিজটা প্রিয়াকে দেখাতে চায়, প্রিয়া আগ্রহ হারিয়ে ফ্যালে। নাতাশার এতে অপমানিত লাগে। কিন্তু প্রিয়া গোয়েন্দা ব্যাপারটাকেই সন্দেহ করে। সে মনে করে না ১টা লোকের অমন সর্বজ্ঞ ভাব থাকতে পারে। তা ছাড়া ধরা যাক ১টা বই চুরি হল, আর গোয়েন্দা এসে সেই চোর ধরে দিলেন। কিন্তু ওই বইয়ের যে লেখক, তিনি কত অসংখ্য চুরি করেছেন ওই বইটার মালমশলা জোগাড় করতে, সেটার জন্য বইয়ের শেষে কৃতজ্ঞতার লিস্টি অবধি দেননি হয়তো। ওই লিস্টি থাকলে দেখা যেত লেখকমশাইকে বামালসমেত ধরতে ১০০০ জন গোয়েন্দাও কাফি নয়। তার কী হবে? শুধু অপরাধী নয়, মক্কেলের সঙ্গেও তো ১টা পাঞ্জা লড়ার ব্যাপার থেকেই যায় ডিটেকটিভের!

১ কপি বই যদি চুরি যায়, পৃথিবীতে কি আদৌ ১টা বই কমে যায়?

মানুষ নিজের ১টা শুদ্ধ অংশের খোঁজে প্রতিযোগিতা চায়, শত্রুতা চায়। শত্রুতার মধ্যে কোনো হীনতা থাকে না। নিঃস্বার্থ শত্রুতা সর্বদাই মহৎ ১টা ঘটনা। কখনও সে নিত্যবৃত্ত, কখনও ঘটমান, কখনও মনখারাপজনকভাবে পুরাঘটিত। চরম শত্রু

প্রফেসর মরিয়ার্টির সঙ্গে হাতাহাতি হল রাইকেনবাক জলপ্রপাতের ওপরে। হোমস সফল হলেন মরিয়ার্টিকে প্রপাতের মধ্যে ফেলে দিয়ে নিকেশ করতে। কিন্তু শত্রুর মৃত্যুর পরে শার্লক হোমস সারাজীবন শোকপালন করেছিলেন। লন্ডনের পাতি ছিঁচকে অপরাধীদের মধ্যে ওই তীক্ষ্নতম মেধাবী লোকটি ছিলেন অপরাধের নেপোলিয়ন— শার্লক হোমসের যোগ্যতম প্রতিযোগী। মরিয়ার্টির মৃত্যুর পর হোমসের জীবনে আর কোনো থ্রিল অবশিষ্ট রইল না। তাঁর জীবনে এল এক অচিকিৎসনীয় বোরডম— স্থায়ী একঘেয়েমি। আসবাবে লম্বা শীর্ণ আঙুলগুলো ঠুকতে ঠুকতে জানালার বাইরের ঘন কুয়াশাকে অভিশাপ দিয়ে বেঁচে থাকলেন হোমস। শেষে কাজ ছেড়ে দিয়ে গ্রামাঞ্চলে চলে গেলেন মৌমাছি পালন করতে। গোয়েন্দার কাজও কেরানিগিরি বা মাস্টারির মতো অ-রোমাঞ্চকর হতে পারে।

'আমার ১টা রাইভ্যাল চাই। নাহলে জীবনে কিছু করে ওঠা যাবে না।'

'রাফায়েল, সরি, রাইফেল নিয়ে কী করবি? সে অনেক হ্যাপা। লাইসেন্স করাতে হবে। সে লাইসেন্স বারবার রিনিউ করাতে হবে। ভোটের সময় থানায় জমা দিতে যেতে হবে। অত বড়ো ১টা জিনিস বাড়িতে রাখার ঝক্কিও কম নয়...'

'ধুর বাল! এই মেয়েটা হাঁদাই রয়ে গেল। আবে রাইফেল নয়। রাইভ্যাল। লেখাপড়া তো করলি না, কবিতা লিখতে চলে এলি। রাইভ্যাল মানে হচ্ছে প্রতিদ্বন্দ্বী। যার সঙ্গে টক্কর নেওয়া যায়। নিতে মজা লাগে। যে গাঁড়টা মেরে গেলেও পালটা মারার জেদ নেওয়া যায়।'

'তুই কি কারও সঙ্গে কবির লড়াই করতে চাইছিস নাকি! অ্যান্টনি ফিরিঙ্গির যেমন ভোলা ময়রা লাগত? নিজের লেখাটা লিখবি, তার আবার প্রতিযোগী কেন লাগবে?'

'লাগে রে। ১টা জলপ্রপাতের খুঁটিনাটির চেয়ে তার প্রকাণ্ডতাটাই তো কাজে লাগে, তার যে আছড়ে পড়া, আছড়ে চুরমার হয়ে যাওয়া, অজস্র জলকণা হাওয়ায় ছড়িয়ে পড়া, গোটা এলাকাজুড়ে ১টা জল-জল-জল-জল ভাব, সেটাই লাগে। একা-একা কবি হওয়া যায় না। ১টা দেওয়াল লাগে সামনে। আছড়ে পড়ার জন্য। চুরমার হওয়ার জন্য। রবীন্দ্রনাথ আর জীবনানন্দকে দিয়ে কজন কাজ চালাবে? আমার সকল গান তোমায়...'

'চুদতে চায়। দেখ, পৃথিবীতে দুঃখকষ্ট এমনিতেই কম নয়। সারা পৃথিবীতে এখন সহজ-সরল কবিতাই লেখা হচ্ছে তাই। তুই আর হেঁয়ালি বাড়াস না নাতাশা।'

'তুই যে কথাটা বললি, সেটাও কম হেঁয়ালি নয়। হেঁয়ালির বিরুদ্ধে কথা বললে হেঁয়ালিই এসে পড়ে।'

'মানে? এটাও তো হেঁয়ালি!'

'বুলফাইট দেখেছিস? দেখিসনি। আমিও দেখিনি। তবে পড়েছি। ওখানে যেটা হয়, রক্ত ঝরে, কিন্তু কোনো হিংসা থাকে না। প্রকৃত বুলফাইটে ষাঁড়টা মরে না, মরে বুলফাইটারের অন্তর্গত ষাঁড়ত্ব, অথবা পশুত্ব। প্রতিযোগিতা হলে অমনই হওয়া উচিত। আমি আর আমার প্রতিযোগী ১ হয়ে যাব। অস্ত্র নামবে। আমি মরি, বা সে মরুক, শেষ অবধি সভ্যতা জিতে যাবে। পশুত্ব হারবে। বন হেরে যাবে।'

'অর্জুন আর কর্ণের মধ্যে যেটা হয়েছিল? তা ছাড়া হেক্টর আর একিলিসের...'

'অর্জুন কর্ণকে খুন করল। অর্জুন বনের শিশু থেকে বন্য যোদ্ধা হয়ে উঠেছিল। ফাকিং কিলিং মেশিন। কিন্তু কর্ণ ছিল দ্বাপরের সুসভ্য যোদ্ধা। ওই খুনের পরে সভ্যতা হারল। কিছুদিন পরেই কলিযুগ নেমে এল। একিলিস কিন্তু নিজের যোগ্যতায় হেক্টরকে মেরেছিল।'

'সব প্রতিযোগিতায় তাহলে ১ হওয়ার ব্যাপারটা নেই বল?'

'না। সব যুদ্ধ প্রতিযোগিতা নয়। কিছু যুদ্ধ বাইরেই থেকে যায়। ভিতরে তার বিষ এসে ঢোকে। নেশাগ্রস্ত করে। তখন যেটা শুরু হয়, সেটা দাঁত আর নখের ব্যাপার।'

'তখন কে মরে? ষাঁড়ের অন্তর্গত বুলফাইটার? এই প্রিয়া, ষাঁড়ের বিচির কথা মনে পড়ে যাচ্ছে মাইরি! হিট উঠে যাচ্ছে। পুরো চিত্রাঙ্গদা হয়ে যাচ্ছি। আজ তোকে ঘুমোতে দেব না কিন্তু...'

ইয়ার্কিটা ছুড়ে দিয়ে নাতাশা আবার মুরগির ঠ্যাঙটা চুষতে শুরু করল। ভেতরের সবটুকু মজ্জা টেনে না নিয়ে ওর শান্তি নেই। চুষছে। চুষছে। চুষছে। মুরগিটার আত্মা না এসে পড়ে ডিনার টেবিলের ওপরে। প্রিয়া উঠে বেসিনে গেল। মুখ ধুয়ে উঁকি মেরে দেখল নাতাশা তখনও চোখ বুজিয়ে ১ মনে হাড়টা চুষেই চলেছে। প্রিয়া বাথরুমের দরজাটা বন্ধ করল। নাতাশা চোষা থামিয়ে খুব তিক্ত চোখে তাকাল বন্ধ দরজাটার দিকে। সেটায় সিলভিয়া প্ল্যাথের বড়ো ১টা পোস্টার সাঁটা আছে।

উলটো দিক থেকে সরু জলের ধারালো আওয়াজ। আপন মনে হেসে উঠে হাড়টা প্লেটের ওপরে ঠকাস করে ফেলে দিল নাতাশা।

ম্যাকবেথ সিং বি.এ.

''এই যে তুমি এই পত্রিকায় 'সঙ্গমপুর' লিখছ, কিছু লোক এই পত্রিকার অন্য কোনো লেখকের বা উপন্যাসের নাম করবে, কিন্তু তোমার লেখাটা সম্পর্কে ইনটেনশনালি চুপ করে যাবে। বললেও টেনেটুনে নেগেটিভ কথা বলবে। বাঙালির এই যে মধ্যবিত্ত পলিটিকস, এর সঙ্গে একজন কী করে লড়বে? কিংবা, কেন লড়বে? নিজের দালালি করা, লেখকের সেটা কাজ কি? অন্য লোকের মরালিটি, নৈতিকতা, আজকের দিনে এগুলোরও কোনো দাম নেই। তার চেয়ে নিজের মাথার মধ্যেকার দ্বিচারিতা নিয়ে ভাবা দরকার। ১টা লোকের লেখা নিয়ে কথা বলার সময় আমরা কোনটা নিয়ে ভাবব— তার লেখাজীবন, নাকি ব্যক্তিজীবন? লোকটাকে নিয়ে আমার অস্বস্তি আছে বলে তার লেখা নিয়েও খারাপ কথা বলব? কিন্তু এটাই হচ্ছে। চিন্তাভাবনা নিয়ে কথা বলার লোক কম, আর ফক্করবাজি নিয়ে কথা বলার লোক বিস্তর। কেউ যদি চুরি রাহাজানি করে, তার কবিতার দিকে তাকানো নাকি ভালো। আচরণের দিকে নয়। কিন্তু কেন? একবারও ভেবে দেখব না ১টা লোককে যদি আমি পুকুরে ডুবে যেতে দিই, আমিও খুনি? যখন শেয়ালদায় ১টা বাস ফুটপাতে উঠে যায়, লোকগুলোকে রক্তাক্ত অবস্থায় নামিয়ে আনতে দেখি, আমি কি ছুটে যাব না? সাহায্য করব না? আমি কবি বলে কি মাথা কিনে নিয়েছি? কঠিন কঠিন দিনগুলোর মুগ্ধতাই কি সব?'

'খুনিও তো কবি বা শিল্পী হতেই পারে। দেবতা যদি পাপী হতে পারে, অভিশপ্ত হতে পারে, অন্যের বউকে চুদতে গিয়ে সারা গায়ে চোখ গজাতে পারে, তারপরেও দেবরাজ হয়ে থেকে যেতে পারে, কবি কেন নয়?'

'পুরোপুরি পিউরিটান কবির না হলেও চলে বলছ? তার মানে, তুমি বিশ্বাস করো কবিতায় তার সততা থাকা উচিত। লোভ নয়। কৃচ্ছ্রতা থাকা উচিত।'

'হ্যাঁ। সৎ মানুষ আর পুণ্যবান মানুষ ১ নয়। খুনির কবিতায় তার রক্তমাখা হাতটা থাকলেই চলে। ম্যাকবেথ হাত।'

'লম্বা লম্বা নখ থাকতে হবে না?'

'লম্বা লম্বা আঙুল থাকলে নখও লম্বা হতেই পারে। মানানসই হবে। লম্বা নখে লেগে থাকা রক্তটা লম্বা হয়ে মানিয়ে যাবে। সেইসঙ্গে ১টা ঝোড়ো কবরখানা। গাছের বাঁকা ডালগুলো অশুভরকমভাবে ঝুলে আছে মাটির দিকে। ১টা অব্যক্ত আর্ত চিৎকার আছে, শোনা যাচ্ছে না, শোনা যাবে না। ১দিন ওই কবরখানার উপরে ১টা ফাইভস্টার হোটেল তৈরি হবে হয়তো। আর, কেউ বাথরুমে দাঁত মাজতে গিয়ে আয়নায় পিছনে কোনো অদ্ভুত ছায়া দেখে অজ্ঞান হয়ে যাবে। রক্তের ঢেউ ছুটে আসবে লাল কার্পেটে ঢাকা করিডরে কারও সামনে। কিংবা, বাথটবের জলটা গাঢ় লাল হয়ে যাবে। হনিমুনে আসা তরুণী চিৎকার করে ডাকবে হনিমুনে আসা তরুণকে। হোটেলটার বদনাম হোটেলটাকে ছাপিয়ে যাবে।'

'অ্যাই এটা রামসে ব্রাদার্সের অ্যাডাল্ট সিনেমা হয়ে যাচ্ছে। আমি ইয়ার্কি করিনি। কালচারাল পলিটিকস নিয়ে ভাবছিলাম।'

'আমি ইয়ার্কি করলাম।'

'বেশ। ইয়ার্কিই হোক। কিন্তু তুমি শুধু হোটেল ভাবছ কেন? ওই কবরখানার ওপরে ১টা হাসপাতালও তো হতে পারে? হনিমুনের তরুণী কেন? হাঃ! স্কার্ট পরা নার্সরাও কি কিছু কম সেক্সি? ওরা যখন পাছায় ইঞ্জেকশন দেয়...'

'হাসপাতালে বোমা মারতে ভালো লাগে না।'

'আচ্ছা বেশ। বোমাটা পড়ার আগে আমি টাইমকে থামিয়ে পেছনের দিকে ঘুরিয়ে দেব। এটা আমার লেখা। আমি পারি সেটা। এখানে শুধু আমার গ্র্যাভিটি চলবে। ইচ্ছে করলে আমি মার্কিন প্রেসিডেন্টকে নিজের লেখার চরিত্র বানিয়ে তার প্যান্টের উপরে জাঙিয়া চাপিয়ে দেব। সে সুপারম্যান হয়ে যাবে। ইচ্ছে করলে মেরিলিন মনরোকে আবার বাঁচিয়ে তুলব। সে লাল লিপস্টিক লাগিয়ে পিউবিক হেয়ার কামিয়ে পর্ন ইন্ডাস্ট্রিতে ঢুকবে সেটাকে ধ্বংস করে বেরিয়ে আসবে। আমার তৈরি বা না-তৈরি করা যে-কোনো কিছুকে মারার এবং বাঁচানোর হক আমার আছে। অ্যান্ড আয়্যাম নট জোকিং দিস টাইম। সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং সাইটে আমার ১টা ফেক প্রোফাইল আছে। সেটাকে আমি মেয়ে হিসেবে চালাই। কেউ অবিশ্বাস করেনি। চাইলেই ১টা জীবন আমি তৈরি করে নিতে পারি। নিজের লেখা দিয়ে। নিজের লেখা।'

'ইরানি মুখার্জি তো? আমি জানি। তুমি আমার সঙ্গেও মাঝরাতে সেক্স চ্যাট করতে এসেছিলে। বুঝতে পেরেছিলাম।'

'কী করে?'

'তুমি নিজেকে কী ভাবো বলো তো?'

'গ্রহ ভাবি না বন্ধু। রাজাও নই। আমি লেখামানব। আমি ১টা ব্ল্যাক হোল। আমার থেকে কোনো ধ্যান কোনো ধারণা ফেরত যায় না। আমি ফেরত দিই না। চোখের পাওয়ারের সঙ্গে সঙ্গে আমার চোখ ড্যাবড্যাবে হয়ে বেড়ে যায়। পারিজাতের বিরাট পাপড়িতে আমি হামাগুড়ি দিই—'

'আমার কিন্তু তোমাকে কৃত্রিম উপগ্রহ মনে হয়। এধরনের কথা ১টা বাচ্চাই বলতে পারে। তুমি বেবি স্যাটিলাইট। নিজের লেখার চারপাশে ঘুরে মরছ। ল্যান্ড করতে গেলে নিজেরই আবহাওয়ায় পুড়ে ছাই হয়ে যাবে।'

ইঁদুর। প্রিয়। বিড়াল

আপনার বিড়াল যখন আপনার চোখের সামনে, অর্থাৎ, আপনার পোষা প্রিয় বিড়াল যখন আপনারই চোখের সামনে বাড়ির বাগান থেকে জ্যান্ত ইঁদুর মুখে নিয়ে ঢোকে, আপনি চোখ সরাবেন না। ও তখন আপনার সঙ্গে আয়না আয়না খেলছে। ইঁদুরটা তখনও বেঁচে আছে ওর খেলার জন্য, আর আপনার দেখার জন্য। মৃদু কাঁপছে। আপনার সামনে সেটাকে নামিয়ে দিয়ে আপনার বিড়াল বলবে 'ম্যাঁও'। এটা খেলা দেখার অফিসিয়াল আমন্ত্রণ। নাহলে ও বাগানেই ইঁদুরটাকে নিকেশ করতে পারত। আপনাকে টিকিট দেওয়ার জন্য এনেছে। কেরামতি। মুখ থেকে ইঁদুরটাকে মেঝেয় ছেড়ে দিয়েছে আপনার বিড়াল। ইঁদুরটা কয়েকবার পালাবার চেষ্টা করল। সেই চেষ্টা যাতে সেটা করতে পারে, তাই বিড়াল সেটাকে এখনও মারেনি। খেলার মজাটা বাঁচিয়ে রেখেছে। ছোট্ট ছোট্ট কয়েকটা লাফে ইঁদুরটাকে সে ধরে ফেলছে, লোফালুফি করে খেলছে। একটু পরে ইঁদুরটা হাল ছেড়ে দিল।

আপনি এখন ২টো কাজ করতে পারেন।

১. আপনি ইঁদুরটাকে ছাড়িয়ে নিয়ে সেটা বাঁচাতে পারেন এখনও। ২. আপনি বিড়ালকে সেটা খেতে দিতে পারেন।

বিড়ালের মুখ থেকে ইঁদুর ছাড়িয়ে নেওয়ার অধিকার কি আপনার আছে? প্রকৃতি কি সেই অধিকার আপনাকে দিয়েছে? আপনি অবিশ্যি বিড়ালটাকে রোজ দুধভাত এবং মাছ খেতে দেন। কিন্তু এই ইঁদুর ওর নিজের উপার্জন। এতে আপনার হস্তক্ষেপের অধিকার নেই।

আয়না পরিষ্কার হল। আপনার ওই নৃশংসতা ভালো লাগল না। আপনি সরে গেলেন। আপনার মাথায় এল ১ দার্শনিক চিন্তা— পৃথিবীর কোনো নেংটি ইঁদুর কি বুড়ো হয়? সে সুযোগ কি সে পায়? নাকি, তার আগেই কোনো না কোনো বিড়ালের পেটে সে চলে যায়? আয়নায় আবার বাষ্প জমছে।

একটু পরেই আপনার বিড়াল ঠোঁট চাটতে চাটতে এল। আবার 'ম্যাঁও' বলে ১ লাফে আপনার কোলে উঠে পড়ল। ওর ছোট্ট লোমশ গরম মাথাটায় হাত বোলাচ্ছেন আপনি, ও সুখে গরগর করছে, একটু পরেই ঘুমিয়ে পড়বে। নিঃস্পন্দ নিরপরাধ ঘুম আপনার কোলকে গরমে ভরিয়ে দিচ্ছে।

কী হাস্যকর ঘুম!

বিড়ালের যে ঘুম, সেটার মধ্যেই আপনি এতক্ষণে ফিরে পেলেন নিজের প্রিয় পোষ্যকে, যে বাড়ির বাইরে থাকলে আপনি বেশ চিন্তিত থাকেন। চিন্তাটা আপনাকে মানুষ হওয়ার ফিলিং দেয়। সেই ফিলিংকেও আপনি পুষছেন। বিড়াল যখন আপনার কোলে, সেই মানুষ-মানুষ ফিলিং তখন বাড়ির বাইরে চরতে যায়। সেটা বাইরেই ইঁদুর-টিদুর ধরে খায়। রক্ত চেটে সাফ হয়ে ফিরে আসবে ঠিকই।

আমার পোষা বিড়াল নাকি দরজায় নক করে ঢোকে আজকাল? আরে, আপনিই তো বলেছিলেন আমাকে।

বাড়ি আর বাগানের মধ্যে ১রকমের সম্পর্ক দেখা যায়। সেটা গাণ্ডেপিণ্ডে ভোজনের সঙ্গে ততটা যুক্ত নয়, যতটা আন্ডা পড়ে থাকা ভোরের সঙ্গে। সব ভোরে আন্ডা পড়ে না, কুয়াশাও হয় না। কিন্তু ঝুঁঝকো আলোয় দেখা যায় হাঁস মুরগিরা উঠছে, কুমড়োলতা ফলে আছে, লাউ, বেগুন, কাঁচালংকা। ফুলগাছের বদলে যে বাগানে ফলগাছ প্রাধান্য পায়, এটা ভাবলে ভুল হবে, সেখানে মাইনে আর টিউশনি বা প্রাইভেট প্র্যাকটিসের মধ্যে প্রগাঢ় লেনদেন চোখে পড়ে।

নিজের ফলানো ডিম আর ফসলের প্রতি যে লোভ, যে মোহ, সেটা ইয়ার্কির জিনিস নয়। প্রচুর দামি ও নামি ফুলগাছকে পরিকল্পনামাফিক বা অপরিকল্পিতভাবে লাগিয়ে দিলে সেই ছাপোষা গাম্ভীর্য হারিয়ে যায়, যেটা লাউ-কুমড়ো-কাঁচালঙ্কার সবুজ সস্তা যথেচ্ছতা থেকে ঠিকরে আসে। ১টা লাউমাচায় শ্রীচৈতন্য থাকেন। নিত্যানন্দ প্রভু থাকেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজ থাকেন। বহুতল বাড়ির মহার্ঘ্য ব্যালকনিতেও লতিয়ে ওঠে লাউ, অথবা কুমড়ো। টবে টবে বসে থাকে কাঁচালঙ্কার ঝাঁকুর ঝুঁকুর ঝোপগুলো। টম্যাটোর টবে পড়ে যায় টিন এজারের প্যান্টি। হেলিকপ্টার থেকে শট নিলে সেটার ছবি পাওয়া যাবে। ক্রেনে ভারটা কুলোবে না।

গৃহস্থ বাড়ির সামনে ১টা সাদা আকন্দগাছ লাগানো থাকে অনেক সময়। সাপ আসে না। শত্রু ঘেঁষে না। গাছের নাম আকন্দ দেওয়া হল কেন? লাউ? কুমড়ো? কাঁচালঙ্কা দেওয়া হল কেন? কারা রেখেছিল এসব নাম? কে প্রথম খেয়ে বলেছিল লাউ বা কুমড়োয় বিষ নেই? রামায়ণের লঙ্কাপুরীর সঙ্গে এই লঙ্কার কি কোনো যোগ আছে? গৃহস্থের বায়োডাটায় এসব লিঙ্গুইস্টিক তথ্য লেখা থাকে না। ঝালের হরফে হরফে অক্ষরে অক্ষরে লেখা থাকে গরম ঘি-ভাতের সঙ্গে কাঁচালঙ্কায় কামড় দেওয়ার লাল-সবুজ থ্রিল। পুরুষানুক্রমিক রোমাঞ্চ। জিভে তীব্রতা নেওয়ার যে মজা, যা আসলে কোনো স্বাদ নয়, তেমন হলে মুখের ছালচামড়া তুলে দেয়, সেই হল কাঁচালঙ্কা। মিষ্টি মিষ্টি সংসারগুলোয় কাঁচালঙ্কা ত্রাসের উচ্চচাপ থেকে প্রীতির নিম্নচাপের দিকে নিয়ে যায় বাঙালির উত্তেজনাবোধকে।

কোঁকর কোঁওওওওওওওওওওওওওওওওওওওও

প্যাঁক প্যাঁক প্যাঁক প্যাঁক প্যাঁক প্যাঁক প্যাঁক প্যাঁক

১ নরম সবজি থেকে আর ১ নরম সবজিতে, গরম কুসুম থেকে আরও গরম কুসুমে, বদলে যায় বাঙালির উদবেগ আর উৎকণ্ঠার গ্রাফ।

ইয়ের মাথা

'এই, এটা কীরকম উপন্যাস হচ্ছে বল তো! এটা ২৫০০০ শব্দ অবধি যাবে? অর্ধেকও যাবে বলে তো মনে হয় না। মাথা নেই, মুণ্ডু নেই, কী লিখছে এটা রাজকুমার? প্রকাশক ছাপল কেন?'

'সেটাই তো ভাবছি! এতটা পড়লাম, কাহিনির তো কোনো বালাই নেই। উপন্যাস অবিশ্যি বলছে না। নাম দিয়েছে আখ্যান।'

'আমার ইয়ের মাথা আখ্যান! চালাকি। স্রেফ চালাকি।'

'অনুপম মালটা এমনই লেখে। কায়দাবাজি। আর ৫ জন যেভাবে লিখবে, ও লিখবে না। ১টা উদ্ভট কিছু না করলে ওর শান্তি নেই। মালটা ছেলেবেলায় মনে হয় খুব বিচ্ছিরিভাবে মানুষ হয়েছে।'

'১টা কাজ করি। আমার কাছে নাম্বার আছে। অনুপমকে ১টা ফোন করি। শালা, উদোম খিস্তি দেব।'

'লাগা তো! শালা, আমিও খিঁচব মালটাকে।'

'হ্যালো! মাল? তুমি চোদনা যে আমাদের মুখে এইসব বসাচ্ছ, সেটা তোমার হীনম্মন্যতা। আর কিছু নয়।'

খনন। ও ভাবারোগ

খনি থেকে উঠে আসা লোহার যে আকরিক, সে তো লোহারই চরিত্র হয়ে থাকে। আমরা তাকে লোহা ভাবি না। সে আসলে লোহা নয়, কিংবা সে আসলে লোহাই, কিংবা, শুধুমাত্র আমাদের মনের ছায়া। মনকে আমরা শরীরের চেয়ে আলাদা কিছু ভাবি, জীবনের চেয়েও আলাদা কিছু ভাবি, সম্ভবত। মন থেকেই ভাবি। লোহা কারখানায় ঢোকে, আরও ভালো লোহা হয়ে বেরিয়ে আসবে বলে। আলোকিত, স্তব্ধ, নির্বীজ, ঠাণ্ডা লোহা। যেমন আকাশ ১টা টাঙিয়ে রাখা আকরিক, যেন কবিয়ালের মাথায় নীল শামিয়ানা। সমুদ্র ১টা বহমান আকরিক, যেন অজস্র হারপুন শরীরে নিয়ে ১টা তিমি ছুটবে বলেই সে উন্মুখ।

কারখানায় ঢোকার আগে অবধি আকরিক। এই যে মূল কিছুকেই না পালটিয়ে পালটে যাওয়ার খেলা, লোহা হয়ে জন্মেও কারখানায় ঢুকে ইস্পাত হয়ে যাওয়া, এটাকে স্পষ্টভাবে বুঝলে আপনি নিজের জীবনকে অনেকটাই ভালোবাসতে পারবেন। প্রয়োজনীয়ভাবে কিছুটা ঘৃণা করতেও পারবেন। হয়তো ভয় পেয়ে যাবেন আপনার মধ্যে শুয়ে থাকা বাগানটাকে দেখে, অথবা সেই জমি যা বাগান হয়ে উঠতে পারে। বীজগুলোর কাছে আপনি ঋণী, কারণ বীজ হল আকরিক, তার মধ্যে আস্ত ১টা গাছ লুকিয়ে থাকে। গাছ। নির্দোষ গাছ। বাগানের দোষ থাকে। গাছের

থাকে না। ১টা ফুলগাছ গজিয়ে উঠলে সাজানো বাগান আর আগের মতো নিরপরাধ থাকে না।

'মানুষ যতটা ভাবে, তার কতটুকু মানুষের কাজে লাগে!'

'আপনি কী ধরনের কাজের কথা বলছেন মানিকবাবু?'

'দেখুন সুমিত্রা, এই যে পার্কটা হয়েছে, আমরা এসে বসছি, ছেলেমেয়েদের খেলা দেখছি, প্রেম দেখছি, এই পার্কটায় ওই যে ১টা ফুল ফুটেছে, আপনি বললেন ওটা নাকি বিষফুল, ওটা কী করে এল?'

'কোনোভাবে বীজ এসেছে। পার্কের মাটিটা ভালো। সার আছে। গাছ হয়েছে।'

'এল কেন? পার্কের যে পরিকল্পনা, তার সঙ্গে তো ওটা মানায় না!'

'ওই, আপনার ছেলের কিনে দেওয়া স্মার্টফোনে যেমন সেদিন ভাইরাস ঢুকল, আপনার সব রবীন্দ্রসংগীত উড়িয়ে দিল, কনট্যাক্ট লিস্ট উড়ে গেল, আপনাকে দোকানে ছুটতে হল, সেরকম। ও ১টা ভাইরাস। ওর নিজস্ব মতলব আছে নিশ্চয়ই।'

'তাই?'

'হ্যাঁ। একদমই তাই। হাওড়া ব্রিজের আসল নাম যে কী, ক-জন জানে বলুন তো? ক-জন জানে, ওই ব্রিজে মোট কতগুলো নাটবল্টু আছে? না জেনেও তো লোকজন দিব্যি হাজারে হাজারে লক্ষে লক্ষে পারাপার হচ্ছে প্রতিদিন! তারা কি ভাবছে আদৌ?'

'আপনি কি বলছেন আমি বুড়ো হয়ে গেছি সত্যিই? বড্ড বেশি ভাবছি? ভাবারোগ হয়েছে আমার?'

'হি হি... ভাবারোগ! আপনি পারেন মানিকবাবু। কিশোর ভারতীতে একটা বইয়ের বিজ্ঞাপন দেখতাম— 'নাম তার ভাবা'। তা সেরকম বোধহয় সত্যিই কিছু হয়েছে আপনার। এটা অবিশ্যি এই সময়ের রোগ। বয়স মানে না।'

'বুঝলাম না সুমিত্রা।'

'দেখছেন না, চারদিকে বিভিন্ন বয়সের লোকজন কত ভাবছে? কেউ ভাবছে ভারত-পাকিস্তান ক্রিকেট ম্যাচ গটআপ ছিল কিনা। ভাবতে ভাবতে ভুলে যাচ্ছে ভারত হকিতে পাকিস্তানকে গো-হারান হারিয়েছে। কেউ ভাবছে ইদে সলমন খানের সিনেমা মোটে ১০০ কোটির ব্যাবসা করল কেন! ভুলে যাচ্ছে বৃদ্ধ সুপারস্টার

অমিতাভ বচ্চনের কাছে এখন ওই ১০০ কোটিই ১টা দুর্গম লক্ষ্য। কেউ ভাবছে মমতা ব্যানার্জির সঙ্গে বিজেপির কেমিস্ট্রিটা ঠিক কী হচ্ছে? বিজেপির বিরুদ্ধে চেঁচিয়ে উনি আসলে সিপিএম-কেই আরও মাটিচাপা দিচ্ছেন কি? কিংবা ভাবছে সিপিএম নেতারা কেন প্রকাশ্যে শনিমন্দিরে পুজো দিচ্ছে না, কেন লুকিয়ে লুকিয়ে যায়! প্রচুর ভাবছে সবাই। কেউ কেউ চিৎকার করে ভাবছে। কেউ কেউ গালে হাত দিয়ে। কেউ বুঝতে পারছে না ছত্রধর মাহাতো নামক ১টা লোক সেই যে জেলে গেল, আর বেরোল না কেন! অথচ কারও মুখে ছত্রধরের নাম নেই। কারও কারও ভাবায় অবিশ্যি বেশ ম্যাজিক আছে, কী বলেন?'

'ভেবে লাভ নেই বলছেন? মানুষ ভাববে না? তার কোনো সামাজিক দায় থাকবে না?'

'সেটা বলিনি। কিন্তু এইসব বিরাট ইস্যু নিয়ে আমাদের ভাবার উপায় নেই। ভাবার মালমশলাই তো হাতে নেই। বিশ্বাস বা অবিশ্বাস করার মতো কিছুই তো নাগালে পাই না আমরা! ব্রিটিশ আমলে মানুষ ভাবত, ভাবার মতো ঘটনা পেত। দাঙ্গা হত, মন্বন্তর হত, জালিয়ানওয়ালাবাগ হত। ঘটনা থাকত। ঘটনার মতো ঘটনার থাকলে সেটা নিয়ে ভাবা যায়। সিপিএম আমলেও নন্দীগ্রাম হল, মানুষ ভাবল, ভুল হোক ঠিক হোক, মানুষ সিদ্ধান্ত নিল, ১টা ঘটনার সাপেক্ষেই সেটা নিতে পারল। কিন্তু ক্রিকেট, সিনেমার মতো যে ব্যাপারগুলো আমাদের চোখের সামনে থেকেও চোখের বাইরের ব্যাপার, তা নিয়ে বাঙালি খেলা ফুরিয়ে যাওয়ার পরেও, সিনেমা হলে না গিয়েও ভাবছে কেন? ফেসবুক গরম করে দিচ্ছে ভেবে ভেবে। এটা কি রোগ নয়? এখনকার পলিটিকসও তো আমাদের ঘটনা দিচ্ছে না। পলিটিকস আমাদের এন্টারটেইনমেন্ট দিতে চাইছে, আর মিডিয়া ঘটনাগুলোকে ফেনিয়ে ফেনিয়ে তৈরি করছে। ভাবারোগ আমাদের ওপরে চেপে বসছে। অতিবিশ্লেষণের অসুখ সমাজের উর্বর মাথাগুলোকে চিবিয়ে চিবিয়ে খাচ্ছে। অথচ দেখুন, কিছু ঘটছে না। ১টা সিনেমা তৈরি হচ্ছে না এইসব ভাবা থেকে, ১টা উপন্যাস লেখা হচ্ছে না ভাবারোগ থেকে। কী লাভ?'

'জানি না। হয়তো ঠিক বলছেন সুমিত্রা আপনিই। এসবই সময় কাটানোর ছুতো। মানুষ তো আজও এটাই জানে না, মানুষ সত্যিই চাঁদে গিয়েছিল কিনা, নাকি ওটা

স্ট্যানলি কিউব্রিকের তৈরি সিনেমা ছিল!'

'সত্যজিতের 'প্রতিদ্বন্দ্বী' সিনেমায় ইন্টারভিউ বোর্ড ধৃতিমানকে প্রশ্ন করেছিল সে মুন ল্যান্ডিং আর ভিয়েতনামের মধ্যে কোনটাকে গুরুত্ব দেয়। আসলে জানতে চাওয়া হয়েছিল সে কম্যুনিস্ট কিনা। এই ২০১৭-এ আবার হয়তো ১টা ছেলে বা মেয়ের কাছে বুঝতে চাওয়া হবে সে কম্যুনিস্ট কিনা, অর্থাৎ ২০১৭-র কম্যুনিস্ট কিনা, তবেই চাকরি দেওয়ার কথা ভাবা হবে। মানুষ চাঁদে গেলেও পৃথিবীর কিছু বদলায়নি। তাই না?'

'না। আমার মনে হয় সুমিত্রা, মানুষ চাঁদে যায়নি। ইউটিউবে সেদিন ১টা ডকুমেন্টারি দেখলাম...'

'এই দেখুন, আবার আপনাকে ভাবারোগ চেপে ধরল। এটা মনে হয় বাঙালি পুরুষের মজ্জাগত মানিকবাবু। মেয়েদের থাকলেও ঠিক পুরুষদের মতো অতটা বেশি নয়। অবসেশন দাঁড়ায় না ব্যাপারটা।'

'তাই? আর ১টা নিরীহ নীলফুলকে বিষাক্ত ভাবা, সেটাকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ষড়যন্ত্রের সঙ্গে মেলানো, সেটা তাহলে কী?'

'ওটা আপনি বুঝবেন না। কোনো পুরুষ তুলসীতলায় প্রদীপ জ্বালাতে পারে না, পারেনি কোনোদিন। মেয়েদের যে উৎকণ্ঠা থেকে মঙ্গলকামনা জন্ম নেয়, তার মধ্যে কোনো গ্লানি থাকে না। ওই যে প্রণাম করার আগে গলায় জড়িয়ে নেওয়া আঁচলটা, ওটার কোনো ব্যাখ্যা বা বিশ্লেষণ লাগেও না। কিন্তু ওই যে মেয়েটা ফোনে কথা বলতে বলতে হেঁটে যাচ্ছে, জিনস আর টি-শার্ট পরে, ও সেটা জানবে কি কোনোদিন? ওর জীবন হয়তো আরও মহৎ হবে, আর উন্নত হবে, নিজেই ১টা তুলসীতলার প্রদীপ হয়ে উঠবে ও, কিন্তু ওই গলায় জড়ানো আঁচলের মূল্য ও জানবে না। তা ছাড়া...'

'আরে খবরটা দেখেছেন? ১টা ডকুমেন্টারিতে নাকি অমর্ত্য সেনের ডায়ালগ সেন্সর করা হয়েছে? ছি ছি ছি ছি... ১জন নোবেল লরিয়েটের যদি এদেশে বাক স্বাধীনতা না থাকে, আমাদের কী হবে বলো তো সুমিত্রা?'

জোছনার আয়ু। চাঁদের পায়ু

১টা লোহার স্ট্যাচুর মধ্যে থেকে যায় অসংখ্য শাবল-কোদাল-গাইঁতির উপাদান। ১দিন সেগুলোই হয়তো ভেতর থেকে চাপ দিয়ে ওই মূর্তিটাকে ফাটায়। ১টা রুপোর মূর্তির মধ্যে থেকে যায় অনেক চামচ-হাঁসুলি-তাগা- বাজুবন্ধের সম্ভাবনা। সেগুলোও কি ১দিন মূর্তিটাতে চিড় ধরায়? রূপ আর অরূপের মাঝখানে দাঁড়িয়ে অপরূপ আমাদের গালে থাপ্পড় মারে, আমাদের চাবকায়। আমরা নিজেদের নিতম্ব টেনে ফাঁক করে সাজিয়ে দিই অপরূপের সামনে— 'এসো, মেরে দাও!' আমাদের নীতি, প্রীতি, ভীতি, লাথি, উল্লাস, বিলাপ, শীৎকার, থাপ্পড়, চিৎকার, আদর্শ, পাপ, পুণ্য, থুতু, অমৃত, গরল, ফ্যাদা, দান, প্রতিদান, পেচ্ছাপ, বাণী সব বংশানুক্রমিকভাবে ওই অপরূপের দিকে ছুটে যেতে চায়, যেন চুম্বকে আহত লোহা, যেন জ্যোৎস্নায় ক্ষত-বিক্ষত রুপো—

'ওগো, এসো... মেরে যাও!'

চাঁদ হয়ে, এমনকি চাঁদ হওয়ার লোভে, আমরা ভুলে যাই আমরা হোমো-স্যাপিয়েন্স, নাকি ক্রো-ম্যাগনন, হোমো-ইরেকটাস, নাকি নিয়েন্ডারথাল।

ভালো করে ধুয়ে মুছে পোঁদ পেতে দিই।

এমনকি, কথামৃতরও লোভ আমাদের পায়।

'আমার ধারণা জীবনানন্দ দাশ নামক উপন্যাস-লেখকের ১ ফোঁটা পেচ্ছাপের নাম সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়। আপনার কী মনে হয়?'

আমার মনে হয়, আপনার নেশা হয়ে গেছে। আর আমার কোনো চরিত্রের মতামত বা নেশা কোনোকিছুই আমি নিয়ন্ত্রণ করি না।

কিছু মেঘ জিতে গেছে। কিছু ফিরে গেছে। কিছু মাটি এখনও খুব গভীর ও গরিব হয়ে আছে। দিনের নতুনত্বকে ছিঁড়ে দিচ্ছে রোদ। কাদার মধ্যে যেন অসংখ্য বাবলস ফাটছে। পৃথিবীর সব ট্যাক্স ১ হয়ে ট্যাক্সি হয়ে যাচ্ছে। ধ্বনি নিয়ে শব্দ নিয়ে চেয়ার-টেবিল কাঁধে নিয়ে বেরিয়ে পড়ছে ওস্তাদ লেখকরা। যে-কোনো ওস্তাদির দৌড় টাইপরাইটারের গেট অবধিই। যে কারখানায় রঙের কৌটো বানানো হচ্ছে, রুপোর মানতাশা বা মল বানানো হচ্ছে, তার চৌকাঠে কাদা, ছাদে রোদ্দুর। এসব লিখলে ম্যাজিক মনে হয়। ১টা সেনটেন্স আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়াচ্ছে, শব্দ ফেরাচ্ছে,

প্রতিবিম্বিত শব্দগুলো নিয়ে নেচে উঠছে পৃথিবী। কে কার প্রতিবিম্ব? টেবিলকে কেন দেওয়াল বলব না? যোনিকে কেন লিঙ্গ বলব না? হাতির দাঁত কেন প্লাস্টিক নয়? এইসব প্রশ্নের সামনে চ্যালেঞ্জ নিচ্ছে, বেঁচে উঠছে পৃথিবী। ১টা শব্দ কিছুতেই আরেকটা শব্দ হতে পারে না।

১টা শব্দ কিছুতেই, আরেকটা শব্দের কাজ করে দিতে পারে না।

ভোলাদার চা দোকান

'এসো, আমি আজ তোমাকে আমার মুখের ক্ষতটার গল্প বলি। আড়চোখে অনেকক্ষণ তাকিয়ে আছ এটার দিকে দেখছি।'

'কী? কী বলছ কী?'

'রহস্যটা বলব। এই যে দেখছ ১টা ছাইরঙা, পুরো নিখুঁত কাটাদাগ, আমার কপাল থেকে নাক কেটে নিয়ে মুখের আড়াআড়ি নেমে গেছে, দেখছ তো? এটা কী করে হল জানো?'

'আমি তো তোমার নামটাই জানি না। কথাই যখন বলছি, তখন সাফ বলি? যে নাম তুমি পাড়ায় সবাইকে বলেছ, সেটা তোমার নাম হতে পারে না। তুমি পশ্চিমবঙ্গের লোক নও। তোমার বাংলায় পাঞ্জাবি টান লেগে আছে। বাংলা অথচ বেশ ভালোই বলো তুমি। এ পাড়ায় তুমি কেন এসেছ, কেউ জানে না। মাঝেমধ্যেই সাতদিন আটদিন বাড়ি থেকে বেরোও না। তারপর দেখা যায় মাঝরাতে চুপচাপ ট্যাক্সি থেকে নামছ। বাড়ির ভেতরে ছিলে, নাকি বাইরে ছিলে, বোঝা যায় না। সবাই তোমার জ্বলন্ত চোখকে ভয় পায়, তোমার কাঁচাপাকা গোঁফকে ভয় পায়। তুমি বেশ রোগা। কিন্তু রোগারা বেশি নিষ্ঠুর হয়।'

'তাই নাকি? রোগারা নিষ্ঠুর হয়, এটা কি ইতিহাসে লেখা আছে?'

'এই দ্যাখো, তোমার চোখ আবার জ্বলে উঠল। দ্যাখো, তোমার মুখে কেন কাটাদাগ, আমার জানার কোনো শখ নেই। আমি যাই। উত্তম-সুপ্রিয়ার নতুন সিনেমা এসেছে। শমিত ভঞ্জ আছে। বন্ধুরা অপেক্ষা করছে।'

'তুমি উত্তমকুমারের ন্যাকা সিনেমা দেখার ছেলে নও। আমি জানি। তোমরা গোদার আর ত্রুফো দেখার ছেলে। দেখতেই পাচ্ছ, আমিও নামগুলো জানি। আমি তোমার চেয়ে বয়সে অনেকটাই বড়ো। আবেগে না হই, অভিজ্ঞতায় বড়ো। কাজেই

বোকা বানিয়ো না। যদি কমার্শিয়াল সিনেমা দ্যাখো, তাহলেও তোমরা 'দিওয়ার', 'শোলে' বা 'জঞ্জীর' দেখবে। তোমাদের হাতে হাতে লেখা আছে— মেরা বাপ চোর হ্যায়। আচ্ছা, এটা কেন ভাবছ, তুমি আমাকে ভয় পাও, আর আমি তোমাকে পাই না?'

'হতে পারে। বাঘও হয়তো হরিণকে ভয় পায়। হরিণের ঋণকে এড়িয়ে যেতে চায়। তাই আড়ালে লুকিয়ে থাকে। অতর্কিতে ঘাড় মটকায়।'

'আমি কিন্তু তোমার ভয়ের জন্যই এই পাড়ায় এসেছিলাম।'

'আমার ভয়ে!'

'ভয় পেয়ে নয়। বলতে পারো, তোমাকে ভয় পাওয়া শিখতে এসেছিলাম। ভয় কীকরে পেতে হয় জানতে, আর কিছুটা তোমাকে সমঝে নিতে, তোমাকেও জানতে।'

'কী জানতে? আমি উত্তমকুমারকে পছন্দ করি কিনা? দিওয়ার দেখেছি কিনা? হেঁয়ালি হয়ে যাচ্ছে না ব্যাপারটা?'

'তাহলে তোমাকে ব্যাপারটা খুলেই বলি? গত শীতে তুমি ভাগলপুর গিয়েছিলে, তোমার বন্ধু বিনয় মজুমদারের বাড়িতে। কলকাতা থেকে কয়েকদিন গা ঢাকা দেওয়াটাই উদ্দেশ্য ছিল তোমার। মনে আছে? বাকিটা বলছি। তার আগে, ভোলা... ভোলাদা, আরেকবার চা দাও।'

দিক-বিদিক

কখনো-কখনো ঘুমের মধ্যে আপনি ১টা কয়েন হয়ে যান। কখনও ১টা গেলাস। কখনও ১টা কালো দরজা আপনাকে বলে দেয় ১টা সাদা ঘর খোলা ছিল। কখনও ১টা গাঢ় লাল ফুল তার সবগুলো হালকা লাল পাপড়ি সমেত ছিটকে ওঠে। আপনার জন্য মেলে দেয় প্রত্যেকটা আলাদা দিক। দিক ১টা অদ্ভুত শব্দ। বিদিক বলে কি কিছু হয়? দিকের তো কোনো ভবিষ্যৎ নেই, অতীত নেই, আছে শুধু মুখোমুখি বসিবার বর্তমান সেন।

অর্থনীতির মতোই দিকনীতি, বিদিকভীতি শেষ অবধি কিছু খুব জটিল এবং অশেষ বিষয়। দিকের দিকে আপনার চোখ ততটা যায় না, যতটা যায় বিদিকের আঙুল। ধুর! ঘেঁটে গেল ব্যাপারটা তাই না? যুক্তি। তর্ক। গপ্প। বেলা। অবেলা।

কালবেলা। দণ্ডবায়স। আর আত্মহত্যার ঠিক আগে হারবার্ট নামে ১টা বিদঘুটে সিড়িঙ্গে লোক ফুর্তি করতে চেয়েছিল। যাকে বলে মেমফুর্তি। কবজির শিরা কাটার আগে বরফের বিপুল চাঙড় লাগে কার? আপনি নিশ্চয়ই জীবনে ১ বা ১-এর অধিকবার আত্মহত্যার কথা ভেবেছেন। আত্মহত্যা বিনিময়ের কথা ভাবেননি তো?

পৃথিবীতে যখন কেউ অন্য ১টা লোকের মৃত্যুর লোভে পড়ে, সে নিজে নিজে মরার কথা ভাবে। জানলা দিয়ে প্রতিবেশী আর প্রতিবেশিনীর সেক্সসিন দেখার পরে যেমন নিজে নিজে করতে ইচ্ছে হয়। মরা খুব সেক্সি ব্যাপার হয়ে যায়। মরা ১টা দারুণ শখ অনেকের কাছে। মরা-মরা ভাব নিয়ে বেঁচে থাকাও ১টা দুর্দান্ত মজাদার ব্যাপার। সিগারেটের প্যাকেটের ওপরে ক্যানসারাক্রান্ত ছবির মতো মুখ নিয়ে, ভেতরে বেদম ১টা হাসি চেপে রেখে কিছু লোক ঘুরে বেড়ায়। আবার কিছু লোক পায়েসে কিসমিসের মতো প্রসন্ন মুখ নিয়ে ভেতরে ভেতরে সত্যিই মরে যেতে থাকে। তাদের দেখে বুঝতেই পারবে না তাদের মরার ব্যাপারটা কত এগিয়েছে।

'জীবনানন্দ দাশ, ঋত্বিক ঘটক, সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়, নবারুণ ভট্টাচার্য, এইসব পোস্টার লাগিয়ে রেখেছিস। ভাস্কর চক্রবর্তীও আছেন দেখছি।'

'হ্যাঁ, এরা আমার দেবতা। আমার পথপ্রদর্শক। যাপনটাই আসল বুঝলি! দিকটাই আসল। সাকসেস নয়। ব্যর্থ নাহলে শিল্প হয় না। বিষাদকে উদযাপন কর। জয় বাংলা! জয় গুরু! এসিটা চালাই দাঁড়া। কী ভ্যাপসা ওয়েদার আজ! বৃষ্টির নাম নেই।'

'আজ তো বৃষ্টি হবে বলছে। ১টাও রবীন্দ্রনাথের ছবি নেই কেন?'

'নাহ! আমার ওই জমিদার মালটাকে পোষায় না। আমার জীবনের সঙ্গে ওর কথাবার্তা মেলে না। ওর আজকের দিনে কোনো যাপন নেই। লোকটা বড্ড বেশি সফল। বাংলার লোকজীবনকে ব্যবহার করেছে। নিজের জীবনেরও সব কিছুকে বাঁড়াটা শুষে নিতে চেয়েছে। বাংলার মানুষ আর মানুষীর অশিক্ষিত অমার্জিত হৃদয়ের দিকে তাকা। বুঝবি বেনো জলে ভাসিয়ে দিতে হয় অমন মালকে। সেটাই করেছি।'

'পড়েছিস?'

'বসে বসে রবীন্দ্রনাথ পড়ব! তোর কি আমাকে গান্ডু মনে হয়?'

'না। এমনি বলছি।'

'নে। ধরা। বাংলার মুক্তিসেনাদের স্মরণ কর। হিন্দি বলয় নিপাত যাক! জ্বালা!'

'নাহ! আমার উইড পোষায় না। বরং মাল থাকলে দে। হুইস্কি আছে?'

'তোর উইড পোষায় না! ফরেন মাল পোষায়! তুই বাংলা কবিতা লিখবি?'

'কেন?'

'আরে ফরেন মাল খেলে ১টা গোরুকে তোর ২টো গোরু মনে হবে। বঙ্গীয় সুরা খেলে ১০টা গরু মনে হবে। কিন্তু বুকভরা শুদ্ধ উইড টেনে ১টা গোরুর দিকে তাকা, তোর মনে হবে সেটা ১টা দুর্ধর্ষ ইউনিকর্ন, ডানা মেলে এখুনি পল্লিবাংলার আকাশে উড়ে যাবে। মনে হবে ক্যাওড়াতলা মহাশ্মশানে নিথর বসে আছিস, সামনে চিত্তরঞ্জন দাশের স্মৃতিসৌধটা নড়ছে। পুরো পাথর হয়ে যাবি বে। স্টোনড।'

'এমনিতেই গোরু আর পাথর নিয়ে ইন্ডিয়া খুব চাপে আছে। আমার হরিণঘাটাই ভালো। বিলিতি মাল থাকলে বের কর। স্কচ আছে?'

'স্কচ! বোকাচোদা! শালা, কেন্দ্রীয় সরকারকে খিল্লি করতে গিতে সাংবাদিকতার চাকরিটাই চলে গেল। বাপের পয়সা ছিল। চালাচ্ছি। ১টা শর্টফিল্মও বানাতে পারছি। কিন্তু, তুই স্কচ চাইছিস? বাঁড়া!'

'তোকে নিয়ে ১টা উপন্যাস লিখব ভাবছি কিছুদিন থেকে।'

'উপন্যাসের চরিত্র বানাবি আমাকে? মরে যাব তো! মৃত্যুভয় হচ্ছে আমার শুনেই। তা লেখ। তোর সঙ্গে আমার পলিটিকাল ঐক্য নেই। কিন্তু সাহিত্যিক ঐক্য তো আছে। যা খুশি লেখ। তবে, পাবলিশ হলে বাংলা মাল খাওয়াতে হবে পেট পুরে। ময়লা পাঞ্জাবি পরব। দাড়ি কামাব না সেদিন। খুব পুরোনো কোনো পানশালায় যাব ২জনে। টেবিলে বইটা থাকবে। বাইরে ঝিরিঝিরি বৃষ্টি পড়বে। আর কী চাই বাঁড়া!'

'আর কিছু না?'

'আর শুধু চাইতে পারি বাঙালির ১টা আলাদা জাতীয় সংগীত। রবি শালার লেখা হলে চলবে না। বরিশালের ঘ্রাণ থাকা চাই। সলিল চৌধুরী বা কবীর সুমনের লেখা হতে হবে। নাহলে নজরুল। আর চাই বাঙালির আলাদা জাতীয় পতাকা— লাল

আর সবুজ রঙে। হিন্দি বলয়ের চাপিয়ে দেওয়া পতাকা আমরা মানব না। জয় বাংলা! কিন্তু কী নাম দিবি নভেলের?'

'ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন।'

মুদ্রাদোষ থেকে রেহাই পাওয়া খুব কঠিন ব্যাপার। নিজের মুদ্রাদোষের দিকে তাকিয়ে দেখলে তার গায়ে কিছু আঁচড় পাওয়া যায়। নিজেরই নখের আঁচড় সেগুলো। অন্যমনস্কতার ফল। বাচ্চাদের পেনসিলে যেমন কচি কচি দাঁতের দাগ লেগে থাকে। অবিশ্যি মুদ্রাদোষ নিয়ে ছেলেখেলা চলে না। পিস্তলের মতোই সাবধানতা জরুরি। কিন্তু খুবই সাধারণ হয় মুদ্রাদোষের চেহারা, যাকে বলে আপাত নিরীহ। সাধারণ ফুটপাত দিয়ে আপনার উলটোদিক থেকে হেঁটে এসে ১জন আপাদমস্তক ভদ্রলোক যেমন আপনার নাকের ওপরে দামি সিগারেটের ধোঁয়া ছুড়ে দিয়ে চলে যায় কিছু বলার আগেই। অথচ আপনার নাকের কোনো আঁচিল ছিল না। জীবনে ১বারও মাছি বসেনি আপনার নাকে।

আপনি নিজের মুদ্রাদোষ হারাতে চান? মরা কুকুরের মতো বাগানে পুঁতে দিন। তার দাঁত ১দিন আপনার কামড় দেওয়া পেয়ারায় ফুটে উঠবে। পানুর মতো নিজের সম্মানিত লাইব্রেরির কোনো কোণে লুকিয়ে ফেলুন। ভুলেও কোনো কুচকুচে কালো শ্মশান বা ফ্যাকফেকে সাদা কবরখানার দিকে যাবেন না। পেট ভরে সরু চালের ভাত খান। চিবোতে চিবোতে বিশ্বাস রাখুন চালগুলো সত্যিই সরু। বালিশে দুটো থাবড়া মারুন। বালিশকে পোষ মানান।

ঘুমিয়ে পড়ুন।

বরফ। সিনেমা। পজ

বরফের দেশের ১টা মেয়ে বাথটবে ঝুঁকে আছে। রোগা। লম্বা। সম্পূর্ণ নগ্ন। বাথটব থেকে বেরিয়ে আছে ১ পুরুষের কনুই থেকে আঙুল অবধি হাত। মেয়েটার সারা শরীরে রক্ত ছিটকে ছিটকে আসছে। পোশাক পরার উপায় নেই। মৃতদেহটাকে কাটছে সে। কাজ শেষ করে স্নান করল। ঠান্ডা গায়ে লাল পোশাক পরল। এরপর ১টা লাল সুটকেসে খণ্ড খণ্ড দেহটাকে ভরে নিয়ে হ্যাঁচড়াতে হ্যাঁচড়াতে মেয়েটা বেরিয়ে গেল। ফিরল ঘণ্টা দেড়েক পরে। ভালো করে মেঝে পরিষ্কার করল।

তারপর আবার ন্যাংটো হল।

ডেস্কটপ কম্পিউটার ওপেন করল। অন্ধকার ঘর। শুধু মনিটরের আলো। মাইক্রোসফট ওয়ার্ডের একটা বড়ো ফাইল খুলল। ২০ পয়েন্টে বোল্ড হরফে লেখা আছে— 'সঙ্গমপুর'। তার তলায় ১৬ পয়েন্টে লেখা আছে 'রাজকুমার চৌধুরি প্রণীত'। মেয়েটা 'রাজকুমার চৌধুরি' শব্দ ২টোকে সিলেক্ট করে ডিলিট করল। তারপর স্থির হাতে লিখল— 'আল্পনা চক্রবর্তী'। লেখা হল— 'আল্পনা চক্রবর্তী প্রণীত'।

সিনেমার ঠিক এই জায়গায় এসে, মেয়েটা যখন কম্পিউটারের প্রিন্টার চালিয়ে দিয়েছে, আপনার মনে পড়ল ১টা জরুরি ফোন করার আছে। কফি খাওয়া হয়নি। এবং। আপনার বাড়িটা কোনো সিনেমাহল নয়। ব্যাপারটা টিভিতে চলছে। আপনি টরেন্ট থেকে নামিয়ে দেখছেন। হাতে রিমোট কন্ট্রোল উশখুশ করছে। যে কোনো মুহূর্তে পজ করা যায়।

টিপুন।

কুৎসা পালটে কেচ্ছা হয়ে যায়। যাচ্ছেতাই। যা ইচ্ছে তাই। ১জন হয়তো পাখি পালটাতে পালটাতে নতুন খাঁচা কিনে ফ্যালে। কেউ বাজি বানাতে বানাতে চা-দোকানি হয়ে যায়। সংগ্রামী কৃষক নেতা তিনতলা বাড়ি হাঁকিয়ে দেয়। কিছু লোক মাসে মাসে টাকা রাখে সেই টাকা ডবল হবে বলে, সেই টাকা মাসে মাসে কোথায় যায় বোঝা যায় না। ১জনের কল্যাণময় বাবা আরেকজনের ধর্ষক। এইসব চলতে থাকে। কিছু বোঝা যায় না। গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে, শহর থেকে শহরান্তরে ১টাই বাংলা শব্দ অনেক হয়ে যায়। ১টা সময় আসে, ১টাই বাংলা শব্দকে ১০০০ কিমির পার্থক্যে চেনা যায় না। অনুবাদ করতে হয়। বাড়ির সামনের মোরাম। পথ পিচঢালাই রাস্তা হয়ে গিয়ে ১টা লোকের শৈশব মুছে দেয়। কোন ১ পরশপাথর গড়িয়ে যাচ্ছে হাওয়ায়, ছড়িয়ে থাকছে মাটিতে আর জলে! সোনা ছাড়া কোনোকিছুই মনে ওঠে না। লেখকের অণ্ডকোশ থেঁতো করে তলপেটে ঘিপঘাপ করে ২-৪টে ঘুসি মারলেই কি সে তার লেখা হয়ে যাবে? লেখকের স্বয়ং লেখা হয়ে ওঠার ব্যাপারটা, তার যাবতীয় দেখার শোনা, থুড়ি, সোনা হয়ে ওঠার সঙ্গে যুক্ত। কেউ খুঁজছে রাস্তায় পড়ে থাকা নেকলেস। কেউ খুঁজছে নদীর চরে মিশে থাকা চিকচিকে স্বর্ণচুর। আর কেউ চাইছে নিজেই সোনা বানাতে।

পরশপাথর

গ্রাম-জলফাঁকা

জিলা-হুগলি

মহাশয়

পেটের কাছে ব্রহ্মা নাই বিষ্ণু নাই আর কোথাই-বা কৈলাসপতি শিব। ও সব অদৃশ্য দেবতার পূজায় কোনো ফলাফল নাই। কেবল পরিশ্রমে মাটি হইয়াছি। এই ইংরাজের আমলে শ্রী শ্রীভগবান উদরচন্দ্রই দৃশ্যমান দেবতা। উঁহাকে পরিতৃপ্ত করিতে পারিলে পৃথিবীতে স্বর্গলাভের অধিকারি হওয়া যায়। উপনিষদ তো বলিয়াছে আনন্দই মুক্তি। আপনি পারদ হইতে সুবর্ণ নির্মাণ বিদেয় পারদর্শী এরূপ নিশ্চিত শুনিয়াছি। আমার অন্য কোনো নীরস শাস্ত্রে আগ্রহ নাই। আপনার শিষ্য হইতে অভিলাষ করি। সুবর্ণ নির্মাণ করিয়া পরিবারের দারিদ্র্য দূর করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছি। আপনি আমাকে শিষ্য করিয়া উক্ত শাস্ত্রের মাহাত্ম প্রকাশ করুন।

ইতি।

ভবদীয় তারাচরণ মল্লিক

ব্যবসায়ী

চিঠিটা পড়ে বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে থাকলেন তুলসী চক্রবর্তী। তিনি যে অ্যালকেমিস্ট্রি নিয়ে চর্চা করছেন, এবং বেশ কিছুটা এগিয়েছেন, সে খবর রাষ্ট্র হয়ে গেছে। এটা ঘটেছে বাড়ির পুরনো চাকর রঘুনাথ চলে যাওয়ার পরেই। সে-ই এটা রটিয়েছে। বাংলাদেশের মতো জায়গায় বসে পারদ থেকে সোনা বানানোর সাধনা করতে হলে সম্পূর্ণ গোপনীয়তা প্রয়োজন। বিশেষ করে এই গ্রামে। এখানে দারিদ্র চরম। মানুষের লোভ আরও বিপজ্জনক। দরিদ্র মানুষ ততটা ভয়ের কারণ নয়, যতটা অশিক্ষিত ধনী এবং লোলুপ মধ্যবিত্তরা। এই নিয়ে ৩টি চিঠি পেলেন তুলসী চক্রবর্তী। এরপর কেউ কেউ সশরীরে উপস্থিত হবে। ডাকাতিও করতে পারে।

এরা অ্যালকেমির আসল রহস্য বোঝে না। বুঝবে না। এই শিল্প যে নিজের আর্থিক অবস্থা ফেরানোর জন্য নয়, সেটা শুধু সাধকরাই জানেন। এখনও বিস্তর পথ বাকি। আত্মবিশ্বাসে চিড় না ধরলেও প্রায় যথাসর্বস্ব খুইয়েছেন তুলসী অ্যালকেমির

জন্য। সুদূর স্পেন থেকে মধ্যপ্রাচ্য অবধি যেতে হয়েছে তাঁকে সম্প্রদায়, শরীর, এবং অর্থের বাধা অতিক্রম করে। প্রায়শ্চিত্ত করেও সমাজে তিনি হারানো স্থান ফিরে পাননি। আজ বাড়ির সামনের বিশাল বাগানটি তাঁর নয়। রুই-মৃগেলে ভরতি পুকুরটিও হাতছাড়া। সব জমিদার নিয়েছেন। সেই জমিদারের কানেও পৌঁছেছে তাঁর সাধনার খবর। জমিদার প্রায়ই লোক পাঠান, কৌশলে যদি কিছু জানা যায়। এরপর ছল এবং বলের প্রয়োগও হবে। সরকার বাহাদুরের কানে গেলে কী হবে রাধামাধবই জানেন।

ভাবলে শরীর ঘর্মাক্ত হয়।

কিন্তু এই পথ ভয়কে প্রশ্রয় দেওয়ার নয়। এই যে তিনি সরকারের কথা ভেবে ঘর্মাক্ত হলেন, তার অর্থ এখনও তিনি অপরসায়ণের পথে সার্থকতা লাভ করেননি। অনেক নিম্নস্তরে পড়ে আছেন। সব ব্যর্থ হচ্ছে। তুলসী চক্রবর্তীর মন এখনও পারদ না হোক, অন্য কোনো নিকৃষ্ট ধাতু রয়ে গেছে— স্বর্ণ হয়নি।

তুলসী ভৃত্যকে ডাকলেন, 'মানিক! শুনে যা।'

মানিক রান্নাঘরে ব্যস্ত ছিল। হাত মুছতে মুছতে বেরিয়ে এল। খুবই শক্তসমর্থ চেহারা। পাশের গ্রামে জমিদারের কাছারিতে দারোয়ান ছিল। অবিশ্যি এই গ্রামেরই লোক।

'এজ্ঞে কত্তা?'

'আমি এই গ্রাম ছেড়ে দেব ঠিক করেছি মানিক। তুই কি আমার সঙ্গে যাবি? তোর ওপরে আমার বিশ্বাস জন্মেছে।'

'এজ্ঞে কুথায় যাবেন কত্তা?'

'ভাবছি আমার মাতুলালয়ের গ্রামেই গিয়ে বাস করব। সেখানে মানুষ অনেক সজ্জন। এখানকার মতো লোভী নয়। নিষ্ঠুর নয়।'

'এজ্ঞে যাব। টালিপাড়া তো বটে?'

'বেশ। তৈরি হয়ে নিস। আমার সব যন্ত্রপাতি সঙ্গে নিতে হবে। রাত্রির অন্ধকারে আমরা বেরিয়ে পড়ব। ১টা গোরুর গাড়িতে কুলোবে না মনে হয়। ২-৩টে লাগবে। আর খুবই সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। ১টা যন্ত্র ভেঙে গেলে...'

'পরশপাথরটাও সঙ্গে লিবেন তো কত্তা?'

লেখার শুরুতে যে জট পাকানো অবস্থাটা থাকে, লেখার শেষে এসে সেটা খুলে যাবে, গুথিটা সুলঝে যাবে, এমন আশা করে লাভ নেই। শুরুতেই সেটা হারিয়ে যাওয়া ভালো। এমনিতেও ফিরে আসে না। লেখা যত এগোয়, দেখা যায় প্রাথমিক জটটা আদতে ছিল না। আপনি ধরে নিয়েছিলেন জটটা আছে। বরং ১টা অভূতপূর্ব জট পাকানোর লোভেই আপনি লেখাটা নিয়ে এগোচ্ছেন। কাপের তলায় চায়ের মতো অল্প কিছু দানা দানা জট পড়ে আছে। সেটা যথেষ্ট নয়। অভিজ্ঞতার ভাঁড়ে ওয়াক থু পড়ে গেছে।

ধৈর্য হারানোর লোভ হচ্ছে আপনার, নিজের লেখার ওপরে রেগে উঠতে চাইছেন, ভাবছেন চোখ ২টোকে ছিঁড়ে ফেলতে পারলে, আড়াআড়ি চিরে ফেলতে পারলে, লেখার চাঁদ আপনাকে ছেড়ে চলে যাবে। সেটাও হওয়ার নয়। অনুভূতি আর স্মৃতিতে মিলে এমন ১টা ব্যাপার তৈরি করেছে, যা আসলে জোছনারোমাঞ্চিত এঁটো পেয়ালা। সেটার কোনো বাদুড়ওড়া ফ্রেশনেস নেই। প্রাসঙ্গিকতাই নেই। অথবা, সেখানে ব্যাপারগুলো এতই সূক্ষ্ন, আর আপনি নিজেকে এতটাই পেরিয়ে গেছেন নিজের সঙ্গে কথা না বলেই যে, আপনার চোখ আর হাতের তালমিল হারিয়ে ফেলেছেন।

অনুবাদ করছেন। মূল টেক্সটের ভাষাটা জানেন না। মারপিটকে লিখেছেন রক্তপাত। মৃত্যুকে লিখেছেন আমাদের মধ্যে নেই। যে কোনো হাততালি আপনাকে অপরাধী করে দিচ্ছে। অথচ কোনো নিন্দাই আপনার প্রাপ্য নয়। কারণ 'সঙ্গমপুর' সামাজিক চেতনায় ভরপুর ১ লেখা। রোমহর্ষক বাস্তব কাহিনি। দুর্ধর্ষ ১টা কাজ।

'আমি ছোটো শহরের মোড়ে মোড়ে গজিয়ে ওঠা বিরিয়ানি সেন্টারগুলোকে সন্দেহ করছি। লোকগুলোর মুখ সন্দেহজনক।'

'আমি সবজিবাজারের মধ্যে গজিয়ে ওঠা পার্টি অফিসটাকে সন্দেহ করছি। লোকগুলোর চোখ সন্দেহজনক।'

'আমি বাজারি লেখকের অপ্রাতিষ্ঠানিক কথাবার্তাগুলোকে সন্দেহ করছি।'

'১টা লিটিল ম্যাগ এত বিজ্ঞাপন পাবে কেন? এত মোটা হবে কেন? সন্দেহ করছি।'

'মানুষ কোনোদিন চাঁদে যায়নি। জানো তো? স্ট্যানলি কিউব্রিক সেট ফেলে চাঁদের শুটিং করেছিল। মুন ল্যান্ডিং সাজানো হয়েছিল ভিয়েতনামকে আড়াল করতে। ইতিহাস এভাবেই খবর হয়ে যায়, খবর ইতিহাস। সে ভিয়েতনাম হোক, বা নন্দীগ্রাম।'

'১৯৬৯-এর ২০শে জুলাই আমেরিকা চাঁদে গিয়েছিল কিনা, সেটা নিয়ে এই ২০১৭-র ২৩শে সেপ্টেম্বরে বসে আমরা ভাবব কেন?'

'কারণ আমরা বসে নেই। দাঁড়িয়ে কথা বলছি। আর ওই ১বারই চাঁদে যাওয়ার কথা শুনেছে মানুষ। প্রায় ৫০ বছর কাটল, আর কোনো চন্দ্রাভিযান হয়নি। বোঝো! হিটলারের কনসেনট্রেশন ক্যাম্পের ব্যাপারগুলোও জোসেফ স্তালিনের বানানো ছিল।'

'কিন্তু বানিয়েছিল তো জবরদস্ত, যদি বানিয়েও থাকে! সেটা স্বীকার করো। সংবাদ মূলত কাব্য, জানোই তো! ১টা খবর আদৌ আমার কাছে পৌঁছোবে কিনা, সেটা কি আমার ওপরে নির্ভর করে? খবরের নিজস্ব উদ্দেশ্য থাকে, মোটিভ থাকে। অকারণে সে আমার কাছে আসে কি?'

'সুভাষ বোসের শেষ অবধি কী হয়েছিল?'

'সুভাষ আজ আর বেঁচে নেই, এই খবরটা আমি বিশ্বাস করি। ২০১৭-এ বরং জানতে ইচ্ছে করে, অশউইৎজ কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে সত্যিই কি প্রতি অত ইহুদিকে গ্যাস চেম্বারে মারা হত? অত মৃতদেহ কি ১দিনে ১সঙ্গে পোড়ানো সম্ভব? হিটলার কি সত্যিই ভিলেন ছিল? আর, স্তালিন-চার্চিলরা দেবতা? দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে হিটলার যদি জিতে যেত, পৃথিবীটা আজ কেমন হত? হয়তো পয়সার চেয়ে শিল্পের দিকে মানুষের শ্রদ্ধা একটু বেশিই থাকত। হোমিয়োপ্যাথি নিয়ে খিল্লি হত না। ব্লু-ফিলমের বদলে প্রজননবিদ্যার দিকে হাত বাড়াত কিশোর-কিশোরীরা।'

'শয়তানের আসল নাম জানো তো? লুসিফার। লুসিফার মানে কী? যে আলো দেয়। দেশভাগের কথা সত্যিই কি গান্ধিকে জানতে দেওয়া হয়নি? সেটা সম্ভব?'

'মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধির হাতে সেলফোন ছিল না। তোমার আমার হাতে বন্দুক নেই। হরিদাস পালের চোখে দূরবিন নেই। ১টা সাদা রাস্তা শেষ অবধি প্রচুর

উজ্জ্বল গোলাপি আর হলুদ ফুল পেরিয়ে ১টা সাদা বাড়িতে গিয়ে ফুরিয়ে যায় কেন? আমি অবিশ্যি দেখিনি। এরকমই শুনেছি।'

'এরকমই শুনেছি। কিন্তু সন্দেহ আছে।'

'এরকমই শোনা যায়। পুরুলিয়ায় আমি ১টা খাঁটি সাদা বাড়ি দেখেছিলাম। পাথুরে সাদা নয়। চুনকাম করা। বাগানে গোলাপি আর হলুদ ফুল ছিল। উজ্জ্বল ছিল না। কিন্তু রংগুলো খাঁটি ছিল।'

'বাংলাভাষায় যেখানে সবাই কথা বলে, সেই অঞ্চলে কোনো বাড়ির রং পুরোপুরি সাদা হয় না। সাদা রাস্তা থাকলেও সেগুলোতে গোরুর গাড়ির চাকার দাগ আজ আর সতীদাহের যুগের মতো গভীর নয়। যেহেতু বাংলা স্পেন নয় ব্রাজিল নয়, এখানে মাঠ পেরিয়ে গেলে মাদার মেরির কোনো ভাঙা প্রতিমা নয়, চুরমার হয়ে যাওয়া চার্চ নয়, খাড়া মোবাইল টাওয়ার পাওয়া যায়। সেগুলো স্বাস্থ্যের পক্ষে নাকি চরম ক্ষতিকারক। রং করা আপেলের মতো।'

'হ্যাঁ। সেরকমই তো শুনেছি। ফর্মালডিহাইড ইঞ্জেক্টেড মাছ পাওয়া যাচ্ছে। পচা নয়। খেলেই নাকি পাকস্থলীতে ক্যানসার অবধারিত। পচা খবরে অবিশ্যি অত চট করে কিছু হয় না। তবু, মার্কেটের তাজা খবরগুলো খাওয়াই ভালো। সত্যি-মিথ্যা পরের কথা। ব্রয়লার মুরগিগুলোও তো মিথ্যা মুরগি, তাই না?'

'তাহলে যে মুন ল্যান্ডিং আর ভিয়েতনাম নিয়ে সত্যজিতের হিরো ভেবেছে, সেটা নিয়ে আমাদের মাথাব্যথা কেন?'

'কারণ ওই ১বারই মুন ল্যান্ডিং-এর কথা শোনা গেছে। দেখাও গেছে। আর নয়।'

দূর থেকে বাতাস আসছে। তার মানে, দূরে ১টা নদী আছে। লম্বা আর চওড়া ১টা নদী। সাঁতার শিখুন, খোকাখুকু। অন্তর্বাস খুলুন।

উপন্যাস লিখতে না পারেন, উপন্যাসের চরিত্র হয়ে যান।

মেঘ। বৃষ্টি। রেইনকোট

হাইওয়েটা ঠিক সেখানেই বাঁক নিয়েছে যেখানে আপনার শহরের দিক। ঝুলে থাকা মেঘের নীচে কিছু কুঁড়েঘর ঘেঁষাঘেষি করে আছে। কারও মাথায় টালি, কারও খড়, কারও ঈষৎ ত্রিপল। ১টি ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে ১ উজ্জ্বল লাল শাড়িপরা মধ্যবয়সিনী কনুই চুলোকোচ্ছেন। তাঁর সামনে ১ মোরগ গলা উঁচিয়ে এদিক সেদিক

দেখছে। রমণীর মুখে পরম তৃপ্তির ছাপ। পাশে ১ ম্যাটাডোর দাঁড়িয়ে আছে। ড্রাইভার সম্ভবত ভেতরে ঘুমোচ্ছেন।

মেঘ আরও ঝুলে এল।

এটা আফ্রিকা নয়। ব্রেজিল নয়। ভিয়েতনাম নয়। কারণ আপনি একটু এগিয়েই থামতে বাধ্য হলেন। পাশে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের সাফল্যের হোর্ডিং। আপনি বাইকের ডিকি থেকে রেইনকোট বের করলেন। আবার এগোলেন। বৃষ্টি নামল। বাড়িতে সম্পূর্ণ ভেজা অবস্থায় ঢুকে পরিবারের সহানুভূতি আর ঈষৎ অপরাধবোধমিশ্রিত পরিবেশে রেইনকোট খুললেন। রেইনপ্যান্ট খুললেন।

গরম চা অপেক্ষা করছে।

বাথরুমে ঢুকে নিজেকে শুঁকে আপনি সস্তা কন্ডোমের গন্ধ পেলেন। দামি ফাইবারের রেইনকোট এই গন্ধ শরীরে ছড়িয়ে দেয় কী করে! কিংবা ওটা ফাইবারের রেইনকোট নয়। পরিচিত দোকানেও ঠকাল এভাবে!

শাওয়ার চালিয়ে দিলেন।

ছররররররররররররররররররররররররররর...

এই ১০ম অধ্যায়ে আগের ৯টা অধ্যায়কে আশা করছেন তো? যেমন নিরিবিলি দুপুরে পৃথিবীর কোনো লেটেস্ট ভোর, সেকেলে সকাল বা অলমোস্ট দুপুরকে আশা করতে হয়। দুপুরে ঘুম ভেঙে কখনও কি মনে হয়েছে, এইমাত্র সকাল হল? আপনাকে দাঁত মাজতে হবে এবার? চা খেতে হবে? বাইরে মিহি বৃষ্টি পড়ছে। নিরপরাধ সকাল আর নির্দোষ বিকালের মধ্যে করোটির হাড় জেগে আছে। ঘুমোচ্ছিলেন, আপনার হাড় জেগে ছিল। হঠাৎ হাত বাড়িয়ে 'ওহে!' বলে আপনার ঘুম কখনও ভেঙেছে?

নিষ্পাপভাবে এই প্রশ্নগুলো করতে চাইছি। এগুলো রসস্থ মাংসল প্রশ্ন। তত্রাচ, মনে রাখুন, চিরকুমার সভা। হেপার সলফ খাওয়ালেই এরা চুপসে যাবে। আসলে, জানি আপনি ক্রুদ্ধ হবেন না। সকাল, না বিকাল, এই দ্বিধা সকলেরই হয়। ওটার সঙ্গে বার্ধক্য বা গভীরতার কোনো লেনদেন নেই। ১জনের হয়ে অনেকে স্বপ্ন

দেখতেই পারে, যদি তারা চোখ মেলে থাকে। সূর্যগ্রহণের সময় পাখিগুলো বাসায় ফিরতে শুরু করে, সেটায় তাদের প্রাকৃতিক বোধের কোনো হানি হয় না।

যদি আপত্তি থাকে, আপনি এটাকে ১০ম অধ্যায় না-ও ভাবতে পারেন। আপনি ৭ম অধ্যায় হিসেবে ব্যবহার করুন। ১ থেকে ১০-এর মধ্যে ৭ সংখ্যাটাই আমার মাথায় এল কেন? কারণ, সাধারণ ছাত্র ছিলাম। উচ্চমাধ্যমিকে ৭ম হইনি। নিজের ইস্কুলেও না। কিন্তু লেখার যদিও কোনো শেষ নেই, লেখা ছাপানোর ১টা কেস থাকে। হাত আর কবজির মধ্যে অনাদি অনন্ত কোনো শক্তিশালী ছাপাখানায় 'সঙ্গমপুর'-কে ফেলে দেওয়া যায় না। প্রেরণা জিনিসটার ওপরে লেখককে বিশ্বাস করতে নেই।

শিরার মধ্যে গিয়ে খুব সুন্দর জলও রক্ত হয়ে যায়।

বর্হেস। বড়ো রহস্যের অভাব

'কাল-পরশুতে রেখে আসা উলটো কবিতা লিখতে না পেরেই, তুমি এতটা আজকের হতে চাইলে, তাই না? অজস্র সোজা গদ্য লিখলে অনুপম, ১টাও গোয়েন্দা গল্প লিখলে না কেন? হোমস আর মরিয়ার্টিকে নিয়ে তুমি কত ঠিক-বেঠিক হয়ে আছ! লেখার ঘরের দেওয়ালে জেরেমি ব্রেটের হোমস-পোস্টার! বুক শেলফের ওপরে রাইকেনবাক জলপ্রপাতের ছবি, যেটার ওপরে হোমস আর মরিয়ার্টির চূড়ান্ত লড়াইটা হয়েছিল। ফেলুদা পড়েছ, ব্যোমকেশ পড়েছ, ফাদার ব্রাউন, মিস মার্পল, এরক্যুল পোয়ারোকে নিয়েও তোমার এত আকণ্ঠ উপবাস! অথচ নিজে লিখলে না?'

'কবিতা লিখতে পারি না আমি? আচ্ছা। এখন গোয়েন্দা গল্প লিখতে হলে মুশকিলটা কী জানো? অপরাধীর দিক থেকে লিখতে হবে। এখন লিখলে অপরাধীর হয়ে আমাকে লিখতে হবে। কালো ভ্রমরকে নিয়ে লিখতে হবে। গোয়েন্দা পার্শ্বচরিত্র হয়ে যাবে। কেন বলো তো? কারণ আজ অপরাধী কোনো বিস্ময় নয়, নিরপরাধই হল অবাক হওয়ার জায়গা। চিরকালই গোয়েন্দা কাহিনি লেখার আগে ১টা সেয়ানা গোয়েন্দা তৈরি করতে হয়। সেই গোয়েন্দা তার কাহিনিকে পেরিয়ে যায়, তার লেখককে পেরিয়ে যায়। সে তার গল্প আর গল্পকারকে কাঁচা খেয়ে নেয়। জানো তো, কোনান ডয়েল চেয়েছিলেন শার্লক হোমসকে মেরে ফেলতে? পাঠকের চাপে

পারেননি। হোমসকে তার লেখক ঈর্ষা করতেন। সেই ঈর্ষার কারণ নিজের চেয়ে নিজের চরিত্রের জনপ্রিয়তা বেড়ে যাওয়া নয়। আমার মনে হয়, সেটা ডয়েলের অক্ষমতার বোধ। শার্লক হোমসের বুদ্ধিমত্তাকে ডয়েল যে স্তরে নিয়ে গিয়েছিলেন, সেই মাপের রহস্য তিনি হোমসকে দিতে পারেননি।'

'তুমি নিজেই লেখো তাহলে ১টা হোমস-কাহিনি। হোমসকে দুর্ধর্ষ ক্রিমিনাল বানাও। পাইপে সুর লাগাও। বেহালা থেকে ধোঁয়া বেরিয়ে আসুক। কবিতা লিখে তো কিছু হবে না তোমার। শক্তি চট্টোপাধ্যায়, বা উৎপলকুমার বসু হওয়ার সম্ভাবনা তোমার নেই। কী জানো, তোমার যে কোনো কবিতা তোমার চেয়ে আমি অনেক ভালো লিখতে পারতাম। তোমার কবিতা লিখে কিস্যু হবে না।'

'কবিতা লিখে কিছু হবে না আমার? আচ্ছা। আমি হোমস-কাহিনি লিখব কেন! ১জনের লেখা অন্যের হাতে পড়ে খেলা হয়ে যায়, তাই আরও চিত্তাকর্ষক লাগে। অবিশ্যি আমারও খুব আপশোশ হয়, হর্হে লুই বর্হেস পেলেন না শার্লক হোমসকে! শার্লককে পেলেন কোনান ডয়েল, যিনি প্রতিভাশালী ফিকশন রাইটার, কিন্তু কবি নন। কুয়াশাঢাকা লন্ডন ঠিকই আছে, বুয়েনস আয়ার্সের দাবিটা আরও জোরালো মনে হয়। ঘটনা হল, প্রেমিক যেমন প্রেমকে পেরিয়ে যায় প্রেমের উপন্যাসে, স্বয়ং গোয়েন্দার চেয়ে বড়ো কোনো রহস্য হয় না তার রহস্য উপন্যাসে, কাহিনির শিরা-উপশিরায়। কিন্তু আজ তা সম্ভব নয়। আজকের গোয়েন্দাকে যদি আমি তার গপ্পের চেয়ে বড়ো করে দিই, আমার গপ্পো আমাকে লেখক হিসেবে শেষ করে দেবে। তাকে আমি বিপদের শেষ সীমা অবধি ভাঙব, বিক্রয়যোগ্য রাখব না, সম্পাদক ছাপতে চাইবে না, গপ্প কি আমাকে ক্ষমা করবে?'

'কিন্তু 'সঙ্গমপুর'-কে কি ১টা রহস্য উপন্যাস হিসেবেই লিখতে চাওনি? জলকেই কি জল খাইয়ে মারতে চাইলে না এখানে? এখানে চালাকি নেই তোমার?'

'কুয়াশা আর ঘোলা জলের মধ্যে ঘুলিয়ে ফেলো না, প্লিজ কমরেড। আমি কী লিখব জানতাম না। সিনট্যাক্সের কায়দায় ধুরন্ধর গদ্যকার হতে আমার ঘেন্না করে। তাই এভাবে লিখলাম। কিংবা, কিছুই লিখলাম না আসলে।'

'কিংবা তুমি অনুপম হতেই পারলে না। তুমি নিজেকে হাঁটাতেই পারলে না। তুমি ১টা না-লেখক। ঠক ঠক ঠকাস!'

'কেন? আমার নিজের লেখায় আমিই না-লেখক কী করে হব?'

'কারণ তুমি নিজেই। ওই শিরার বাইরে রক্ত। তুমি... তুমি কবিতা লিখতে জানো না। শক্তি বা জয় হতে পারবে না তুমি। উন্নত গদ্য লিখে সেই ক্ষতি পুষিয়ে নিতে চাও। বেশি বর্হেস মারিয়ো না।'

'আমি শক্তি নই। জয় নই। অনুপম নই। না— অনুপমও নই? আচ্ছা। কিন্তু আমি কবিতা লিখতে পারি না, এটা তুমি মোট ক-জনের মুখে শুনেছ বলো তো? গুনে দেখেছ সংখ্যাটা? দ্যাখোনি।'

'দেখিনি? আচ্ছা। দাঁড়কাক দেখে তোমার কখনও লেখার টেবিলের কথা মনে পড়েছে?'

'আমার তো লেখার টেবিল দেখলেই সিমেন্টের ছ্যাঁদাগুলো মনে পড়ে যায়। দ্যাখো, যদি চুষতেই হয়, বরং চকাস চকাস করেই চুষব। যে চোষায় ঠিক-বেঠিকের আওয়াজ পাওয়া যায়, সেটাতে ঘন হয়ে মাল বেরোয় না।'

THE END

তাহলে, হে আমার বাংলাভাষী পাঠক ও পাঠিকাবৃন্দ। আপনাদের পা-গুলোকে ঠকানোর কোনো ইচ্ছা আমার ছিল না, এবং আপনাদের পা-গুলোর ঠিকা আমি নিতে চাইনি। তত্রাচ, এই লেখা এবার শেষ করতে হবে। লেখা শেষ হয় না। লেখা শেষ করতে হয়। এবং, আমি, সেই হত্যাকারী।

ধরিয়ে দেবেন আমাকে? সাক্ষী দেবেন? জজ হবেন? ফাঁসি হয়ে যাবে নাকি... উকিল চাই! উকিল! কে উকিল আছেন ভাই? কে উকিল আছেন এখানে? কালো কোট পরা যে-কোনো ১জন হলেই চলবে।

এটাও তো যে-কোনো ১টা লেখা। আমার চেয়ে আপনি এটা আরও ভালো লিখতেন কি? আমার চিন্তা আমার ভাবনা আমার তত্ত্বকথা, আমার চেয়ে হয়তো আপনার লেখায় আরও ভালো ফুটে উঠত কি? আপনি, কি আমার চেয়ে বেটার রাজকুমার? আমি, কি আপনার চেয়ে খারাপ রাজকুমার? আমারই লেখায় আমি কি ভুল রাজকুমার?

ইল্লি আর কী!!!!

বেশি কোশ্চেন করা ভালো নয়। পাঁচিল আর পাগলের মধ্যে বানান-মিল প্রচুর। আপনি আনতি পারেন না। অবিশ্যি আঁচিলের সঙ্গেও। যদি ছড়া লেখেন তো জানবেন।

আপনি এই অবধি পড়লেন। কেন পড়লেন আমি জানি। যে-কোনো লেখাই হল পাঁচিলের গায়ে ছ্যাঁদা। এপার থেকে ওপার দেখা যায়। ওপার থেকে এপার। এমনকি, মাপসই হলে গলে ঢুকেও পড়া যায়। যেমন অ্যালিস ঢুকে পড়েছিল খরগোশের গর্ত বেয়ে আশ্চর্য জগতে। সব লেখারই গর্ত থাকে, ইশ অসভ্য, কিন্তু অমন আশ্চর্য জগৎ সবার হয় না। সব লেখাই লেখকের স্বপ্নের প্রোজেকশন নয়।

পাঁচিলের গায়ে অসংখ্য ছোটো আর বড়ো ছিদ্র হয়েই থাকে। কোন জায়গায় সেই গর্ত হবে, সেটা আপনার বিছানা হতে পারে, আপনার জুতো হতে পারে, বাসের ছাদ হতে পারে, আপনার কন্ডোমও হতে পারে। এইসবই আঁ... থুড়ি... পাঁচিল। নিজের জীবনের বাইরে লেখা ঘটনা, চরিত্র, আর সংলাপের মধ্যে ঢুকে পড়াটাই হল পা ঠক ঠক করার, অথবা নিজের পায়ের ঠিকা কাউকে দিয়ে দেওয়ার আশ্চর্য উপায়। আপনাকে অনুসরণ করে আপনার সঙ্গীসাথিরাও পাঁচিলের ছ্যাঁদা গলে ঢুকে পড়বে, অন্তত উঁকিঝুকি তো মারবেই। আমার পাঠক বাড়বে, পাঠিকা বাড়বে। বাংলা সাহিত্যের হয়তো ঘণ্টা হবে তাতে। আমার ঘণ্টাটা তো বাজবে!

জাস্ট ফাঁকা মাঠে ঘণ্টা বাজানোর মতো করেই 'সঙ্গমপুর' লিখলাম। কিছুই লেখার ছিল না, যখন শুরু করেছিলাম। এখনও কিছু লেখার নেই, যখন শেষ করছি।

শেষ করলাম। শেষ হয়ে হইল যা।

শেষ।